বাংলা উপন্যাসে ‘খল’ নর ও নারী চরিত্র

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

নিবন্ধন নম্বরঃ ১৭২

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১২-২০১৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

ড. সৌমিত্র শেখর

অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

ফোন: ৮৬২৪৬৬৬

৯৬৬১৯০০-৫৯/৬০২১ (অ)

০১৭৩২১০২১০৩ (মো)

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মো: জাহাঙ্গীর আলম, আমার তত্ত্বাবধানে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এম. ফিল. ডিগ্রি লাভ করার জন্য *বাংলা উপন্যাসে 'খল' নর ও নারী চরিত্র* শীর্ষক বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছে। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভের কোনো পরিচ্ছেদ এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয় নি অথবা এর অংশ-বিশেষ অন্য কোথাও ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয় নি বা প্রকাশ করার জন্য জমা দেয়া হয় নি। আমি অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. সৌমিত্র শেখর)

Dhaka University Institutional Repository

বিনয়াঞ্জলি

বাংলা সাহিত্যের এই ঋদ্ধ শাখা উপন্যাসের সঙ্গে প্রথম পরিচয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রফিকুল ইসলামের মাধ্যমে। তারপর থেকে কালের স্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উপন্যাসের সঙ্গে আমার ধীরে ধীরে গড়ে উঠে সখ্যভাব। উপন্যাসকে জানা ও বোঝার প্রথম প্রয়াস বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীর মাধ্যমে। উপন্যাসের এই গবেষণা কর্মটির প্রতি পূর্ণসমর্থন, প্রেষণা ও সহযোগিতায় সর্বাধিক ভূমিকা রেখেছেন গুণগ্রাহী শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. সৌমিত্র শেখর। তাঁর প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার অভিসন্দর্ভটির জন্য মূল্যবান পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে বাধিত করেছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. রফিকউল্লাহ খান।

এম. ফিল সহপাঠী আলমগীর কবির, সুশান্ত ও সুমির উৎসাহ এবং সহযোগিতা আমার গবেষণাকে ত্বরিত করেছে। তাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা রইল।

গবেষণাকালীন বিভাগীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়েছিল। এ সমস্ত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
এম. ফিল. গবেষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নম্বর
ভূমিকা	**৫-৭**
প্রথম অধ্যায়:	**৮-৩৩**
'খল' চরিত্র: তত্ত্ব, ধারণা ও বিতর্ক	
দ্বিতীয় অধ্যায়:	৩৪-৯০
বাংলা উপন্যাসে চরিত্র-সৃজন: রচয়িতাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ	
তৃতীয় অধ্যায়:	**৯১-২৩৩**
প্রথম পরিচ্ছেদ:	
উনিশ শতকে রচিত উপন্যাসে 'খল' নর ও নারী চরিত্র	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:	
বিশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত উপন্যাসে 'খল' নর ও নারী চরিত্র	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ:	
বিশ শতকের শেষার্ধে (মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব) রচিত উপন্যাসে 'খল' নর ও নারী চরিত্র	
চতুর্থ অধ্যায়:	**২৩৪-২৬১**
'খল' নর ও নারী চরিত্র: তুলনামূলক আলোচনা	
উপসংহার:	**২৬২-২৬৩**
গ্রন্থপঞ্জি:	**২৬৪-২৬৭**

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

উপন্যাসে চরিত্র সৃজন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি চরিত্র নানা সমীক্ষায়, নিত্য-নতুন মাত্রায় রূপায়িত হয়ে চলেছে। একজন স্রষ্টার যথার্থ কৃতিত্ব প্রকাশ পায় তার সৃজিত চরিত্রের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ রচয়িতার সত্যিকারের দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশই এক একটি চরিত্র। চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে। সমসাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতি, সমাজ, রাজনীতি, ধর্মীয় অনুভূতি কিংবা সংস্কৃতি। একটি চরিত্র অঙ্কনে লেখকের ব্যক্তিগত দর্শন, তিনি যে সমাজে বসবাস করেন সেই সমাজ, তিনি যে ধর্মে বিশ্বাসী সেই ধর্মীয় অনুভূতি, পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবেশ, বিশ্বাস ও সংস্কৃতি, সমসাময়িক কোনো ঘটনাবলি এবং সর্বোপরি লেখকের কল্পলোকের অবিমিশ্র মিশ্রণে তৈরি হয় এক একটি চরিত্র। চরিত্র চিত্রণে লেখকের হৃদয়ের গভীর অনুভূতি ব্যক্ত হয়। চরিত্র রচনার ক্ষেত্রে লেখক যে সব সময় প্রভাবিত হবেন এমনটি নাও হতে পারে। অনেক সময় লেখকের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে লেখকের স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ থাকে। তবে, স্বেচ্ছাচারিতা না বলে লেখকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। অনেক সময় কোনো চরিত্রে লেখকের জীবনের কোনো বিশেষ দিক ফুটে উঠে। এমন কি লেখকের জীবনের সামগ্রিকতাও ফুটে উঠতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)-এর *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে 'শ্রীকান্ত' চরিত্রটির কথা।

সাহিত্যে 'নায়ক', 'নায়িকা' ইত্যাদি কতিপয় প্রথাগত ধারণা রয়েছে। সাহিত্যিক-প্রয়োজনে রচয়িতা কোনো কোনো চরিত্রে 'খল' স্বভাবকে মুখ্য করে তোলেন। সমালোচকদের কাছে এসব চরিত্র 'খল' নর বা 'খল' নারী হিসেবে অভিহিত হয়। চরিত্রগুলোতে যদি কাহিনি প্রতিপাদনের নিয়ামক সূত্র নিহিত থাকে, তাহলে অনেকে এগুলোকে 'খল-নায়ক' বা 'খল-নায়িকা' বলেও চিহ্নিত করেন। কোনো কোনো সমালোচক অবশ্য এ ধরনের চরিত্রকে 'প্রতি-নায়ক' বা 'প্রতি-নায়িকা'ও বলতে চান। মোটকথা, এ চরিত্রগুলো সাহিত্য-নির্মাণে অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে স্রষ্টা বা সাহিত্যিকের হাতে। বাংলা উপন্যাসেও এমন নর ও নারী চরিত্র দেখা যায়। এদের আমরা 'খল' বিশেষণেই বিশেষায়িত করার পক্ষপাতী।

নর কিংবা নারীকে 'খল' প্রতিপন্ন করার স্বার্থে গবেষণা কর্মটির শীর্ষনাম *বাংলা উপন্যাসে 'খল' নর ও নারী চরিত্র* করা হয় নি। নারী বা নরের খলতা নয় বরং তারা কোন কোন প্রেক্ষাপট আশ্রয় করে 'খল' হয়ে উঠেছে সেটা বিশ্লেষণের ঋদ্ধ প্রয়াসই গবেষণা কর্মটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাংলা উপন্যাসের যাত্রাকাল ধরা হয় প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩)-এর *আলালের ঘরের দুলাল*

Dhaka University Institutional Repository

(১৮৫৮) থেকে। তার পর থেকে অদ্যাবধি নানা শ্রেণির অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে, হচ্ছে। প্রত্যেকটি উপন্যাস নিয়ে সমসাময়িক অথবা পরবর্তী সময়ে অন্যান্য লেখকবৃন্দ নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করেছেন। কোন উপন্যাস কেমন হওয়া উচিত, কোন বিষয়টি ভালো হয়েছে, কোন বিষয় নেই, কেন নেই এরূপ নানা মন্তব্য একই গ্রন্থ সম্পর্কে এরূপ সমালোচনা একাধিক বার হয়েছে বলে অধুনা সমালোচনা, সাহিত্যের একটা বড় এবং বুদ্ধিদীপ্ত শাখা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাস, চরিত্র বিশ্লেষণ, অলঙ্কার তথা শৈলীগত দিক নিয়েও অনেক লিখিত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রায় প্রত্যেক বিষয় নিয়েই অনেক সমালোচক নানাবিধ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বাংলা উপন্যাসের কেবল নেতিবাচক নর ও নারী চরিত্র নিয়ে ইতঃপূর্বে কোনো কাজ আমার চোখে পড়ে নি। বাংলা উপন্যাস অধ্যয়নে মনে হয়েছে, খল-নর কিংবা নারী চরিত্রসমূহ অনেক উপন্যাসের প্রাণস্বরূপ; অনেক ক্ষেত্রে উপন্যাসের উৎকর্ষ-অপকর্ষ, অলঙ্কার সবকিছুই নির্ভর করে ঐ সমস্ত চরিত্রের ওপর। সুতরাং এ ধরনের 'খল' নর ও নারী চরিত্রগুলোকে সবার সামনে নিয়ে এসে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করা এবং তাদের খলতার রহস্য উদ্ঘাটন করা সাহিত্যের সুষ্ঠু সমালোচনার খাতিরেই করা উচিত বলে আমি মনে করি।

বাংলা উপন্যাস নিয়ে সুধী মহলের অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক কাজ করেছেন। তাদের অনেকে আবার চরিত্রসমালোচনাও করে থাকেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তারা অনেক চরিত্রকে কেবল সমালোচনার জন্য সমালোচনা করে গেছেন। একটি চরিত্র সমালোচনার পূর্বে সেই চরিত্রের প্রেক্ষাপট ও তার আচরণ কিংবা বৈশিষ্ট্য যথাযথ বিবেচনা না করেই তা বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। যদি সেটা কেন্দ্রীয়, নায়ক কিংবা নায়িকা চরিত্রও হয়, সেই বিষয় নিয়ে যারা কাজ করেছেন, তারা সেই চরিত্রকে হয় নায়ক বা নায়িকা হিসেবে বিশেষায়িত করেছেন অথবা তার নেতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন। কিন্তু উক্ত চরিত্র কেন নায়ক, নায়িকা বা কেন্দ্রীয় চরিত্র তা হয়তো তুলে ধরলেও কেন 'খল', কোন প্রেক্ষাপট বা প্রেক্ষিতে 'খল' তা তুলে ধরতে কেউ অগ্রসর কিংবা আগ্রহী হন নি। ফলে চরিত্রগুলো বরাবরই নায়ক, নায়িকা বা 'খল' হিসেবেই আখ্যায়িত হয়ে এসেছে। এক কথায় কিছু চরিত্র 'খল' চরিত্র বলে হীনতার স্বীকার হয়েছে, হয়েছে অবহেলিত। আমার এই গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য সেই সমস্ত অবহেলিত চরিত্রকে বিশ্লেষণ করা। কেন তারা 'খল' চরিত্র, তারা 'খল' চরিত্র কেন হল কিংবা 'খল' হতে কী কী নিয়ামক কাজ করেছে, কোন কারণে তারা 'খল' হলো কিংবা তার খলতার পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল, তারা কী হয়ে 'খল' হয়েছে, নাকি তাদের 'খল' হতে কেউ বাধ্য করেছে। যদি তারা ইচ্ছাকৃত বা স্বপ্রণোদিতভাবে 'খল' হয় তাহলে কোন স্বার্থে তারা 'খল' হয়েছে, তার 'খল' হওয়া কতটুকু যুক্তিযুক্ত ছিল অথবা 'খল' না হয়ে কী করণীয় ছিল। উপর্যুপরি খলতার পেছনে কোন কোন বিষয় কাজ করেছে তার রহস্য ভেদ করাই আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য। খলতা কেবল উপন্যাসের চরিত্রে থাকে না,

Dhaka University Institutional Repository

মানবজীবনেও তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। সুষ্ঠু গবেষণার ক্ষেত্রে খলতা মনোভাবের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় জড়িত তা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করা হবে। বিজ্ঞান, সমাজ, মানবদর্শন, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, জেনেটিক্স প্রভৃতি ক্ষেত্র ব্যবহার করে প্রত্যেকটি চরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়াস থাকবে। সফল গবেষণার স্বার্থেই বাংলা উপন্যাসের সুবিশাল ভাণ্ডার থেকে খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের উপন্যাস থেকে ঔপন্যাসিকের প্রতিনিধিত্বমূলক উপন্যাসকে আশ্রয় করে গবেষণা কর্মটি সাজানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

'খল' চরিত্রঃ তত্ত্ব, ধারণা ও বিতর্ক

'খল' শব্দটি বিশেষণ। সংস্কৃত খিল্ +অ থেকে 'খল' শব্দটি এসেছে। বাংলা একাডেমি প্রণীত অভিধানে যার অর্থ করা হয়েছে 'কপট বা দুর্বৃত্ত' [১] ইংরেজিতে বলা হয় Villain। কিন্তু অনেক সমালোচক এরূপ চরিত্রকে Villain বলতে নারাজ। তাদের কেউ কেউ এ সমস্ত চরিত্রকে প্রতিনায়ক বা প্রতিনায়িকায় আখ্যায়িত করেছেন। ইংরেজিতে যাদেরকে Anti Hero বা Anti Heroine বলা হয়। কিন্তু Anti Hero বা Anti Heroine বলতে 'সাহস ও মর্যদাবোধে নায়ক বা নায়িকাচিত বৈশিষ্ট্য নেই এরূপ চরিত্রসমূহ'[২]-কে বোঝায়। সরাসরি ইংরেজিতে এই চরিত্রগুলোর স্বরূপ evil in Principle or Practice. তবে প্রাঞ্জল কথা, খল বা খলতা হল চরিত্রের স্খলিত রূপ। কেন্দ্রিয় বা নায়ক-নায়িকা যাই হোক না কেন মানবীয় গুণাবলির আবর্ত হতে বিচ্যুত চরিত্রসমূহকে আমরা 'খল' বলে অভিধায়িত করতে পারি। চরিত্রকে ব্যক্তিত্বের একাধিক উপাদানের মধ্যে অন্যতম উপাদান মনে করা যেতে পারে। 'চরিত্র ব্যক্তিত্বের একটি খণ্ডাংশ মাত্র বা ব্যক্তিত্বের মূল্যবিচার।'[৩] 'Character is Personality evaluated and Personality is Character.'[৪]

'স্বরূপ' শব্দটি বিশেষ্য এবং সংস্কৃত স্ব+রূপ; এভাবে এসেছে। 'বাংলা অভিধানে যার অর্থ ১. প্রকৃত বা আসল রূপ ২. স্বাভাবিক অবস্থা; প্রকৃতি।'[৫] ইংরেজি অভিধানে স্বরূপকে বলা হয়েছে- 'One's own form/ shape; own condition; real/ true nature; natural/ normal state or condition.'[৬] একটা চরিত্রের স্থান, কাল ও পাত্রভেদে আচরণে ভিন্নতা থাকতে পারে। সবধরনের আচরণ মিলিয়ে কোনো চরিত্রের প্রকৃত তথ্য বা মৌলিকতাই তার স্বরূপতা। 'বৈশিষ্ট্য' শব্দটি বিশেষ্য। বিশেষণ হল 'বিশিষ্ট'। সংস্কৃত 'বিশিষ্ট+য' থেকে এসেছে। অভিধানে যার অর্থ ধরা হয়েছে '১.বিশেষত্ব; বিশিষ্টতা ২. অসাধারণত্ব ৩. বৈলক্ষণ ৪. প্রভেদ; পার্থক্য।'[৭] ইংরেজি বৈশিষ্ট্যকে বলা হয়েছে-'characteristic; distinction; difference; speciality'[৮] সুতরাং আমরা বলতে পারি 'খলতা' মানুষের স্বরূপ নয়, বৈশিষ্ট্য মাত্র।

বাংলা উপন্যাসের মুকুলিত অবস্থা হতে অদ্যাবধি উপন্যাস সাহিত্যের দীর্ঘ পথপরিক্রমা লক্ষ করলে তথাকথিত 'খল' নর ও নারী চরিত্রের বিস্ময়কর উপস্থিতি সেখানে প্রতিভাত হয়। এসব চরিত্র কোনো ঘটনার আকস্মিকতা কিংবা লেখকের নিতান্ত খেয়ালের বশে সৃষ্ট নয়। বরং বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উত্থান-পতন কিংবা নানা যুগান্তকারী ঘটনাবলীর সিঞ্চিত জলে উদ্ভূত। বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক জীবনে ঘন ঘন পট পরিবর্তন, বিশ্বযুদ্ধদ্বয়ের আগমনী অভিসম্পাত, বিশ্বব্যাপী মৃত্যুক্ষুধা তথা মন্বন্তরের করাল গ্রাস, মূল্যবোধের অবক্ষয়, চোরাকারবারির নিরাবরণ বিচরণ, হৃতসর্বস্ব কৃষকের চরম সংকটাপূর্ণ অবস্থা, বেকার সমস্যা এবং সর্বোপরি ব্যক্তি লালসার উদ্‌গীরিত ফসল বাংলা উপন্যাসের খল নর-নারীসমূহ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিঃশব্দ আগমনী প্রভাব যা বাংলা উপন্যাসে খল নর-নারী চরিত্র সৃষ্টিতে প্রভূত সহায়তা করেছে। শেক্সপিয়রের *ম্যাকবেথ* (১৬০৫)-এ লেডি ম্যাকবেথ, ডাকিনীত্রয়; *কিংলিয়ার* (১৬০৫)-এ রিগান ও গনেরি বোনদ্বয়; *হোমার অব এপিক* (১৯৪৯)-এর গড্ ও গডিস্; মিলটন (১৬০৮-১৬৭৪) রচিত *স্যামসন এ্যাগোনিসটেস* (১৬৭১)-এর ডালিয়া; *মিডিয়া* নাটকের মিডিয়া; ওয়েবস্টার রচিত *ডাসেস অব মালফি*'র (১৬২৩) মালফি; ভারজিল (৭০-১৯ বি, সি) রচিত *অ্যানিড* (৫৯ বি.সি)-এর ডিড হতে আরম্ভ করে এরূপ অনেক চরিত্রের প্রভাব রয়েছে বাংলা উপন্যাসে 'খল' নর ও নারীসমূহের উদ্ভব ও বিকাশে।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস মতান্তরে নক্‌শা হিসেবে পরিচিত আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)। প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩)-এর এই উপন্যাস হতেই 'খল' নর-নারী চরিত্রের ঠকচাচা ও ঠকচাচীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এরপর বাংলা সাহিত্যের সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) সময় হতে তার সার্থকতা ও পূর্ণাঙ্গতা। বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), আবু জাফর শামসুদ্দিন (১৯১১-১৯৮৮), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), জহির রায়হানসহ (১৯৩৩-১৯৭২) আরো অনেকে ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু তাদের উপন্যাস নর-নারী খলতা'র বিষয়টি সেভাবে আসে নি। তবে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), নজিবর রহমান (১৮৭৬-১৯৩৫), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), শহীদুল্লাহ্ কায়সার (১৯২৬-১৯৭১), শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭); তাঁরা নর-নারীর খলতাকে এড়িয়ে যান নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তারা হয়তো খলতার বিষয়টা পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা, প্রেম, ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রভৃতি অপেক্ষা কিছুটা কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। অথবা এমন হতে পারে তারা হয়তো ইচ্ছে করেই খলতার বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। তবে তারপরও তারা যে সম্পূর্ণরূপে 'খলতা'-কে এড়িয়ে যেতে পেরেছেন তা মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *দুইবোন* (১৯৩৩) উপন্যাসে বোনদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব, যোগাযোগ-এর 'মধুসূদন', *চোখের বালি*-তে (১৯০৩) 'বিনোদিনী'র আচরণ সাময়িকভাবে খলতার পর্যায়ে পড়ে। পরে ঔপন্যাসিক নিজগুণে ঐ সমস্ত চরিত্রসমূহকে ক্লেদাক্ত অবস্থা হতে মুক্ত করে সভ্য-মানবীয় গুণের ছাঁচে ফেলে ধ্রুপদী করেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনিও

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রহীন (১৯১৭) উপন্যাসে 'কিরণময়ী' কে প্রথমের দিকে ছলনাময়ী হিসেবে দেখালেও শেষপর্যন্ত ক্লেদমুক্ত করে নায়িকা চরিত্রে রূপদান করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) তারা নর-নারীকে সহনশীল চরিত্ররূপে সৃষ্টি করেছেন। *পদ্মা নদীর মাঝি*-তে (১৯৩৬) 'মালা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী*-তে (১৯২৯) 'সর্বজায়া'; সহনশীল চরিত্রের অন্যতম নজির। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রায় সব নারী চরিত্রই সহনশীল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *গণদেবতা* উপন্যাসে 'শ্রীহরি', *চাঁপাডাঙ্গার বৌ* উপন্যাসে 'টিকুরীর খুড়ি' নামে একটা চরিত্র পাওয়া যায় যাকে 'খল' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যদিও তাদের খল হবার পেছনে অনেক কারণ ছিল। অর্থনীতির আলোকে আলোচনা করলে তাদের খল বলা যাবে না। ষাটের দশকের পরে এসে শামসুদ্দীন আবুল কালামের *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসে 'টিয়া বিবি' নামের আরেকটি চরিত্র পাওয়া যায়; যাকে ঔপন্যাসিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। সেখানে দেখানো হয়েছে স্বার্থের আড়ম্বরতা। এরপর সত্তেরের দশকের মধ্যে কেবল শহীদুল্লাহ কায়সারের *সারেং বৌ* (১৯৬২) উপন্যাসের মধ্যে 'গুজাবুড়ি'-কে পাওয়া যায় নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে। ঊনিশ শতকে মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ-সিন্ধু* (১৮৮৫-১৮৯১) উপন্যাসে 'জায়েদা', 'মায়মুনা' সর্বজন বিদিত নেতিবাচক চরিত্র। যদিও সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে তাদের নেতিবাচকতার পেছনে অনেক জ্ঞাত-অজ্ঞাত কারণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। নজিবর রহমানের *আনোয়ারা* (১৯১৪) উপন্যাসে দুর্গা বৈষ্ণবী, আনোয়ারার বিমাতা ও নুরল এসলামের বিমাতাকে নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে পাওয়া যায়। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৩-১৮৯১) *স্বর্ণলতা* (১৮৭৪) উপন্যাসের প্রমদাও একটা নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে পরিচিত। তবে এইসমস্ত চরিত্রসমূকে কেন নেতিচবাচক বা খল বলা হচ্ছে অথবা আদৌ তারা খল-চরিত্র কিনা তা পর্যায়ক্রমে আলোচনার মাধ্যমে বিচারের প্রয়াস থাকবে।

'খল' বা 'খলতা' শব্দের প্রচলন আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন আঙ্গিকে। গল্প, উপন্যাস, নাটক কিংবা সিনেমার পর্দায়। 'খলতা' একটা আপেক্ষিক বিষয়। এর নির্দিষ্ট সীমা-পরিসীমা যেমন নেই, তেমনি নেই তার কোনো অপরিহার্যতা। প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্য কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী আছে। তারা নিজ নিজ সেই গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সব মানুষই কোনো না কোনো পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রভুক্ত মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা মাত্র মৌলিক পার্থক্য আছে তা হল আচরণগত। মানুষের আচরণ নির্ভর করে বিভিন্ন প্রভাবকের ওপর। সেই প্রভাবক হতে পারে পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র। Heredity- ও একটা বড় factor হিসেবে কাজ করতে পারে। মানুষের আচরণগত পার্থক্যের সূত্রে তাকে ভালোত্ব কিংবা মন্দত্বের ফ্রেমে বাধা হয়। কিন্তু মানুষ dianamic। গতিশীলতাই তার পরম ধর্ম। সবকিছুর সঙ্গে আচরণের গতিশীলতা একটা অবসম্ভাবী বা আবশ্যিক বিষয়। এই অবসম্ভাবী

Dhaka University Institutional Repository

আচরণগত গতিশীলতার কারণে মানুষের জীবনের বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন আচরণ প্রবর্তিত হয়। তাই এক সময় যে একজনের সম্মানের পাত্র ছিল, অন্য সময় ঘৃণিতও হতে পারে। এটা কেবল একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। ব্যক্তিমানসের আকস্মিক কিংবা ক্রম বিবর্তিত সেই ব্যত্যয় আচরণের কারণেই ব্যক্তি, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র তাকে, সেই ব্যক্তিকে 'খল' বলে আখ্যায়িত করে। এটা একজন পুরুষের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি নারীর ক্ষেত্রেও। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় খলতার দায়ভার অধিকাংশ সময়ে নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। একারণে বলা যেতে পারে, একজন মানুষ যেকোনো সময়ে অপরের দৃষ্টিতে 'খল' হতে পারে। আবার একই সময়ে একজনের দৃষ্টিতে 'খল' অপরের দৃষ্টিতে ভালো হতে পারে। কিংবা পরিবারের চোখে ভালো, সমাজের চোখে 'খল'। অথবা পরিবার ও সমাজের ক্ষেত্রে 'খল' নয় কিন্তু রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে খল; এমনটিও হতে পারে। আসলে 'খলতা' হল মূলত একটি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার মাত্র। তারপরও ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে কাদেরকে, কোন্ বৈশিষ্ট্যের কারণে 'খল' বলা হচ্ছে এটাই অভিসন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয়। অভিসন্দর্ভের শিরোনামা অনুযায়ী নর-নারী উভয় চরিত্র আলোচনার প্রয়াস পাব।

'খল' নর-নারী বলতে আসলে আমরা কি বুঝি, একটা নর বা নারীর কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ থাকলে তাকে 'খল' বলা যেতে পারে, অথবা 'খল' বলে আদৌ কিছু আছে কি না; থাকলে তারা কেন 'খল', কীসের কারণে 'খল', কার কারণে 'খল' অর্থাৎ খল-আচরণের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আমরা এক্ষণে আলোচনার প্রয়াস পাব। এই প্রয়াসে আমাদের সমাজবিজ্ঞান, সমাজ-মনোবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসা-মনোবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি ও বংশগতিবিদ্যার সাহায্যে কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনার প্রয়োজন হবে যেমন-মন, মনোভাব, প্রেষণা, প্রত্যক্ষণ, আচরণ, মানবীয় প্রবৃত্তি, চেতন (ইদম), অবচেতন (অহম), অধিসত্তা, পরিবার, সাম্যতা-অসাম্যতা বা বৈষম্য, অভাব, চাহিদা, বিশৃঙ্খলতা, বিদ্বেষ, ব্যক্তিত্ব , প্রভাবক প্রভৃতি।

ব্যক্তি মন শুধু সচেতন নয়, ব্যক্তি-মন আত্ম-সচেতন। ব্যক্তি তার পরিবেশের উপর নির্ভর করে, ক্রিয়া করে। ব্যক্তি তার পরিবেশ এবং প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন, আবার ব্যক্তি যে প্রতিক্রিয়া করছে সেই সম্পর্কেও আত্মসচেতন। ব্যক্তি-মন আত্ম-নির্ধারণের, বেশিরভাগ সময়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী। এই আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার মাধ্যমে সূচিত হয় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। পরিবেশের প্রতি উদাসীন হয়ে এবং পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিছক শূন্যতার মধ্যে ব্যক্তি বেড়ে ওঠে না। আবার পরিবেশই তাকে পুরোপুরি গড়ে তোলে, এটা বলাও ভুল। সেখানে পরিবার একটা বড় ভূমিকা পালন করে। মানুষ নমনীয়, কিন্তু নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলে খুশিমত সবসময় তাকে গড়ে তোলা যায় না। মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা আছে কিন্তু অপরের দ্বারা সে প্রভাবিত হয় না: তা নয়। ব্যক্তি চিন্তা করতে পারে, হিসেব করতে পারে এবং উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। কিন্তু তার এই হিসেব, পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ তার পরিবেশ ও পরিবার থেকে প্রাপ্ত উপাদানের উপর নির্ভর করেই তাকে করতে হয়। ব্যক্তির চারপাশের পরিবেশের দ্বারা অর্থাৎ জাগতিক বা সামাজিক নিয়ম দিয়ে ব্যক্তির আচরণকে ব্যাখ্যা করা যায় না, তা নয়। কিন্তু জীবনের অনেক অবস্থায় মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এত সুস্পষ্টভাবে নিজেকে প্রকাশ করে যে, সেগুলোকে কোনো নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ব্যক্তি-মনের এই আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, ব্যক্তি-মনের সৃজনশীলতা, তার আত্মসচেতনতা, এগুলোর কথা স্মরণ রেখেই ব্যক্তি-মন কিংবা ব্যক্তি-চরিত্র এবং ব্যক্তির আলোচনা বা সমালোচনা করা যুক্তিসঙ্গত।

'ব্যক্তি-মন একটি জটিল বিষয়ের সংগঠন।'[৯] প্রতিটি মুহূর্তে তাকে অসংখ্য মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হয়, কখনো কখনো প্রায় একই সময়ে। একই সময়ে যে একটিমাত্র উদ্দীপক (প্রেষণা) তার উপর কাজ করছে বা একটি উদ্দীপকে একটি মাত্র প্রতিক্রিয়া তাকে করতে হচ্ছে তা নয়। একই সময়ে তার মধ্যে অনেক প্রয়োজন বা চাহিদার আবির্ভাব ঘটছে। অনেক সময় এই সব চাহিদার মধ্যে দেখা দেয় বিরোধ। একটিকে পরিপূরণ করতে গেলে অপরটি অপূরণ থেকে যাচ্ছে। ক্রিয়া করাই ব্যক্তি-মনের ধর্ম, তাই ব্যক্তি হল সক্রিয় একটি সত্তা। ব্যক্তি হল শক্তির আধার বা কেন্দ্র। ব্যক্তি তার বাইরে থেকে শক্তি সংগ্রহ করে নিজের মধ্যে সঞ্চিত করতে পারে এবং তার দ্বারা পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে পারে। ব্যক্তিমন পরিবেশের উপর ক্রিয়া করে পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন আনে, আর পরিবেশ ব্যক্তি-মনের উপর ক্রিয়া করে তার কর্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুত ব্যক্তি-মন ও পরিবেশ উভয় মিথস্ক্রিয়ার ফলে একদিকে যেমন ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে তেমনি অপরদিকে সূচিত হয় ব্যক্তির পরিবেশে অসংখ্য পরিবর্তন। ব্যক্তি তার পরিবেশের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করে না। ব্যক্তি দেহ-মনের এক অপূর্ব সংগঠন। ব্যক্তি-মন তার পরিবেশকে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তির যেমন আছে এক দেহ-সত্তা, তেমনি আছে এক মানস-সত্তা। তাই ব্যক্তি হল একটি আত্মা, ব্যক্তি হল কর্মকর্তা। কাজের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। কেবল একজনের সঙ্গে অন্যের থেকে পার্থক্যবোধের মাধ্যমেই তার ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে না; বরং ফুটে ওঠে তার কাজের স্বাতন্ত্র্যে, অর্থাৎ নিজের চেতনা ও বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে অপরের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা ভেবে ক্রিয়া করার মধ্যে। ব্যক্তির নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি তার কাজের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। তার মানে এটা নয় যে, একজন ব্যক্তি অপর দশজনের মতো আচরণ করে না। অনেক সময় অপরে যেরূপ আচরণ করে ব্যক্তিও সেইরূপ আচরণ করে, তবে তার অর্থ এই নয় যে, সে অন্ধভাবে বিনা বিচারে অপরের কর্মপন্থা অনুসরণ করে। অপরের মতামত বিনা বিচারে গ্রহণ না করে সে নিজে উদ্যোগী হয়ে কাজ করতে পারে এবং

Dhaka University Institutional Repository

ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা তার আছে, অর্থাৎ তার চরিত্রের বল আছে যার জন্য সে তার নিজের বৈশিষ্ট্যকে বা ব্যক্তিত্বকে সমাজের অন্য দশজনের কাছে প্রকাশ করতে পারে।

আমাদের দেশে বাঙালি সমাজে নারীদের আচরণ নম্র ও বশ্যতামূলক। পক্ষান্তরে পুরুষদের আচরণ তুলনামূলকভাবে প্রভুত্বব্যঞ্জক। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে আমাদের সমাজে কন্যাসন্তানের জন্মকে শুভসূচক বলে মনে করা হয় না। কন্যাকে আর্থিক দায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরিবারে পুত্রসন্তানের জন্ম আনন্দের ও সৌভাগ্যসূচক বলে চিহ্নিত। আমাদের সমাজের কৃষ্টিগত ও আইনগত ধারা হিসাবে মনে করা হয় যে, পুত্রসন্তানের মাধ্যমে পরিবারের বংশধারা অব্যাহত থাকবে এবং পিতা-মাতা বৃদ্ধ বয়সে পুত্র সন্তানের কাছে সাহায্য ও আশ্রয় লাভ করবে। 'যে সমাজে কন্যা ও পুত্র সন্তানের জন্য বৈষম্যমূলক মূল্যায়ন হবে, সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই কন্যা সন্তান নিজেকে পরিবারে বোঝা মনে করবে এবং সে কারণে তার আচরণ হবে নম্র ও বশ্যতাপূর্ণ।'[১০] তবে সবসময় সব নারীর ভেতর নমনীয়তা কিংবা বশ্যতা সমভাবে প্রবাহিত হবে এটা সত্য নয়। নম্রতা ও বশ্যতা নারীর স্বাভাবিক আচরণ। কখনো কখনো এর ব্যত্যয় ঘটতে দেখা যায়। সেটা হতে পারে অধৈর্য, অপ্রাপ্তি, পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব কিংবা মনোভাব থেকে। অনুরূপভাবে পুরুষের স্বাভাবিক আচরণ প্রভুত্বব্যঞ্জক হলেও সবসময় তারা প্রভুত্ব করতে চাইবে তাও সঠিক নয়। তাদের মধ্যেও অনেক সময় অনেক বেশি নমনীয়তা দেখা যায়, যা কোনো নারী অপেক্ষা কোনো দিক থেকেই কম নয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষরা অনেক বেশি ত্যাগ স্বীকার করে থাকে। ত্যাগের সংখ্যাটা কম হলেও অমূলক যে নয়, সেটা বলা যায় নিশ্চিতভাবে।

সমাজ-মনোবিজ্ঞানে বলা হয়, মানুষের আচরণ নির্ভর করে মনোভাবের ওপর। 'মনোভাব' হল কোনো বিষয়ে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া করার মানসিক প্রস্তুতি। মনোভাব সম্পর্কে আলপোর্ট (Allport) এর সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে-'মনোভাব হচ্ছে ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংগঠিত মানসিক স্নায়বিক প্রস্তুতি যা ব্যক্তিকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে বিশেষ ভঙ্গিতে প্রতিক্রিয়া করতে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।'[১১]

Dhaka University Institutional Repository

মনোভাব কোন্ কোন্ বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তা চিত্রের সাহায্যে এঁকে দেখানোর চেষ্টা করা হল:

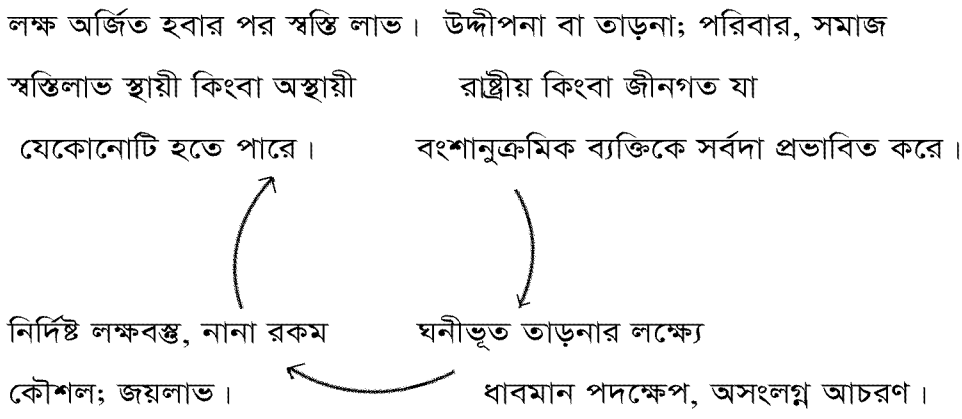

চিত্রঃ সম্ভাব্য উদ্দীপিত মনোভাব।

মনোভাব হল মনের নিগূঢ় আচরণগত অবস্থা, যা দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞলব্ধ জ্ঞানের সমষ্টি। এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানার্জনের উৎস পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র। মনোভাব গঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা, কামনা-বাসনা, অভিলাষ, চাওয়া-পাওয়া, অভাববোধ সবকিছুই নির্ভর করে। ব্যক্তির চাহিদা পূরণজাত মনোভাব এবং ব্যর্থতাজনিত মনোভাবের ভেতর যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কখনো কখনো সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী অবস্থান লক্ষ করা যায়। একটা আগ্রাসী, অপরটি নমনীয়। তবে চাহিদাপূরণ-এ গঠিত মনোভাব যে সবসময় অনাগ্রাসী অথবা কমনীয় বা নমনীয় হবে এটা যেমন সত্য নয়, তেমনি অভাবজনিত মনোভাবও সবসময় আগ্রাসী হয়ে ওঠে না। 'ব্যক্তির চাহিদা পূরণ ও চাহিদা পূরণে ব্যর্থতার সাথে তার মনোভাব গঠনের একটা সম্পর্ক আছে। সাধারণত যে সমস্ত অবস্থা বা ব্যক্তি তার চাহিদাপূরণে সহায়তা করে ঐ সমস্ত অবস্থা বা ব্যক্তির প্রতি ঐ ব্যক্তির একটা অনুকূল মনোভাব গড়ে উঠে। আর যে সমস্ত অবস্থা বা ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির চাহিদা পূরণে বাধার সৃষ্টি করে ঐ সমস্তের প্রতি তার একটা প্রতিকূল মনোভাব গড়ে উঠে।'[১২] অনেকগুলো মনোভাব মিলে গঠিত হয় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব মানুষের মূল আচরণের উৎস।

নিম্নে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার ধাপগুলো ক্রমান্বয়ে ছকের সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা করা হল:

ব্যক্তিত্ববোধ		অনেকগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত চূড়ান্ত লক্ষ্য ব্যক্তিত্ববোধ অনেকগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত চূড়ান্ত লক্ষ্য
(Values)	→	(Extremely inclusive goals around which many attitude patterns may be organized.
মনোভাব		অভীষ্ঠ আচরণের জন্য নির্দিষ্ট প্রস্তুতি (Generalized)
(Attitudes)	→	States of neadiness for motivated behavior)
উদ্দেশ্য /লক্ষ্য		অভিজ্ঞতালব্ধ লক্ষ্যাভিমুখী জ্ঞান যা উদ্দীপনা থেকে উদ্ভুত
(Motives)	→	(Learned ogal-directed states of the organism, energized by drives.)
উদ্দীপনা /চালনা শক্তি		ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ তেজদীপ্ততা যা ব্যক্তিকে কর্মে প্রবৃত্ত করে
(Drives)	→	State of the organism that initiate a tendencv toward general activity)

উৎস: Nowcomb, Turner & Converse, 965:45 (অনুসরণে)

চিত্র: ব্যক্তিত্বকে ছকে আঁকার একটা প্রচেষ্টা।[১৩]

'ব্যক্তিত্ব' শব্দটির সঙ্গে আমরা কম বেশি পরিচিত। সাধারণভাবে ব্যক্তিত্বকে যে অর্থে ব্যবহার করা হয় মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে তা ভিন্নতর, ব্যক্তিত্ব কম বা নাই বলতে যা সাধারণভাবে বোঝাতে চাওয়া হয় তা হল কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আকর্ষণীয় নয়, তেমনি ব্যক্তিত্ব আছে বা বেশি আছে বলতে বোঝানো হয় আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। 'ব্যক্তিত্ব' হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব জীবনভঙ্গি (life style)। এক ব্যক্তি যা তাই তার ব্যক্তিত্ব। সুতরাং বলা যায় সব ব্যক্তিরই ব্যক্তিত্ব আছে। কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হৃদয়গ্রাহী তাই আকর্ষণীয়। আর কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিরক্তিকর তাই তা অনাকর্ষণীয় বা বিকর্ষণধর্মী। যে সব গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের ফলে এক ব্যক্তি অন্য সকল ব্যক্তি হতে আলাদা তাকেই মনোবিজ্ঞানের ভাষায়

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিত্ব বলা হয়। প্রফসর নাইট এবং নাইট এর মতে, 'ব্যক্তি হল সে সকল বৈশিষ্ট্যাবলি যার ফলে একই প্রকার বুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিকারী হয়েও বিভিন্ন ব্যক্তি একই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া করে।'[১৪]

মনোভাব ও ব্যক্তিত্ব মিলে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। কখনো সেটা হয় নমনীয়, কখনো আগ্রাসী। আর ব্যক্তির আগ্রাসী কিংবা নমনীয় আচরণ প্রযুক্ত হয় তার বিপরীত ব্যক্তিত্ব বা মনোভাব পোষণকারী অন্য ব্যক্তির ওপর। তবে সবসময় বিপরীত মনোভাবের ব্যক্তির ওর প্রযুক্ত হবে এমন নাও হতে পারে। সমভাবাপন্ন ব্যক্তির ওপরও প্রযুক্ত হতে পারে। 'ব্যক্তি যখন তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয় বা লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে বাধা প্রাপ্ত হয় তখন সে ক্ষুব্ধ হয়। তার আগ্রাসন প্রশমনের জন্য সে অন্য ব্যক্তি বা জাতিকে বেছে ন্যায় ও তার প্রতি আগ্রাসন পরিচালিত করে।'[১৫] যে সমাজে জীবিকা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, পদমর্যাদা প্রভৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে জনগণের হতাশা ও ব্যর্থতা খুব বেশি সেখানকার লোকের মধ্যে আগ্রাসন পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং তারা তাদের এ আগ্রাসন প্রকাশের একটা ভদ্রসম্মত ও সমাজ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য উপায় বেছে নেয়।

'সহস্র বছরের গতানুগতিক শিক্ষা ও সংস্কার নারীদের রক্তে প্রবাহিত। তাই কোনো নারী সনাতন আদর্শ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে তা অন্য নারীদের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠছে না। প্রচলিত আদর্শচ্যুত নারী জাতির কলঙ্ক কিংবা সেই বিষয়টাকে নারীত্বের অবমাননা বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। হাজার হাজার নারীর মধ্যে সনাতন, কুসংস্কারপূর্ণ আদর্শের হাওয়া প্রবাহিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তারা ঘর গেরস্থালীর পাশাপাশি মেতে উঠছে পরনিন্দায় বা পরচর্চায়-কার বাড়ির জোয়ান মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কার বাড়ির বৌ বেপর্দা, কোন্ মহিলা স্বামীকে দিয়ে কাপড় ধোয়ায়, কোন্ বাড়ির পুরুষরা কৃপণ, কোন্ মহিলা বাপের বাড়ি টাকা পাঠায়-এ সকল আলোচনায় তারা সুখ খুঁজে পায় কিংবা খুঁজে নিতে চায়।'[১৬] নারীদের ভেতর জলধর্ম লক্ষণীয় অর্থাৎ প্রভাবিত হওয়া; পাত্রভেদে আকার-আকৃতি ও রঙ পরিবর্তনে। তবে সেটা সবসময় নেতিবাচক হয় না, ইতিবাচকও হয়। ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক যাই হোক না কেন সেটা নির্ভর করে নারীর ব্যক্তিত্বের ওপর। আর ব্যক্তিত্ব একটি প্রভাবিত, পরিবর্তনীয় সত্তা। যা যেকোনো মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে পারে। প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জিনগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী গঠিত মনোভাব এবং সর্বোপরি অভিভাবন। অভিভাবন হল অনুকরণীয় সত্তা যা প্রিয়জন কিংবা তার বিপরীত ব্যক্তির মাধ্যমে সুসংগঠিত ও সংঘটিত হয়ে থাকে। মনোভাব, ব্যক্তিত্ব, অভিভাবন এসব মিলেই একটা নারী চরিত্র গঠিত। পুরুষের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে পরিমাণ ও অবস্থাভেদে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। নারীচরিত্রসমূহ প্রধানত অভিভাবন, মনোভাব ও ব্যক্তিত্বের কারণেও বিরোধের দিকে ধাবিত হয়; যা

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার কিংবা সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। পূর্বে মনোভাব ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানা হয়েছে। এখন জানা প্রয়োজন অভিভাবন সম্পর্কে। 'অভিভাবন, যা অনুকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধযুক্ত, তা, জনতার আচরণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অভিভাবন তখনই হয় যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মধ্যে কোন ধারণা, বিশ্বাস বা কার্য অনুপ্রবিষ্ট করে দেয়, এবং যখন শেষোক্ত ব্যক্তি তার বিচারশক্তিকে কাজে লাগাতে পারে না। বস্তুত অভিভাবনের লক্ষ্য হল অপরের বিচারমূলক অভ্যাসকে প্রতিরুদ্ধ করে, তাকে দিয়ে কোন কিছু চিন্তা করান বা কোন কাজ করান।'[১৭]

জেম্‌স ড্রেভার (James Drever) *A Dictionary of Psychology* গ্রন্থে বিরোধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, বিরোধ হল 'পরস্পর-বিরুদ্ধ আবেগ বা ইচ্ছার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যা আবেগগত উত্তেজনা সৃষ্টি করে, যা, প্রায়ই খুব অসন্তোষজনক হয়, এবং যা মনঃসমীক্ষণ সম্পর্কীয় মতবাদ অনুসারে কোন একটি আবেগের অবদমনে পরিণতি লাভ করে।'[১৮] বিরোধের মূল কথা হলো কোনোকিছুতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। সেটা হতে পারে পারিবারিক, সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত। প্রেমিককে হারানোর ভীতি থেকেও বিরোধের সৃষ্টি হতে পারে। যেমনটি হয়েছে 'হীরা' চরিত্রে। এতে নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটে। বিরোধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হয়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের যেকোনো স্তরে বিরোধের আবির্ভাব ঘটতে পারে। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধের প্রকাশভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়। ছিরু পাল, প্রমদা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিরোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে সমাজ। সামাজিক নিয়ম-নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার, অশিক্ষা, বর্ণভেদ এবং সর্বোপরি পারস্পরিক স্বার্থের টানা-পোড়েন। 'ম্যাকাইভার এবং পেজ বলেন, 'সব ক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ কোন লক্ষ্য লাভ করার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তা সামাজিক বিরোধের অর্ন্তভুক্ত।'[১৯] এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে 'জেব-উন্নিসা' চরিত্রটি। ম্যাকাইভারের মতে, 'সমাজ হল বিরোধের দ্বারা কণ্টকিত সহযোগিতা (Society is co-operation Crossed by Conflict)'[২০]

নারী ও পুরুষ উভয় চরিত্র বিশ্লেষণে ফ্রয়েডীয় ধ্যান-ধারণাকে সংশ্লিষ্ট করা যায়। 'ফ্রয়েড মানুষের মনকে চেতন (Conscious), প্রাক চেতন (Pre conscious) ও অবচেতন (Unconscious) এই তিনভাগে ভাগ করেছেন। মনের যে অংশকে চেতন বলা তয়, সেই চেতন অংশটির প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা অবহিত থাকি, থাকতে পারি।'[২১] সাধারণ অবস্থায় প্রাকচেতন অংশটির প্রক্রিয়া আমাদের প্রায় অজানা থাকে। তবে চেষ্টা করলে তাকে চেতন অবস্থায় আনা যায়। তবে অবচেতন মনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা ততটা অবহিত হতে পারি না। কিন্তু আমাদের সচেতন আচরণ ও চিন্তাধারার ওপর

Dhaka University Institutional Repository

মনের অবচেতন অংশের প্রভাব সীমাহীন। 'ফ্রয়েড মনের আরও তিনটি অধিবাসীর কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো হচ্ছে ইদম (Id),অহম (Ego) ও অধিসত্তা (Super Ego) । ইদম (Id) মানব মনের সম্পূর্ণরূপে অবচেতন একটা প্রক্রিয়া। এটা কামনা ও বাসনার ধারক। তাৎক্ষণিক সুখ ভোগ তার কাম্য। অহমের (Ego) কাজ হল বাস্তবের সঙ্গে ইদমের যোগযোগ রক্ষা করা।'[২২] তাই অহম কিছুটা চেতন এবং অবচেতনের একটি সংমিশ্রিত অবস্থা। অধিসত্তা সামাজিক ও ব্যক্তিগত নীতিবোধের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। মানব-মনে 'অহম' সত্তাটির দায়িত্ব অনেক। এই সত্তাটি মানব-মনের সবধরনের প্রবৃত্তি ও বাস্তবতার মধ্যে আপোষ ঘটায়। অধিসত্তার শাসনও তাকে মেনে চলতে হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাই ইদমকে বিভিন্ন প্রতিরক্ষামূলক পদ্ধতির (Ego Defence Mechanism) আশ্রয় নিতে হয়।

নারী-আচরণ বিশ্লেষণে সমাজ-মনোবিজ্ঞান একটি নির্ভরযোগ্য সহায়ক। কেননা 'সমাজ-মনোবিজ্ঞানের কাজ কেবলমাত্র সামাজিক আচরণের মূল নীতিগুলি প্রতিষ্ঠা করা নয়, বরং বাস্তব সামাজিক পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ আচরণ করা ও তাকে বোঝার জন্য এই নীতিগুলোকে প্রয়োগ করা।'[২৩]

মনোবিজ্ঞান মানসিক সমস্যার সমাধান বিভিন্ন উপায়ে করে থাকে। কিন্তু জটিল সামাজিক সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন সমাজ-মনোবিজ্ঞান। সমাজ-মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণের সাহায্যে সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন এবং সেটা সমাধানের লক্ষ্যে পরামর্শ বা উপদেশ দিয়ে থাকেন। 'উদাহরণ স্বরূপ জাতিগত বিদ্বেষের (racial prejudice) সমস্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সমাজ-মনোবিজ্ঞানী আলোচনা করবেন কেন ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্বেষ বা সংস্কার জাগে, এই বিদ্বেষ কেন এবং কিভাবে পরিবর্তিত হয়, ব্যক্তির আচরণের এবং ব্যক্তিত্বের উপর এই বিদ্বেষের কি প্রভাব আছে। বিদ্বেষজাত মনোভাব এবং বিশ্বাসের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা সমাজ-মনোবিজ্ঞানীর কাজ নয়। সক্রিয় মানুষ হল সেই মানুষ যার মধ্যে ভালবাসা, ভয়, ক্রোধ, বিরোধিতা ইত্যাদি ভাবের আবির্ভাব ঘটে।'[২৪]

'খল-আচরণ' সম্পর্কিত যে সমস্ত সামাজিক ও মনঃসমীক্ষণমূলক কারণ বা বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়, সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল-

(ক) সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি (narrow outlook)

(খ) বদ্ধমূল ধারণা (persistency of ideas)

(গ) আবেগের নিয়ন্ত্রণহীনতা বা অস্বাভাবিকতা (heightened emotionality)

(ঘ) অনুকরণপ্রবণতা (imitation)

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) দায়িত্ববোধের হ্রাস (diminished sense of responsibility)

(চ) পারিবারিক বা সামাজিক শাসনের প্রতিরোধহীনতা (disinhibition of normal family or social controls)

(ছ) সংযম ও বিচার-বিবেচনার অভাব (lack of restraint and delbberation)

(জ) মনস্তত্ত্ব বা মনোবৃত্তীয় (personal psychology factors)

(ঝ) অতিমাত্রায় অভিভাব্যতা (heightened suggestibility)

(ঞ) বিশ্বাস ও প্রতিন্যাস/মনোভাব (beliefs and attitudes)

(ট) জৈবিক তাড়না সম্পর্কিত অস্বাভাবিক বা শারীরবৃত্তীয় বঞ্চনা (heightened of biological drive)

(ঠ) ক্ষীণবুদ্ধি (slender intelligence)

(ড) ক্রিয়াসম্বন্ধীয় অস্বাভাবিকতা (heightened of consciousness)

(ঢ) বংশগতি (heredity)

(ণ) কৃষ্টিগত প্রেক্ষিত (cultural context)

(ত) অসংলগ্ন মানসিকতা (Schizophrenia)

(থ) ব্যক্তিত্ব (personality)

মানুষ সবসময় বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করে না। অনেক বিষয় রয়েছে যাতে যথার্থ মনঃসংযোগ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবও হয় না। কিংবা সবসময় সবাই মিলে শৃঙ্খলতার মাধ্যমে কোনো কাজ করতে পারে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষ স্বীয় বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অন্যের ওপর নির্ভর হয় কিংবা কখনো উদ্দীপ্ত হয়ে উত্তেজনার দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে উল্টো ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। অন্যের প্রতি সহজেই অবিশ্বাস-প্রবণ হওয়া, সন্দেহ করা, কোনো বিষয়ে যাচাই না করে মন্তব্য করাকে বলা হচ্ছে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির বড় কারণ হল সামাজিক প্রচলিত কৃষ্টি ও অর্থনীতি। যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কারপূর্ণ মানসিকতা, সেই সঙ্গে দরিদ্রতার মিলিতরূপই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জনক। *আনোয়ারা* উপন্যাসের গোলাপজান কিংবা *স্বর্ণলতা* উপন্যাসের প্রমদা'র ভেতর এরূপ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়। অনেক কারণের মধ্যে উভয়ের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যই মূল কারণ।

ব্যক্তি মাত্রই আত্মকেন্দ্রিক। ব্যক্তি সবসময় নিজ ধ্যান-ধারণা ও কর্তৃত্বকে বজায় রাখতে চায়। অথবা হঠাৎ করে কোনো বিষয়ে একবার দৃঢ় হলে সেটাকে সত্য ও অভ্রান্ত বলে মনে করে। তার এই ধারণার

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে যারা ঐক্যমত প্রদর্শন করে তাদেরকে সে বিশ্বাস করে। তাদের যেকোনো উপদেশ বা পরামর্শ পরবর্তী সময়ে মেনে চলে; সেটার ভালো-মন্দ কিংবা ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিবেচনা করার প্রয়োজন মনে করে না। কিন্তু তার ধারণার বিপরীত মত পোষণ করলে তা যুক্তিসঙ্গত হলেও সেটাকে গ্রহণ করতে চায় না। ফলে ব্যক্তি বিপথগামী হয়ে পড়ে। তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এজিদ, ছিরু পাল, জায়েদা, প্রমদা, জেব-উন্নিসা চরিত্রসমূহে এরূপ বদ্ধমূল ধারণা লক্ষ করা যায়।

মানুষ মাত্রই আবেগপ্রবণ। এটা অনেকটা সংক্রামক রোগের মত; উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তা দ্রুত বাড়তে থাকে। আবেগের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে উদ্দীপক ও উত্তেজনার ওপর। আবেগের ফলে মানুষের ভেতর যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা তার অভ্যাস, মনের অস্থিরতা কিংবা কোনো মানসিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। 'ম্যাকডুগালের মতে, জনতার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি তার চারপাশের ভীতির লক্ষণ, বিবর্ণ বিকৃত মুখমণ্ডল, স্ফীতচক্ষুতারকা, উচ্চ কণ্ঠস্বর এবং সঙ্গীদের ভীতিজনক চিৎকার প্রত্যক্ষ করে। এই সব প্রত্যক্ষ করার জন্য তার নিজের উত্তেজনা ও আবেগ তীব্র হয়ে উঠে। উদ্দীপকের ক্রমবর্ধিষ্ণু পুনরাবৃত্তি (cumulative repetition of the stimulus) ও জনতাকে অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ করে তোলে।'[২৫] সবার আবেগ-অনুভূতি সমান হয় না। যারা বেশি উত্তেজনা প্রবণ মানুষ, কম রুচিসম্পন্ন কিংবা অমার্জিত তারাই বেশি বিপথগামী হয়ে থাকে। অন্যদের প্রত্যক্ষ করে নিজেও অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। সাধারণ লজ্জাবোধ কিংবা বিবেচনাবোধ তার নষ্ট হয়ে যায়। সেটাকেই সে সামাজিক নিয়ম-নীতি বলে ধরে নেয়। এজিদ, গোলাপজান, প্রমদা চরিত্রগুলোকে এর আওতায় ফেলা যায়। আবেগের অস্বাভাবিকতা অসম্ভব কোনো বিষয় নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে মানুষ নানা রকম আবেগের দ্বারা গঠিত হয়। ফলে তারা যেকোনো আচরণ ও আবেগে তাড়িত হয় এবং অনেক সময় ব্যক্তির আচরণের মাধ্যমে সেই আবেগ প্রকাশ পায়। মানুষ ক্রুদ্ধ হলে ক্রোধ বিষয়ের প্রতি আগ্রাসী মনোভাবী হয়, ভয় পেলে ভীত হয় আর আবেগের সঞ্চার হলে আবেগী হয়ে পড়ে। এই আবেগ মানুষকে কখনো Positive Approach কখনো Negative Approach এর দিকে ঠেলে দেয়। তবে আবেগ Positive or Negative Approach যাই হোক না কেন ব্যক্তি আবেগ তাড়িত হলে সে স্বাভাবিক অবস্থা বা আচরণ থেকে বিচ্যুত হয়। সে অবস্থায় ব্যক্তি স্বাভাবিক বিশ্রাম, খাওয়া দাওয়া কিংবা ঘুমাতেও পারে না। আবেগের মাত্রা যদি একটু বেশি হয় তাহলে ব্যক্তির সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করা এবং কোনো বিষয়ে চিন্তা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ব্যক্তির আচরণে অসামঞ্জস্যতা ধরা পড়ে। এগুলো হল বেশি আবেগের কুফল। তবে মাঝে মাঝে অল্প ও মাঝারি ধরনের আবেগ ব্যক্তির জন্য মঙ্গলজনক বা কল্যাণকর অথবা শুভসূচক হতে পারে। এই ধরণের আবেগকে বলা হয় গঠনমূলক আবেগ।

Dhaka University Institutional Repository

অনুকরণপ্রবণতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কখনো কখনো মানুষ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই অন্যদের অনুকরণে কোনো কিছু করতে চায়। সেখানে যৌক্তিকতা আর মুখ্য না থেকে গৌণ হয়ে যায়। পারিবারিক ও সামাজিক আবহ কিংবা সংস্কৃতিকে মানুষ বেশি অনুকরণ করে থাকে।

আনোয়ারার বিমাতা গোলাপজান, নুরল এসলামের বিমাতা, তারা সমাজে প্রচলিত অন্যান্য বিমাতাদের স্বরূপ সমাজ থেকে গ্রহণ করেছে। জেব-উন্নিসা বংশপরম্পরা প্রবাহিত ক্ষমতাভোগ, জৈবিক তাড়নাকে অনুকরণীয় বলে মনে করেছে এবং তদ্রূপ আচরণ করেছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে প্রবল সচেতন ব্যক্তিত্বের কারণে বংশীয় রীতিতে ভেঙে স্বর্গীয় প্রেমের পথে অগ্রসর হয়েছে। ছিরু পাল ছোটকাল থেকেই ত্রিপুরা সিং-কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাকে অনুকরণ করে সম্পদশালী হতে এবং সে সফল হয়েছে।

দায়িত্ব মানুষের স্বাভাবিক প্রাপ্তিজনিত ব্যাপার। সবার ওপর পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় কোনো না কোনো দায়িত্ব অর্পিত থাকে। দায়িত্ব মানুষকে সচেতন করে তোলে, কর্মপ্রেরণা যোগায়, তার স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবন-যাপন নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু কখনো কখনো ব্যক্তির মাঝে দায়িত্বহীনতা দেখা দেয়। তবে সবাই যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারে না। *'বিষাদ-সিন্ধু'*তে হাসানের করুণ মৃত্যুর ভেতরে যে অপার রহস্য লুকিয়ে আছে তার মূলরহস্য হল দায়িত্বহীনতা। দায়িত্ব নির্ভর করে ব্যক্তিত্ব ও মনোভাবের ওপর। সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। অনেকে এটাকে বোঝা মনে করে, আবার অনেকে তার দায়িত্বকে নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করে। সুতরাং দায়িত্ব পালন নৈতিকতা কিংবা নীতিবোধের জ্ঞানের ওপরও নির্ভর করে। আবার অনেক ব্যক্তি আছে যারা দায়িত্ব পালন করতে চায় কিন্তু তাদের সেই যোগ্যতা নেই। এক বাক্যে বলা যেতে পারে, ব্যক্তির ভেতর দায়িত্বশীলতা আসতে পারে শারীরিক অক্ষমতার কারণে, অলসপ্রবণতার কারণে কিংবা বাধ্যবাধকতার অভাবে।

ব্যক্তির আচরণ পরিবার ও সামাজিক নিয়ম-নীতির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই আচরণের নমনীয়তা ও কঠোরতা সেটার জন্য ব্যক্তিমাত্রই দায়ী বা দোষী নয়। পারিবারিকভাবে পরিবারের সদস্যদের পরিবারের কর্তা কর্তৃক যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত হলে ব্যক্তির আচরণ পরিবারের আশানুরূপ হত। সমাজের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে পরিবারও সমাজ এমন নিয়ম-রীতির প্রচলন করতে পারে, যা অন্য ব্যক্তি, পরিবার কিংবা সমাজের নিকট গ্রহণীয় নাও হতে পারে। তবে কিছু স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন রয়েছে। যা সবক্ষেত্রে গ্রহণীয়। আর সেটা যদি যথোপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হত তাহলে বিশেষ অর্থে হীরা, প্রমোদাকে 'প্রমদা' কিংবা জায়েদাকে 'জায়েদা' হতে হত না। এজন্য পারিবারিক ও সামাজিক শাসনের প্রতিরোধহীনতাকেই দায়ী করা চলে।

Dhaka University Institutional Repository

সবসময় ব্যক্তির আচরণে সংযম কিংবা বিচার-বিবেচনা সমৃদ্ধ বুদ্ধিদীপ্ত বিকাশ লক্ষ করা যায় না। এর কারণ আত্ম-মর্যাদাবোধ, আত্ম-সচেতনতা ও আত্ম-সমালোচনার অভাব। আত্মসংযমহীনতা বা বিচার-বিবেচনার অভাবকে ক্ষুদ্রার্থে মানসিক ভারসাম্যহীনতাও বলা যেতে পারে। এই ভারসাম্যহীনতাকে অস্বাভাবিক মানসপ্রকৃতি বলা যায় না। 'ভারসাম্যের অভাব ঘটলে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় এবং সেই চাপ অপসারণের জন্য ব্যক্তির মধ্যে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে।'[২৬] আচরণে অস্থিরতা, দৃঢ় সংকল্প হওয়া, কর্মকাণ্ডে উগ্রতার বহিঃপ্রকাশ, কোনো সিদ্ধান্তে অসতর্ক অবস্থান, অতিমাত্রায় চাঞ্চল্য, অধিক উত্তেজনা প্রবণ হওয়া, অসঙ্গত আচরণ-এর সবগুলোই অসংযম ও বিচার- বিবেচনার অভাবে ঘটে থাকে। ব্যক্তিজীবনের কোনো না কোনো সময়ে এগুলোর এক একটি ঘটে থাকে। ঠকচাচা, এজিদ, শ্রীহরি, মজিদ, হীরা, জেব-উন্নিসা, প্রমদা, গোলাপজান, দুর্গা, জায়েদা, মায়মুনা কিংবা গুজাবুড়ি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এগুলোর কোনো একটি অবশ্যই ঘটেছে।

মানুষের আচরণ নির্ভর করে তার মনোবৃত্তীয় প্রবৃত্তির ওপর। মনোভাব ব্যক্তির আচরণে গতিময়তা আনয়ন করে। মনোভাব হল কোনো বিষয়ে সার্বিক প্রস্তুতির প্রথম ধাপ। মানব মনের অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনাকে নিম্নরূপে চিত্রিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

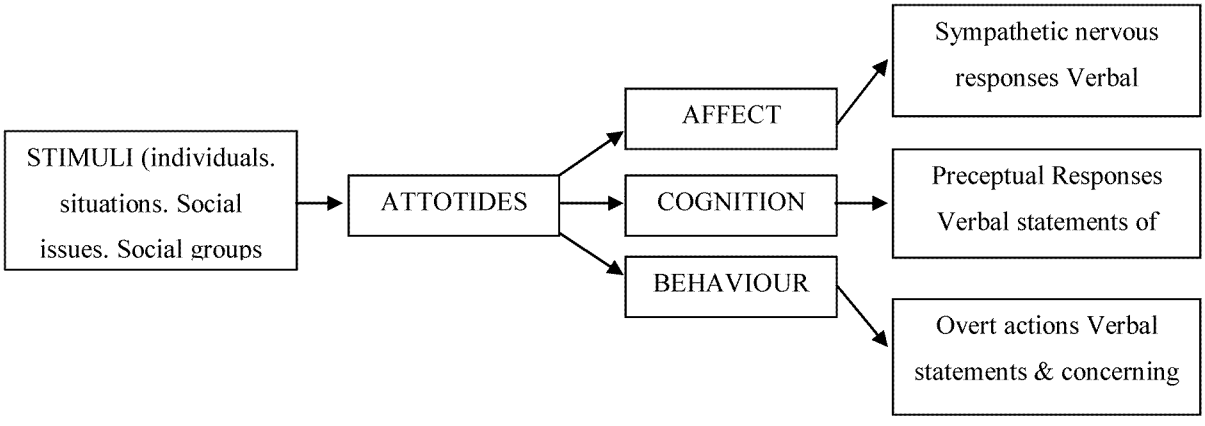

চিত্রঃ মনোভাবের পরিকল্পনীয় ধারণা। (Schematic conception of attitudes)[২৭]

মনের চাওয়া-পাওয়া বা অভিব্যক্তি মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। মনস্তত্ত্ব গড়ে ওঠে পারিবারিক, সামাজিক কিংবা বংশানুক্রমিক। অনেক সময় বাহ্যিক পরিবেশের দ্বারা মনোবৃত্তীয় প্রবৃত্তিগুলো পরিবর্তিত হয়। তবে সেটা Positive কিংবা negetive যে কোনো দিকে গড়াতে পারে। এটা নির্ভর করবে তার ইচ্ছা শক্তির ওপর। কারণ মানুষই একমাত্র সক্রিয় প্রাণী, যারা নিজেদেরকে ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণ কিংবা পরিবর্তন করতে পারে। সুতরাং মনস্তত্ত্ব মানুষের অত্যাবশ্যকীয় পরিবর্তনশীল উপাদান, যা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির ইচ্ছেশক্তি বা প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করে। রাজসিংহ উপন্যাস' জেব-উন্নিসা' চরিত্র তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই চরিত্রটির মনস্তত্ত্ব সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তনশীল। প্রথমের দিকে প্রভুত্বব্যঞ্জক, পরে সেটা হয়ে উঠেছে কমল,নমনীয়, অপূর্ব প্রেমময়। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের 'হীরা' চরিত্রটিও সময়, চাওয়া-পাওয়া কিংবা বলা যেতে পারে প্রবৃত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

অভিস্রবণ প্রক্রিয়া উদ্ভিদবিদ্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচ্য বিষয়। অভিস্রবণের সঙ্গে অভিভাব্যতার সাদৃশ্য কল্পনা করা যায়। অভিস্রবণ নির্ভর করে দ্রব, দ্রাবক ও দ্রবণের ওপর। 'দ্রব' হল একটি উপাদান যা অন্য একটি উপাদান দ্রাবকের সঙ্গে মিলে নতুন একটি মিশ্রপদার্থের সৃষ্টি করে, যাকে বলা হয় দ্রবণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চিনি একটি দ্রব; ও পানি হল দ্রাবক এবং চিনি ও পানির মিশ্রণে যা তৈরি হয় সেটাই হল দ্রবণ। দ্রবণে চিনি ও পানির স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে না। দুটো মিলে যা তৈরি হয় তাকে সাধারণভাবে শরবত বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ দাঁড়ায় চিনি ও পানির স্বাতন্ত্র্য লোপ পেয়ে তৃতীয় আরেকটি বস্তুর সৃষ্টি হল যাকে বলা হয় শরবত। অভিস্রবণ ও অভিভাব্যতা এক অর্থে প্রায় অভিন্ন। স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও অনেক মানুষ আছে যারা অনুকরণপ্রিয়। যখন কোনো ব্যক্তি অপরকে অনুকরণ করে, তারা ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস সব কিছু নিজের করে নেয় অর্থাৎ নিজের স্বাতন্ত্র্যকে হারিয়ে অন্যের বৈশিষ্ট্য ধারণ ও পোষণ করে অথবা নিজের ও অন্যের স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে তৃতীয়মাত্রার কোনো বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে, তখনই সেটাকে বলা হচ্ছে অভিভাব্যতা। *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসে জায়েদা চরিত্রটি অতিমাত্রায় অভিভাব্যতার শিকার। কেননা সে মায়মুনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিপথগামী হয়েছে। শ্রীহরি পালও একইভাবে অভিভাব্যতার শৃঙ্খলে আটকিয়ে গেছে।

'বিশ্বাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ক্রেচ এবং ক্রাচফিল্ড বলেন, "বিশ্বাস হল ব্যক্তির জগতের কোন একটি দিক সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষণ এবং জ্ঞানের একটি স্থায়ী সংগঠন"। বিশ্বাস হল কোনো বস্তুর এক ধরনের অর্থ-কোনো বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানের সমগ্রতা (totality of the individual's cognition)।'[২৮] কোনো ব্যক্তি এক বা একাধিক কোনো বিষয়ে বিশ্বাস করতে পারে। যেমন-কেউ মনে করতে পারে ভূতের অস্তিত্ব আছে। কেউ মনে করতে পারে পরীরা পূর্ণিমার রাতে নাচে-গান করে। অনেকে মনে করে নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখতে কঠোর হতে হয়, আবার অনেকে কমনীয় আচরণের দ্বারাও প্রভুত্ব করতে পারে। *আনোয়ারা* উপন্যাসে আনোয়ারা ও নুরল এসলামের বিমাতাদ্বয় মনে করেছে সৎছেলে-মেয়েরা কখনো তাদের জন্য সুখকর হতে পারে না। জেব-উন্নিসার বিশ্বাস ছিল রাজ্যের একচ্ছত্র অধিশ্বরী হবার মধ্যেই সার্বিক সুখ নিহিত। বিশ্বাস হল অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, আস্থা, নির্ভরতা, দৃষ্টিগোচরতা, অভ্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তা-চেতনা। বিশ্বাস চূড়ান্ত (conclusive) কোনো বিষয় নয়। তাই সময় কিংবা ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশ্বাসের পরিবর্তন হতে পারে। জেব-উন্নিসার ঐশ্বর্যজনিত সুখের প্রতি বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাসেরও শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন ঘটেছে। গুজাবুড়ির চরম বিশ্বাস ছিল যেকোনো নারীকে সে বিপথগামী করতে পারে। কিন্তু নবিতুনের ক্ষেত্রে তার সেই বিশ্বাস ভেঙে গিয়ে নারীসতীত্বের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। আবার অনেক বিশ্বাস আছে সেগুলোর পরিবর্তন হয় না। সেগুলো হতে পারে পারিবারিক বা বংশীয়-ঐতিহ্য কেন্দ্রিক। যেমন-বংশীয় পদমর্যাদা, মাজারের প্রতি বিশ্বাস, এগুলোকে সহজে ভাঙা যায় না। কারণ এগুলো মানুষের মনের অত্যন্ত স্পর্শকাতর জায়গা। *বিষাদ-সিন্ধু*-তে জায়েদার জয়নবকে নিয়ে হাসানের প্রতি অবিশ্বাসের বিশ্বাস ভাঙেনি।

মানুষের বিশ্বাস বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'প্রতিন্যাস'। 'প্রতিন্যাস হল কোন্ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করা হবে তাই পূর্ব থেকে চিন্তা করা, সংক্ষেপে পূর্ব-চিন্তিত প্রতিক্রিয়া।'[২৯] প্রতিন্যাস হল কোনো কাজ করার বা কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানসিকতা। প্রতিন্যাসকে 'নোদনা' বলা হয়ে থাকে। 'নোদনা হল প্রাণীর মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ প্রয়াস বা প্রচেষ্টার অবস্থা।'[৩০] প্রতিন্যাস কখনো কখনো কোনো ব্যক্তির ওপর শত্রুভাবাপন্ন আচরণ করতে প্রণোদিত করতে পারে। প্রতিন্যাস একটা আচরণগত অনুভূতি,কর্মপ্রেরণা যা মানুষকে যেকোনো কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, সেটা মন্দ অথবা ভালো যেকোনো রকম হতে পারে। প্রতিন্যাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে বিশ্বাস, আবেগ, প্রেষণা প্রভৃতি। বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিন্যাসের সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে প্রতিন্যাস মানুষের ভেতর স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং কোনো কাজ সম্পাদনে তীব্র প্রবণতা তৈরি করে। আনোয়ারা উপন্যাসে 'গোলাপজান' নিজেকে এলাকার সবচেয়ে সুন্দরী বলে মনে করত, কিন্তু স্বামীর পূর্ব স্ত্রীর মেয়ে 'আনোয়ারা'কে প্রত্যক্ষ করার পর তার ভেতর হিংসাত্মক প্রতিন্যাস গড়ে উঠেছে। এবং পরবর্তী সময়ে সে আনোয়ারার ক্ষতি সাধনে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে।

জৈবিক ঘটনা সম্পর্কিত অস্বাভাবিকতা বলতে যা বোঝায় তাহল, সকল শ্রেণির স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষের ভেতর মৌলিক চাহিদা ছাড়াও যে বিষয়টা অত্যাবশ্যকীয় সেটা জৈবিকতা, এটা মানুষের জীবনের একটা স্বাভাবিক ধর্ম ও প্রক্রিয়া। যা শিক্ষা, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-গরীব কোনো কিছুর উপরই নির্ভর করে না। অবস্থা ও বয়সের নিয়মে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। কখনো কখনো মানুষের স্বাভাবিক এই প্রক্রিয়া ব্যক্তিগত অনুশীলন, পদক্ষেপ, সামাজিক-বিধি-নিষেধ কিংবা ধর্মীয় কারণে কিছুটা নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রকাশিত হয়। জৈবিকতা বলতে ক্ষুধা ও ক্ষুন্নিবৃত্তির সমন্বয় বোঝায়। জন্ম থেকেই যেমন একটা মানুষের ভেতর ক্ষুধার চাহিদা তৈরি হয়, তেমনি ক্ষুন্নিবৃত্তির বীজ ও বয়সের আবহাওয়ায় সৃষ্টি পেতে থাকে। ক্ষুধার জন্য যেমন শিক্ষা বা পরিবেশের প্রয়োজন নেই, তেমনি ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যও কোনো

Dhaka University Institutional Repository

রকম শিক্ষার প্রয়োজন নেই। তবে জৈবিকতা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে, ব্যক্তির চাহিদার উপর নির্ভর কিংবা ব্যক্তির ইচ্ছার উপরও নির্ভর করতে পারে।

ক্ষীণবুদ্ধিতা বা বুদ্ধিবৃত্তিতা মানব জাতির মৌলিক গুণ, যা অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে মানুষ অপেক্ষা কম রয়েছে। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে মানুষই শ্রেষ্ঠ। তবে সব মানুষই সমান বুদ্ধি ও বিদ্যাধর নয়। মানুষের বুদ্ধি একটা ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রক্রিয়া। বুদ্ধি হল একটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়া। কোনো শিক্ষা বিষয়ক কাজে সফলতা অর্জন অথবা সাফল্যের সাথে কোনো কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতাকেই বুদ্ধি বলা হয়। বুদ্ধিকে মানসিক শক্তি এবং বিচার ক্ষমতা বলা যেতে পারে। 'বুদ্ধি শব্দের অর্থ বোধসাধন, বিচারশক্তি, বিবেকশক্তি, উপায় উদ্ভাবনের শক্তি। বুদ্ধি হলো জ্ঞান অর্জনের এবং জ্ঞান প্রয়োগের দক্ষতা।'[৩১] পরিবেশ-প্রকৃতি ও চর্চার ওপর বুদ্ধির বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় নির্ভর করে। একারণেই দেখা যায় সবার বুদ্ধি বৃদ্ধির পরিমাপ সমান নয়। কারো অনেক বেশি, কারো অনেক কম। বংশপরম্পরাও এটা প্রবাহিত অর্থাৎ পূর্বপুরুষ দ্বারা ব্যক্তি প্রভাবিত হতে পারে। বার্টের মতে 'অধিকাংশ অপরাধী ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন।'[৩২] নাইট এবং নাইট (Knight, R.and Knight) এর মতে, 'অপরাধ ও বুদ্ধির স্বল্পতার মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে, কেননা যেখানে বুদ্ধির অভাব সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ চরিত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।'[৩৩] মনোবিজ্ঞানী রাক-এর মতে 'ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রবৃত্তি ও আবেগের বশে অপরাধমূক কাজ করে।'[৩৪] মনোবিজ্ঞানী ভার্নন (Munn, N.L.) বলেন, 'বাস্তব জীবনে পরিবেশের সংঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষমতাই বুদ্ধি।'[৩৫]

যেকোনো মানুষের ক্রিয়া সম্পর্কে অসচেতনতা দেখা যেতে পারে। যাকে আমরা হিতাহিত জ্ঞান বলে থাকি। ক্রিয়াসম্বন্ধীয় অস্বাভাবিকতা হল মানুষ কখনো কখনো কোনো কাজ না ভেবেই করে থাকে। এটাকে অবিমৃষ্যকারিতাও বলা যেতে পারে। কাজের ফল (Result) কি হবে, তার কর্মকাণ্ড কারো জন্য কোনো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে কি না এসব চিন্তা না করেই বা না ভেবেই অনেক সময় ব্যক্তি অনেক কাজ করে থাকে অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় নিজের সম্পর্কে তারা অসচেতন অথবা তাদের উপস্থিত বুদ্ধি খুব কম। সেকারণে কোনো কিছু না ভেবেই তারা কাজ করে থাকে। ফলাফলে বেশিরভাগ সময়ই তাদের কর্মকাণ্ড অন্যের ক্ষতি বা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের অনেক আচরণগত বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিক প্রবাহিত হয়। যেমনঃ মানুষের বুদ্ধি তার আচরণের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। প্রতিভাবান ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির আচরণের মাধ্যমে তাদের ধারালো বুদ্ধির পরিমাণ প্রকাশ পায়। 'যাদের বুদ্ধি উন্নত স্তরের তাদের আচরণ সঙ্গতিপূর্ণ, সৃষ্টিধর্মী ও গঠনমূলক। ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের বুদ্ধির মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের যার কারণে তাদের আচরণের মধ্যে নানা রকম

Dhaka University Institutional Repository

অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়।'[৩৬] বুদ্ধিই মানুষকে জীবনের বহুবিধ সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। কোনো ব্যক্তির বুদ্ধির মান জানা থাকলে তার আচরণ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যায়। Genetic বা বংশগতিবিদ্যায় এই বিষয়টি আলোচনা করা হয়। যদি ব্যক্তিকে শিশু কল্পনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে শিশু তার মাতা-পিতার অনেক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। মা-বাবা যে জিনিসটি খেতে বা পড়তে পছন্দ করেন, তার ছেলে-মেয়েরাও একই জিনিস খাওয়া বা পড়ার জন্য পছন্দ করে। প্রায়ই দেখা যায় মাতা-পিতা যে আদর্শে বিশ্বাসী, তাদের ছেলে-মেয়েরাও সে আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে গড়ে ওঠে। মাতা-পিতা কোনো অনৈতিক বিষয় বিশ্বাস করে কিংবা পালন করে থাকলে তাদের সন্তানরাও তা অনেকক্ষেত্রে অনুকরণ করে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ বংশপরম্পরা কোনো না কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শকে গ্রহণ করে থাকে। বংশগতিবিদ্যানুসারে বেশিরভাগ পুরুষ তার পিতাকে আর নারীরা তাদের মাতার আচার-আচরণকে অনুসরণ কিংবা অনুকরণ করে। কিন্তু সবসময় পুরুষরা পিতাকে আর নারীরা মাতাকে অনুসরণ অথবা অনুকরণ করবে এটা সত্য নয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় কন্যা তার বাবাকে অনুসরণ করে, অন্যদিকে ছেলে তার মাতাকে অনুসরণ করে। আবার মাতা-পিতা উভয়ের আদর্শগত সংমিশ্রণেরও একটা নারী অথবা পুরুষের আচরণ, মনোভাব কিংবা ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের *রাজসিংহ* উপন্যাসে 'জেব-উন্নিসা' চরিত্রটি পিতা কিংবা পিতামহদের আচরণ দ্বারা প্রভাবিত। তাদের বংশানুক্রমিক ক্ষমতার আগ্রাসী মনোভাব তার ভেতর প্রবাহিত হতে দেখা যায়। বংশানুক্রমিক আচরণ কিংবা অভ্যাস সহজে পরিবর্তিত হয় না। তবে পরিবেশগত হেরফের কিংবা সামাজিক প্রভাবজনিত কারণে কখনো কখনো পরিবর্তিত হতে পারে। তাছাড়া ব্যক্তিত্ব সেখানে একটা বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। কেননা ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় বংশীয় আচার-ঐতিহ্য, পরিবার, সমাজ এবং বন্ধুমহলের মিশেলে। আর এ কারণেই বংশীয় আচার-আচরণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবিত হতে পারে। জেব-উন্নিসার প্রবল ব্যক্তিত্ব ও প্রেমের কাছে মুঘল সম্রাটদের ঐতিহ্যকে পরাভূত হতে দেখা যায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের 'অসংলগ্ন মানসিকতা'[৩৭] এবং মনোবিজ্ঞানের 'অলিকবীক্ষণ'[৩৮] এর মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। মানুষ কখনো অভাববোধ, চাহিদা থেকে অলিকবীক্ষণ কিংবা অসংলগ্ন মানসিকতার শিকার হয়। আমাদের আলোচ্য চরিত্রসমূহের কোনোটির ভেতরই অনুরূপ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না, সন্দেহ হয় মাত্র। প্রমদা, জায়েদা, গোলাপজান-এ কয়েকটি চরিত্রকে সন্দেহ হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা মানবীয় দোষ-গুণের সমন্বয়ে গঠিত। তবে এজিদ ও শ্রীহরি পালের মধ্যে অলিকবীক্ষণ বিষয়টি বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

'ব্যক্তিত্ব একটি নৈর্ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ। সাধারণত ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এবং অসাধারণত্বকে ব্যক্তিত্বের প্রধান লক্ষণ বলে মনে করা হয়। ..... ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সেই অন্তর্নিহিত সারমর্ম

Dhaka University Institutional Repository

(innerssence), যা ব্যক্তির পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণকে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।'[৩৯] 'Personality is the broader term in cluding character as one of it's aspect.'[৪০] ব্যক্তিত্ব, প্রভাবজনিত কারণ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে একটা নারী তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ধীরে ধীরে খল হয়ে উঠতে পারে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার কারণেও আচরণগত পরিবর্তন আসতে পারে। সমালোচকরা মনে করেন খলতা হল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। তারা আরও মনে করেন, এক সময় বিমাতারা কিছুটা ক্রূর ছিলেন কিন্তু যুদ্ধপরবর্তী সময়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন হয়েছে, সেই সাথে নারীদের বিশেষ করে বিমাতাদের আচরণেরও পরিবর্তন এসেছে।

আমরা যখন কোনো পুরুষ বা নারীকে স্বাভাবিক যে জীবন যা সত্য সুন্দর মঙ্গল তার বিপরীতে কাজ করতে দেখি তাকেই আমরা সাধারণভাবে 'খল' চরিত্র বলে আখ্যায়িত করতে পারি। যখন এই কাজটি কোনো পুরুষ করেন তখন তিনি খল-পুরুষ, আর কোনো নারী করে থাকলে তাকে খল-নারী হিসেবেই আমরা তাকে আখ্যায়িত করব। তার মানে দাঁড়ায় যারা নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সত্যের বিপরীতে দাঁড়ায়, মঙ্গল, কল্যাণ ও সভ্যতার বিপরীতে দাঁড়ায় তাদেরকে বলা হয় খল। প্রাকৃতিক ভাবেই তাদের পথ হবে অন্ধকারের পথ, ষড়যন্ত্রের পথ, মিথ্যাচার কিংবা অকল্যাণের পথ। আর তারা অন্য যে সমস্ত স্বাভাবিক চরিত্রগুলো আছে, যে চরিত্রগুলো স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারতো তাদের বিপ্রতীপ কাজ করে। তাদের পথে কখনো কাঁটা বিছিয়ে দেয়, কখনো তাদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে। এমনও দেখা যায় তারা নিজের স্বার্থের চাইতেও অন্য কোনো চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ বা ভালোত্ব সে সহ্য করতে পরে না; যাকে বলা হয় পরশ্রীকাতরতা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আমরা অনেক এ ধরনের চরিত্র পাই। এমনকি কখনো কখনো দেখা যায় যে, এই পাবার জন্য যে পেতে পারে তার বিরুদ্ধে, সে দাঁড়িয়ে নানাভাবে ষড়যন্ত্র করে। আবার কখনো কখনো দেখা যাবে পাবার অথবা না পাবার সম্পর্ক নেই বরং অন্যের মঙ্গল বা প্রাপ্তিবোধ তারা সহ্য করতে পারে না। অন্যের প্রাপ্তির যে সম্ভাবনা তা তাদের চোখে বিষ হয়ে দেখা দেয়। অতএব নিজ স্বার্থের চেয়ে তখন অন্যের ভালোটা তার কাছে খারাপ। এই খারাপের কারণে অন্যের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়ায়, অন্যের বিরুদ্ধে কলঙ্ক লেপন করে, তাদের সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে, তার পরিবার সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে এবং সেই কুৎসা তার প্রিয়ভাজন ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়।

সাধারণত খল-নায়ক বা খল-নায়িকার অধিকাংশ প্রশ্নই বাংলা সাহিত্যে আসে প্রেমের হাত ধরে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখি প্রেম একটা বড় ফ্যাকট (Fact)। প্রেমই কোনো নর বা নারীকে খলতার দিকে নিয়ে যায়। কখনো কখনো সম্পদ আছে, জায়গা-জমি আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রেম বিষয়টি প্রধান হিসেবে দেখা দেয়। এবং সেক্ষেত্রে যে খল চরিত্র, যখন বোঝে তার কাঙ্ক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিকে আর পাওয়া সম্ভব নয়, তখন যে তাকে পেল তার বিরুদ্ধে সে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আসলে যে কাজটি করে তা হল সেটা অন্য কাউকে চূড়ান্তভাবে পেতে না দেওয়া। এটিও তার একটা ভয়ঙ্কর খলতার পরিচয়। বাংলা সাহিত্যে আমরা এরূপ অসংখ্য চরিত্র পাই। মশাররফ হোসেনের 'জায়েদা' চরিত্রকে আমরা এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করতে বা আলোচনায় আনতে পারি।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, খলতা মানুষের জীবনের একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গা, তার প্রবৃত্তি, তার বৃত্তি সবচেয়ে খারাপ জায়গা, অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গা, গুহার মত এবং সেই গুহায়িত জায়গায় দাঁড়িয়ে একটি নারী বা একটি পুরুষ যখন আচরণ করে তখন তার আচরণ আসলে মানুষের সভ্যতার বিপরীতে দাঁড়ায়, মানবিক মূল্যবোধ চেতনার বিপরীতে দাঁড়ায় এবং মনুষ্যত্ববোধের বিপরীতে দাঁড়ায়। খল-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের ক্ষেত্রে ঐ কালের প্রভাবও লক্ষণীয়। ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার বা কবি বা শিল্পী ইচ্ছা করেই এই চরিত্রগুলোকে আনে আবার কখনো কখনো দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কিন্তু কেউ কেউ খল-চরিত্র তৈরিই করে না।

খল-নারীকে অনেকে খল বলতে চান নি। তারা 'খল' শব্দটির পরিবর্তে 'ক্রূর' কিংবা 'অসুখী' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। সমালোচকরা মনে করেন-যারা সামাজিক ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করে। সামাজিক ব্যবস্থায় তাদের কর্ম যদি কারও ক্ষতি করে এবং কোনো উদ্দেশ্যে তা করে। সমাজ ব্যবস্থা, স্বাভাবিকভাবে কিংবা ঐশ্বরিক কারণে একটা মানুষ নীচ, কুটিল বা ক্রূর হতে পারে। আরেকটা কারণ হচ্ছে পারিপার্শ্বিকতায় পড়ে সে ক্রূর। সমাজের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে সেখানে রয়েছে নানা রকম নিষ্পেষিত শ্রেণি। উদাহরণ স্বরূপ-বিধবা শ্রেণি বা Female Bind থাকে এরূপ শ্রেণি, পারিবারিকভাবে অসুখী শ্রেণি। প্রতিটা নারী যদি তাদের সৃজনশীলতা, তাদের স্বাভাবিক অনুভূতি সেগুলো প্রকাশের সুযোগ পেত, যদি সে সংসার পেত, আরাম পেত, স্বামী পেত, সন্তান পেত অথবা সে যদি একটা পেশাগত পরিচয়, খ্যাতি, আনন্দ, ভালোবাসা, অর্থ, ক্ষমতা পেত তাহলে সে হয়তো তা করতো না। মানুষের কিছু সহজাত চাওয়া আছে। একেকটা মানুষ একেকটা জিনিস বেশি চায়। যেমন: রোমান্টিক মানুষেরা রোমান্টিকতা বেশি চায়, একটু রাজনৈতিক (Political) মনের মানুষরা ক্ষমতা চায়, আবার অধিকাংশ মানুষ সবকিছু একটু একটু চায়, আবার কিছু মানুষ আছে তারা কিছুই চায় না। তারা ক্ষমতাটাও চায় না, সংসারটাও চায় না। যেমন কিছু পুরুষ রয়েছে যারা ঘরের এক কোণায় পড়ে থাকতে চায়। একটু আড্ডা কিংবা বই পড়ে দিন কাটায়, যাদেরকে আমরা যুগে যুগে অলস বলি। একেকটা চরিত্র একেকভাবে তাদের মৌলিকতা প্রকাশ করে বা বলা যেতে পারে বিকশিত হয়। এখন এই মৌলিকতা, বিকশিত হওয়াটা যদি উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহে বিঘ্ন ঘটায় তাহলে হয়তো তাকে খল বলা যেতে পারে। তথাকথিত খল বা বিকৃত রূপ দেখা যায় 'দুর্গা' চরিত্রে। সাহিত্যে শাকচুন্নি, ডাইনী

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ অনেক কথা এসেছে। কিন্তু এগুলো পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, ঔপন্যাসিকদের দেওয়া বা তাদের তৈরি। খুব কম মহিলা রয়েছেন যারা সাহিত্য, উপন্যাস এগুলো লিখেছেন। কেবল বাংলাদেশের কথা যদি ভাবা যায়, তবে তা বোঝা যায়, এমন কি বিদেশী সাহিত্যেও তেমন লেখা হয় নি। সুতরাং বলা যায় 'খল-চরিত্র' কোনো পুরুষ সাহিত্যিকের দেওয়া অভিধা। আবার নায়িকা চরিত্রগুলোও পুরুষের মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরি। 'খল' চরিত্রটি পুরুষ তার মনের সব অন্ধকার দিয়ে তৈরি করেছে। উভয়ই পুরুষের তৈরি। এবং এখানে একটা যুক্তি হচ্ছে যে নায়িকাটাও তার মনের মাধুরী মিশিয়ে হচ্ছে আবার সেই মাপকাঠিতেই আবার 'খল' চরিত্র তৈরি হচ্ছে। দুটোই তো তাদের তৈরি। যদি শব্দটি ডাইনী হিসেবে নেই, রূপ কথার ডাইনী তাহলে দেখা যাবে সেই ডাইনী পুরুষের সৃষ্ট একটি ক্ষমতা এবং যেই নারী ক্ষমতাসম্পন্ন তাকেই ডাইনী, ডাকিনীরূপে চিহ্নিত করা হচ্ছে। যে নারীর ক্ষমতা নেই, সে নায়িকা হয়ে যাচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। এবং 'খল' চরিত্র সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সেই ক্ষমতাটা আমরা বিকৃতভাবে ব্যবহার হতে দেখছি কারণ সেটার স্বাভাবিক প্রকাশের ব্যবস্থা সমাজ করে দিচ্ছে না। পুরুষরা সর্বদা নিজেদের ক্ষমতাশীল মনে করে অথবা নিজেদেরকে ক্ষমতাশীল হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয় অথচ ক্ষমতাশীল নারীকে তারা চায় না। যখন একটা নারী তার ভিন্ন প্রকাশ (Deferent), একটা ভালো লাগা বা একটা প্রত্যাখান বা একটা বাসনা প্রকাশ করে, তখন সমাজ ব্যবস্থা সেই নারীকেই একটা 'খল' চরিত্রে ঠেলে দেওয়া হয়। এবং বলা হয় সেই নারী সমাজ ব্যবস্থা নষ্ট করছে, সামাজের শৃঙ্খলা নষ্ট করছে, একটা সংসার নষ্ট করছে। সমাজে পুরুষ ও নারীকে Trapezium (চতুর্ভুজের দুটি সমান্তরাল রেখা) করে দেখা হয় না। একটা পুরুষ যখন সংসার নষ্ট করে তখন সে হয়ে যায় মহানায়ক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত কে কখনও খলনায়ক হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয় না। 'খল' বলা হবে তাকে যে বল পূর্বক অত্যাচার করে দুর্বলের উপর; সে নারী হোক, পুরুষ হোক।

'খল' হবে সে, যে বলটাকে নির্যাতনের জন্য ব্যবহার করছে দুর্বলর উপরে। নারী হোক পুরুষ হোক সৎ ও সুন্দর সে, যে শক্তিটাকে অপব্যবহার করে না। এখন আমরা একটা পুরুষ চরিত্রকে 'খল' বলব যখন সে একটা দুর্বলকে নিপীড়ন করে। সেদিক থেকে রাবণ খল না, যেটা মধুসূদন দেখিয়েছেন। কারণ তিনি তো সীতাকে দুর্বল দেখে নিপীড়ন করে নি। সতীত্ব একটা বিরাট গুণ কিন্তু যখন কেউ সেটা হরণ করে তখন সে 'খল'। এখন সমাজ যে নারীগুলোকে খল বলছে তারা সবল ছিল কিনা, সমাজ তাদের সবল হওয়ার সুযোগ দিয়েছে কিনা, তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বলের ওপর নিপীড়ন করেছে কিনা, এগুলো বিবেচনার বিষয়। যদি সেগুলো থেকে থাকে তাহলে বলা যায়, তাদের সেই শক্তিশালী কাঠামো সেটা তাদের সন্দেহ (Suspect)-এর প্রকাশ যাকে কখনো কখনো খল বলা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালি* উপন্যাসের কথা বলা যায়। যেখানে বিনোদিনী, আশালতা ও মহিন-এর

Dhaka University Institutional Repository

সংসারে দুঃখ বহন করে নিয়ে আসে। এখানে কিন্তু বিনোদিনী, আশালতা ও মহিন-এর সংসারে দুঃখ বহন করে নিয়ে আসে। এখানে কিন্তু বিনোদিনী মানসিকভাবে শক্তিশালী ছিল। কিন্তু প্রতিটা নারী এমন দৃঢ়চেতা বা শক্তিশালী নয়। তাছাড়া বিনোদিনী শেষ পর্যন্ত আত্মপীড়নে ভোগে। আর যে আত্মপীড়নে ভোগে সে তা 'খল' হতে পারে না আর তাকে 'খল' বলাও যায় না। 'জেব-উন্নিসা' চরিত্রটিও অনুরূপ অনুশোচনাকারী। তৈলক্ততা খলতার একটা বৈশিষ্ট্য হতে পারে। নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের *আনোয়ারা* উপন্যাসে দুর্গার মধ্যে সেই তৈলক্ততার বিষয়টা ছিল। দুর্গাকে সমাজপতিরা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির সামাজিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সম্পদের দিক থেকে, সামাজিক শিক্ষা, আইন, তারপরে সম্পদ (property) এসব দিক থেকে দুর্গা শক্তিশালী ছিল না সামাজিক অসমতার সে স্বীকার। তাই তাকে খল চরিত্র না বলে অসুখী চরিত্র বলাই শ্রেয়।

খলতা নারীর একটা Negative দিক। এখন বাংলা সাহিত্যে কিংবা সমাজে দেখা যায় দু'শ্রেণির নারী There are good woman and bad women (ভালো নারী ও মন্দ নারী)। নারীর যে গুণগুলো রয়েছে সেটাই নারীত্ব। পুরুষের যে গুণগুলো দিয়ে আমরা পুরুষকে আলাদা করতে পারি। Famenin qualities and Massquline qualities. প্রকৃতির নর এবং নারী দুজনকে সৃষ্টি করেছে। তাদের মধ্যে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকবে, যে বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমরা তাদের আলাদা করতে পারি then they are man and woman যেমন টেবিলটার কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে যার যার দ্বারা আমরা বলতে পারি Table টি Chair থেকে আলাদা। এখন সাহিত্য বলতে বলছে যে ভালো নারী যার মধ্যে কোমলতা আছে, যার মধ্যে মায়া-মমতা আছে। প্রীতি, ভালোবাসা, Nurssing, Careing যে গুণগুলো সেগুলো বেশি অর্থাৎ সেবার জন্য বা সবসময় নিজেকে অন্যের জন্য এ বিষয়গুলো যারা পালন করে সে হচ্ছে ভালো নারী। এখন যাদের মধ্যে এই গুণগুলোর অভাব রয়েছে, তাদেরকে হয়তো খল নারী বলা হচ্ছে।

এখন এই গুণগুলোর দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এর মধ্যে Bravecy নেই, অর্থাৎ সাহসী হওয়া এই জিনিসটা নেই। বলা যেতে পারে 'প্রতিবাদী' এই গুণটা নেই। কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে সাহসী হওয়া, প্রতিবাদী হওয়া, আবার কোমল হওয়া অর্থাৎ Hole Human Qualities থাকা উচিত। এখন কতকগুলো কেবল নিরীহ গুণ নারীর থাকবে কিন্তু সাহসী হওয়া কিংবা প্রতিবাদী হওয়া অথবা মননশীল প্রভৃতি গুণগুলো শুধু পুরুষের থাকবে বিষয়টা এরকম না। নারীর ভেতর ঐ সমস্ত প্রতিবাদ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেখা গেলে তাহলে তাকে বলা হচ্ছে 'পুরুষালী' মেয়ে মানুষ। আর ঠিক একইভাবে পুরুষের মধ্যে যদি কোমলতা ইত্যাদি থাকে তখন বলা হয় মেয়েলী পুরুষ।

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েলিপনা বা পুরুষালী এই ভাষাগুলো পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দেওয়া। তাহলে এগুলো হচ্ছে Gender Term.অর্থাৎ Society contract.তাহলে আমরা বলছি যে নারীর মধ্যে যে গুণগুলো আছে তা স্বভাব সুলভ, সেইগুলোকে বলছি আমরা বিনয়, নম্র, ভদ্র ইত্যাদি, এগুলো থাকলে আমরা বলছি ভালো নারী আর না থাকলে বলছি খল-নারী। যেমন রবীন্দ্রনাথে আমরা দেখি 'চিত্রাঙ্গদা' তার মধ্যে দুটো গুণ ছিল। আমরা *বিষাদ-সিন্ধুতে* এরকম প্রতিবাদী নারী সাহস, জেদ বিক্রমের একটা দিক আমরা লক্ষ করি। তাই Definitly বলা যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নিজেই তৈরি করেছে নারীর Position টা। খল-নারী বলে নারীকে নিম্নশ্রেণিভুক্ত করতে বা ঐ স্তরে নামিয়ে দেবার পূর্বে দেখতে হবে তার মধ্যে কোনো প্রতিবাদ কাজ করছে কিনা, বিক্রম কাজ করছে কিনা তার ভেতর দ্রোহের ভাব কাজ করছে কিনা এই বিষয়গুলো। দর্শনে সেটাকে বলা হয় অপরিহার্যতা। বিষয়টি অপরিহার্যভাবে সম্পর্কিত কিনা। একজন নারী যদি প্রতিবাদী হয়, তার ভাষা যদি ঐ রকম হয় তাহলে দেখা যাবে তার সঙ্গে মহত্ত্ব বা সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের সঙ্গে তাদের অপরিহার্য কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া ও ধরনের আচরণের Social vs Phychological ব্যাখ্যা রয়েছে কিন্তু তা সমাজ গ্রহণ করতে চায় না।

সমাজের perception টা হচ্ছে It's verificy অর্থাৎ ভিন্নতা। কারণ তাহলে সেখানে নারীর একটা Leading Point থেকে যায়। কিন্তু বর্তমানে নারীবাদ সমতার কথা বলে। নারীবাদে বলা হচ্ছে না যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে উচ্ছেদ করে নারীতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা। নারীবাদ যখন প্রথম প্রথম আলোচনায় আসে তখন সমাজ বলতে বোঝানো হত পুরুষের যা যা আছে বা প্রাপ্য নারীরও তাই থাকতে হবে। কিন্তু এখন নারীবাদ বলতে তা বোঝানো হচ্ছে না। সমতা বলতে বোঝানো হচ্ছে পাশাপাশি থাকা, Complementary বা পরিপূরকভাবে হিসেবে থাকা। কেউ কাউকে Dominate করবে না।

'খল' নর ও নারী চরিত্রের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে, তা নর ও নারী চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এমন নয়। বরং প্রত্যেক রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হতে পারে। যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো সময় যেকোনো ব্যক্তির চোখে 'খল' হয়ে দেখা দিতে পারে। সুতরাং উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে কোনো নারী বা নরকে 'খল' বলে আখ্যায়িত করা যায় না। সেজন্য তার প্রেক্ষাপট জানা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থনির্দেশনা

১. আহমদ শরীফ (সম্পাদক), *বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ১৩৯।

২. Zillur Rahman Siddiqui (Editor), *Bangla Academy English-Bengali Dictionary* (Dhaka: Bangla Academy,1994) P-31

৩. সব্যসাচী সাহা, *মনোবিজ্ঞান সমাজ* (রাজশাহী: তকদীর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, ২০০১), পৃ.১৬৪।

৪. Allport. G.W, *Personality:Apsychology interpretation* (New York: Holt 1937), P-52.

৫. আহমদ শরীফ (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮০।

৬. Mohammad Ali/Mohammad Moniruzzaman/Jahangir Tareque (Editors), *Bangla Academy Bengali-English Dictionary* (Dhaka: BanglaAcademy, 2007), P. 852

৭. আহমদ শরীফ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৪।

৮. Zillur Rahman Siddiqui (Editor), তদেব, পৃ. ৫৮৬।

৯. সব্যসাচী সাহা, তদেব, পৃ. ১৬৫।

১০. জহিরুল হক, *সমাজ, মনোবিজ্ঞান* (রাজশাহী: প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ৫৮।

১১. জহিরুল হক, তদেব, পৃ. ৮০।

১২. তদেব, পৃ. ৮৩।

১৩. সব্যসাচী সাহা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

১৪. তদেব, পৃ. ১৮০।

১৫. তদেব, পৃ. ২০৫-২০৬।

১৬. নমিতা খান (সম্পাদক), *সংবাদপত্র, নারী ও সমাজ* (ঢাকা: সূচিপত্র প্রকাশন, ২০০৫), পৃ. ৮৯।

১৭. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *সমাজ-মনোবিজ্ঞান* (কলিকাতা: ব্যানার্জী পাবলিসার্স, ১৯৮০), পৃ. ৯০।

১৮. তদেব, পৃ. ১৬১।

১৯. তদেব, পৃ. ১৬২।

২০. তদেব, পৃ. ১৬৪।

২১. ওয়াহিদুন নবী, দেওয়ান, *মানসিক ব্যাধি* (ঢাকা: এশিয়ান প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮৮), পৃ. ১৩৯।

২২. তদেব, পৃ. ১৪০।

২৩. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. *xxi*

Dhaka University Institutional Repository

২৪. তদেব, পৃ. ৮৫।

২৫. তদেব, পৃ. ৮৯।

২৬. সব্যসাচী সাহা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১।

২৭. তদেব, পৃ. ১০৩।

২৮. প্রমোদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০।

২৯. তদেব, পৃ. ২০২।

৩০. তদেব।

৩১. সব্যসাচীবন্ধু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮।

৩২. তদেব, পৃ. ২৫২।

৩৩. তদেব, পৃ. ২৫৩।

৩৪. Ruch.F.L, *Psychology and Life* (Scott Foresan and Co, 1995), P-45

৩৫. সব্যসাচী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮।

৩৬. তদেব, পৃ. ২১২।

৩৭. ওয়াহিদুন নবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

৩৮. সব্যসাচী সাহা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩।

৩৯. তদেব, পৃ. ১৬৩

৪০. Thorpe. W.H, *Psychological Foundation of Personal* (London: Methane, 1961), P-48.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে চরিত্র সৃজন: রচয়িতাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ

এক জন সাহিত্যস্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে প্রকাশ করেন কিছু আধার অবলম্বন করে। গদ্যশিল্পী, বিশেষ করে উপন্যাসশিল্পী মুখ্যত চরিত্রকে বেছে নেন তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপনার জন্য। উপন্যাসটি যদি নিরীক্ষাধর্মী হয় এবং সেখানে আঙ্গিকের নিরীক্ষা প্রাধান্য পায় তাহলে কখনো সেখানে 'চরিত্র' গৌণ হতে পারে। কিন্তু তা না হলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই 'চরিত্র' একটি উপন্যাসের মুখ্য বিবেচনার তালিকায় থাকে। এক জন ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের কাহিনির সূচনা, বিন্যাস, উৎকর্ষ এবং সর্বোপরি পরিণতি ঘটান চরিত্রসমূহের মধ্য দিয়ে। লেখকদের মন ও মানস, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-প্রকৃতি কিংবা মনোভাব ও ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে কেবল তাদের দ্বারা চিত্রিত চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে নয়, অঙ্কিত চরিত্রসমূহের মধ্য দিয়েও। কোনো লেখকের মতাদর্শ, নৈতিকতাবোধ; এ সমস্ত বিষয়ও ফুটে ওঠে তাঁর শিল্পীমানসে রচিত চরিত্রসমূহে। কখনো লেখক একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান পরিকল্পিত ধারা প্রবাহের মধ্য দিয়ে; সেটাকেও প্রস্ফূটিত করেন তাঁর রচিত চরিত্রসমূহের আচার-আচরণে, সংলাপে। চরিত্রের মাধ্যমে যখন কোনো বিষয় স্পষ্ট করা সম্ভব হয় না, তখন নিজেই বিষয়টি সম্পর্কে বর্ণনা করেন। শৈলীগত বিবেচনাকে শাব্দিক অর্থে ব্যবহার করলে যে বিষয়গুলো এসে যায়, তা হল চরিত্রের উপস্থাপন ভঙ্গি, চরিত্রের সংলাপ, লেখকের বিবৃতি। লেখকের বিবৃতির সঙ্গে চরিত্রের আচরণ গত সন্নিবেশ, চরিত্রসমূহের সংলাপ, চরিত্রসমূহে লেখকের ব্যবহৃত বিভিন্ন রস, অলঙ্কারসহ আরও নানাবিধ বিষয়। এই অধ্যায়ে কেবল স্বল্পপরিসরে লেখকের বর্ণনারীতি, ভাষাব্যবহার, সংলাপ, অলঙ্কার প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হবে।

উপর্যুক্ত ভাষ্যানুযায়ী মূল 'খল' নর ও নারী নাম্নী চরিত্র রচয়িতাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ বিবেচনায় আনার প্রয়াস পাব-

ঠকচাচা

ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-৮৩) *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে পরিচিত। তবে অনেকে উপন্যাস না বলে একটি সামাজিক নক্সা হিসেবে বিবেচনা করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। *আলালের ঘরের দুলাল* উপন্যাসটিকে ঔপন্যাসিক স্পষ্ট দুইটি ভাগে বিভাজন করেছেন। কয়েকটি চরিত্রকে ইতিবাচক এবং কয়েকটি চরিত্রকে নেতিবাচক হিসেবে তুলে ধরেছেন। ঔপন্যাসিক মূলত তৎকালীন সমাজের চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যেই এরূপ বিভাজন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের নেতিবাচকতা তুলে ধরার জন্য উপন্যাসে 'ঠকচাচা'র মতো চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। 'ঠকচাচা' ওরফে 'মোকাজান' চরিত্রটিকে শুরু থেকেই নেতিবাচক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে তৎকালীন সমাজে কীভাবে ঠক্‌বাজি, স্বার্থবাদী, ধুরন্দর ব্যক্তিরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতো।

ঠকচাচার অনেক গুণের মধ্যে একটি গুণ হলো তিনি অনেক বেশি কর্মপটু মানুষ। তিনি কোনো কাজকে নেতিবাচকভাবে নেন নি। তার কাছে কাজটাই আসল, হোক সেটা নেতিবাচক কিংবা ইতিবাচক। তাই শুরুতেই তার কর্মপটুত্বের কথা জানা যায়।

> মোকাজান আদালতের কর্মে বড়ো পটু! অনেক জমিদার নীলকর প্রভৃতি সর্বদা তাহার সহিত পরামর্শ করিত। জাল করিতে-সাক্ষী সাজাইয়া দিতে-দারোগা ও আমলাদিগকে বশ করিতে- গাঁতের মাল লইয়া হজম করিতে-দাঙ্গা হাঙ্গামের জোটপাট ও নয়কে হয় করিতে, নয়কে হয় কবিতে তাহার তুল্য আর একজন পাওয়া ভার।[১]

ঠকচাচার শিক্ষার বিষয়ে কোনো কিছু স্পষ্ট করে বলা না হলেও তার কাজের ধরন দেখে অনুমান করা যায় তিনি শিক্ষিত। কারণ উপন্যাসে বলা হয়েছে যে তিনি অর্থ উপার্জন করেন বুদ্ধির জোড়ে। সুতরাং ঔপন্যাসিক ঠকচাচার মাধ্যমে সেই সব শিক্ষিত শ্রেণিকে চিহ্নিত করেছেন, যারা শিক্ষিত হয়েও এ ধরনের নেতিবাচক কাজের সঙ্গে কীভাবে তারা জড়িয়ে পড়েন তাদের স্বরূপ উন্মোচন করার জন্য।

> ঠকচাচা ও ঠকচাচী দুজনেই রাজযোটক-স্বামী বুদ্ধির জোরে রোজগার করে স্ত্রী বিদ্যার বলে উপার্জন করে।[২]

ঠকচাচাকে সেই সমস্ত মুসলিম মুখোশধারীদের প্রতিনিধি চরিত্র হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে যারা সমাজে এক ধরনের ছদ্মবেশ ধারণ করে লোক ঠকায়, প্রপঞ্চ করে। তার পোশাক দেখে বোঝার উপায় নেই যে তার দ্বারা সমাজ কিংবা ব্যক্তির কোনো অপকার হতে পারে। অথচ তিনি তাই করেছেন। গায়ে সুন্দর পোষাক, মাথায় পাগড়ি, পায়ে নাগরা জুতা, হাতে তসবি, মুখে ধবল দাঁড়ি- যা দেখে যে কেউ ভেবে বসতে পারেন যে, তিনি অনেক নেক বান্দা। এভাবে প্রতারিত হয় এবং হচ্ছে সমাজের অনেক মানুষ। ঠকচাচা জেনে বুঝেই এই বেশ ধারণ করেছেন নিজের কাজ বা উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য। ঔপন্যাসিকের ভাষায়-

> ঠকচাচার মাথায় মেস্তাই পাগড়ি, গায়ে পিরহান, পায়ে নাগোরা জুতা, হাতে ফটিকের মালা-বুজর্গ ও নবীর নাম নিয়া এক একবার দাড়ি নেড়ে তসবি পড়িতেছেন কিন্তু সে কেবল ভেক। ঠকচাচার মতো চালাক লোক পাওয়া ভার।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

ঠকচাচা অনেক বাস্তববাদী মানুষ। তিনি বাস্তবতার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছেন। তিনি মনে করেন পৃথিবীতে ভালো মন্দ দু'ধরনের লোক আছে; উভয় শ্রেণির মানুষই থাকা প্রয়োজন। সবাই ভালো হলে দুনিয়া চলবে না। কেউ ভালো হবে, কেউ মন্দ হবে এটাই দুনিয়ার নিয়ম। তিনি মন্দ হওয়াটাকেই বেছে নিয়েছেন। কারণ মন্দ হওয়াতে লাভ বেশি। তার মতে দুনিয়ার সব লোকই মন্দ। তাই তিনি বলেছেন-

> দুনিয়াদারি করিতে গেলে ভালা, বুরা দুই চাই-দুনিয়া সাচ্চা নয়-মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করবো?[৪]

ঠকচাচার উপর্যুক্ত কথার মাধ্যমে পার্থিব জীবনযাত্রার সঠিক বাস্তবতার জীবন্ত উদাহরণ প্রকাশ পেয়েছে। ঠকচাচার সিদ্ধান্ত হয়তো ঠিক ছিল না কিন্তু এই চরম বাস্তবতাকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সুতরাং বাস্তবতার আলোকে ঠকচাচাকে পুরোপুরি দোষারোপ করা চলে না। নৈতিক দিক থেকে বিচার বিবেচনা করলে ঠকচাচার চিন্তাচেতনাকে গ্রহণের সুযোগ নেই কিন্তু বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে, তিনি এক জন চরম বাস্তববাদী এক জন ব্যক্তি। নৈতিক বিবেচনায় দোষী হলেও বাস্তবতার আলোকে তিনি চলনসই।

ঠকচাচা বুদ্ধিমান সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ বুদ্ধি না থাকলে প্ররোচনা করা যায় না। কাউকে প্রভাবিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সেই কাজ ঠকচাচা অনায়াসে করে গেছে। শুধু একটি বিষয়ে নয় কিংবা এক জন ব্যক্তিকে নয়, দিনের পর দিন , একের পর এক জনকে প্ররোচিত ও প্রতারিত করতে হলে যথেষ্ট বুদ্ধি খাটানোর প্রয়োজন হয়; সেটা ঠকচাচার ছিল। নইলে শিক্ষিত এবং সমাজের বোদ্ধা ব্যক্তিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, কখনো টপকিয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং নিঃসন্দেহে ঠকচাচা বুদ্ধিমান সে বিষয়ে কোনো তর্ক অনাবশ্যক।

> মুই চুপ করে থাকবার আদমি নয় দোশমন পেলে তেনাকে জেপ্টে, কেমড়ে মেটিতে পেটিয়ে দি-সৌদাগরি কাম পেলে মুই রোস্তম জালের মাফিক চলব।[৫]

ঠকচাচা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অপরাধ করলেও তিনি অত্যন্ত সাহসী মানুষ। অনেক বিপদে তিনি সবাইকে সাহস যুগিয়েছেন। মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে মামলা জেতার পর ফেরার সময় নদীতে নৌকায় থাকাকালীন কালবোশেখী ঝড় এলে এবং নৌকা ডুবডুব হলেও তিনি ভরসা দিয়েছেন সবাইকে। বিপদে ধৈর্য হারাতে নিষেধ করেছেন। বাবুরামবাবু এবং তার ছেলে মতিলালকে বিভিন্ন কাজে অভয় দিয়েছেন। সকল মামলা থেকে তিনি রক্ষা করার জন্য কথা দিয়েছেন। সাহস দিয়েছেন। নিজে মনে মনে ভয় পেলেও অন্যদের সাহস ধরে রাখতে আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদের মামলা এবং নিজের করা মামলা

Dhaka University Institutional Repository

থেকে রক্ষা করার জন্যও সাহস দিয়েছেন। তার মতে পুরুষ মানুষ মাত্রই মামলা আসবে যাবে। তাতে কোনো সমস্যা নেই। কোনো ভয়েরও কিছু নেই। তার মতে-

> মুই বুক ঠুকে বলছি যেত্না মামলা মোর মারফতে হচ্ছে সে সব বেলকুল ফতে হবে- আফদ বেলকুল মুই কেটিয়ে দিব- মরদ হইলে লড়াই চাই-তাতে ডর কি?[৬]

আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসের প্রধান গুণ এর ভাষা। সর্বসাধারণের বোধগম্য সরলভাষা। সাধুভাষার যুক্ত ক্রিয়াপদের পরিবর্তে চলিত ভাষার ধাতুর ব্যবহার। তদ্ভব ও দেশি শব্দের সুপ্রচুর প্রয়োগ, সমাসযুক্ত পদের পরিবর্জন, কথ্য ভাষার ব্যবহৃত ফারসি শব্দের এবং কথ্য ভাষা সুলভ বাক্যাংশ বা ইডিয়াম এবং প্রবাদ বাক্যের প্রয়োগ-এটি মোটামুটি *আলালের ঘরের দুলালের* ভাষায় বৈচিত্র্য এনেছে। দোষের মধ্যে প্রধান হল একই সঙ্গে ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপের ব্যবহার। 'ধেয়ে আইল' চোখ টিপতে লাগিলেন ইত্যাদি অনেক সময় চলিত ক্রিয়ারূপকে সাধুরূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। যেমন উঠতেছেন (উঠিতেছে), পিছিয়া (পিছাইয়া) ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায়, উপন্যাসটির ভাষা এক প্রকারের মিশ্র ভাষা। তবে উপদেশের ক্ষেত্রে প্রায় সাধু ভাষা পাওয়া যায়। তবে এ কথা সত্য যে তৎকালীন সাহিত্যে প্রচলিত ছিল সংস্কৃত নির্ভর সাধুভাষা। গদ্যরীতির সন্ধি সমাসের আভিধানিক দুরূহ শব্দ নির্বাচন এবং যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার সহজ বিষয় ছিল না। তাই সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ সে সময়ের জন্য ছিল একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। উপন্যাসটিতে বাস্তব শিল্পকলার অঙ্গরূপে চলিত ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে ভাষা শিক্ষাবিদের হাইপোট্যাক্সিস ও প্যারাট্যাকসিসের ধারনা আমাদের সাহায্য করেছে। ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য হলো, পিরিয়ড বা একাধিক খণ্ডবাক্য সংবলিত দীর্ঘ জটিল ও পূর্ণাঙ্গ বাক্য, যার প্রতিটি অংশই সুনিয়ন্ত্রিত, বাক্যের সমগ্র রূপের আনুগত্যমূলক খণ্ড শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তার ছন্দোময় আলংকারিক প্রকরণসমূহ অত্যন্ত জটিল। এই ধীর, মন্থর, কখনও কখনও নিশ্চল গদ্যরীতি হাইপোট্যাক্সিসরূপে চিহ্নিত অতি সংস্কৃত ভাষারীতি তার উদাহরণ। দেশজ চলিত রীতির বাক্য গঠনের মূল ভিত্তি সমন্বয়বিধান এবং প্যারাট্যাক্সিস, এই রীতিতে বাক্য ও বাক্যাংশগুলো পর পর কিছুট স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপিত হয়ে স্খলিত হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে থাকে দৃঢ়তা, প্রতিটা অংশই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রবাহিত হয়ে সজীব ধারাবাহিকতায় অর্থের সম্প্রসারণ ঘটায়, এই টুকরো, কাটা কাটা বাক্যের মৌখিক বিন্যাস ভাষার বাক্‌ছন্দের অনুগামী, চলমান জীবনের গতি ও নানা ছবি, পরিবর্তন চিত্রায়ণ ও উপন্যাসের অনুকাহিনীমূলক ও প্যানারোমিক বিস্তৃত দৃশ্যাবলির গঠনের উপযোগী। প্রবাদে প্যারাট্যাক্টিক গঠন প্রায় ধরা পড়ে, যেমন ইজি কাম, ইজি গো উপন্যাসটিতে এ ধরনের বাক্য ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। প্যারেন্থিসিস এর মতো বাক্য বা বাক্যাংশগুলো দুই এক জায়গায় কমা, সেমিকোলন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ড্যাশ চিহ্নের দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি গতির টানে প্রবাহিত হয়ে চলতে দেখা যায়। উপন্যাসটিতে অনেক জায়গায় প্রবাদ-প্রবচন এবং

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ধরনের বিশিষ্ট বাগভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলার দেশীয় সমাজ সংস্কৃতি ও ভাষার রীতির সঙ্গে লেখকের পরিচয় যে কত নিবিড় ছিল, তার থেকেই বোঝা যায়। কখনো কাহিনি, কখনো বা চরিত্রগুলোর উক্তিতে এ সমস্ত বিশেষ বা ভঙ্গির ব্যবহারে কাহিনী কথক নিজেই চরিত্রগুলোর মানসিকতায় ফুটে উঠেছেন। যেমন:

ঠকচাচা মনে মনে কহেন, "চাচা আপনা বাঁচা।"[৭]

হলো ধর, গদাধর ও মতিলাল গোকুলের ষাঁড়ের মত বেড়ায়। অথবা, ধনীদের সম্পর্কে -বাহিরে কোঁচার পান ঘরে ছুঁচোর কীর্তন। প্রবচনে পরিণত ভারতচন্দ্রের পঙ্‌ক্তি- বেল পাকলে কাকের কি, আমাদিগের কেবল অরণ্যে রোদন করা (বেণীবাবু), যেন গোমড়কে মুচির পাটন, আর নাচতে বসেছি ঘোমটাই বা কেন (বাঞ্ছারাম) প্রভৃতি। উপন্যাসের কোথাও কোথাও বিশিষ্ট দেশজ বাগ্‌রীতির বাক্য বা বাক্যাংশ বহুল প্রচলিত ও অপরিচিত উভয়ই ব্যবহৃত হয়েছে।

সকলেই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল- সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সকলেরই আপনার কথা পাঁচ কাহন।[৮]

ভাষা, সংলাপ প্রভৃতি বিষয়ে এমন বৈচিত্র্য শব্দ, বাক্য এবং প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসে এক বিরল দিগ্‌প্রতীম। বিশেষ করে, তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে এক দুরন্ত প্রচেষ্টা এবং সাহসী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ।

হীরা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯৯৪)-এর *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩) সামাজিক উপন্যাস। এখানে সামাজিকতার প্রায় সকলগুণই বিদ্যমান আছে; সমাজবাস্তবতা, সামাজিক, মানুষ, সামাজিক চিত্রকল্প, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি। সামাজিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবিও এঁকেছেন শৈল্পিক তুলির আঁচড়ে। আমাদের অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য অনুযায়ী আলোচ্য বিষয় কেবল 'হীরা' চরিত্রটি। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে হীরার শৈল্পিক দিকটি ফুটিয়ে তোলাই মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচ্য। প্রত্যেকটি উপন্যাসে লেখকের কিছু নিজস্ব ভঙ্গি (Style), নীতিকথন, চরিত্রসম্পর্কিত বিবৃতি প্রদান এবং মন্তব্য থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'হীরা' চরিত্রের একই সঙ্গে নানান দিক চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রথম দিকে তিনি হীরার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন; পরে আবার সেটাকে খানিকটা ক্লেদাক্ত করেছেন প্রয়োজনের তাগিদেই। সে ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি মন্তব্য করার পাশাপাশি নিয়তিকেও টেনে এনেছেন। সৌন্দর্য বর্ণনা প্রত্যেক ঔপন্যাসিকের একটা বিশেষ লক্ষণীয় দিক। বঙ্কিমচন্দ্রও হীরার রূপ সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

সচেতন ছিলেন। তাই তিনি সতর্কতার সঙ্গে শৈল্পিক দৃষ্টিতে তা বর্ণন ও চিত্রায়ণ করেছেন। তার রূপগত সৌন্দর্যকে অকৃপণ হস্তে এঁকেছেন।

১. হীরা আবার সুন্দরী-উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মাপলাশলোচনা।[৯]

২. আমার চেয়ে হীরা দাসী ও সুন্দরী (কুন্দনন্দিনীর ভাষ্য)[১০]

৩. মুখখানি ত দেখিতে মন্দ নয় (বঙ্কিমের বিবৃতি)[১১]

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হীরার একদিকে শারীরিক সৌন্দর্য অঙ্কনে অকৃপণ হয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে একটা মানসিক ক্লেদাক্তার বর্ণনা উপন্যাসের প্রথম দিক হতেই একটু একটু করে পাঠক মনে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে কুন্দনন্দিনীতে তার মায়ের স্বপ্ন দ্বারা আদিষ্ট হতে দেখা যায়। জননী কহিলেন,

এই শ্যামাঙ্গী নারীবেশে রাক্ষসী। ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।[১২]

উহার দ্বারা উপন্যাসে পারিবারিক পর্যায়ে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হবার পূর্বেই পাঠক হৃদয়ে সেই বীজ প্রবেশ করানো হয়েছে। এরপর ঔপন্যাসিক হীরাকে অনেক স্থলে 'পাপ হীরা', 'পাপিষ্ঠা', 'পাপ-হৃদয় হীরা', 'খলকপট' বলে অভিধায়িত করেছেন। ঔপন্যাসিকের হীরা সম্পর্কিত বিবৃতির ভেতর দিয়ে নেতিবাচক ও ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অন্যদিকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য। হীরার সৌন্দর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে এ ঘটনাটি ঘটতে দেখা যায়। তাকে 'সুন্দরী'; উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মাপলাশলোচনা বলেছেন আবার তিনিই তাকে হীরার মুখকে 'মেঘে ঢাকা চাঁদ' বলেছেন, তার চুলগুলোকে ফণা ধরা সাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সাপের সঙ্গে তুলনা সাধারণত নেতিবাচক দিক হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে লেখক হীরা সম্পর্কে তার নেতিবাচকতা বোঝাতে বলেছেন-

তবে হীরা অত্যন্ত মুখরা।[১৩]

ব্যক্তিমাত্রেই দোষ, ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে। হীরাও রক্তে-মাংসে গড়া এক স্বাভাবিক নারী। তাই তার ভালো গুণগুলোর পাশাপাশি ভুল-ভ্রান্তিগুলোকে তুলে ধরে সাম্যতা বজায় রেখেছেন। ফলে একবার নেতিবাচকতা, আরেকবার ইতিবাচকতা, লেখকের এরূপ দ্বৈতমুখিতা কিছুটা অসংলগ্ন মনে হলেও তা মূলত লেখকের ইতিবাচক ও সচেতন চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক গুণাবলির মধ্যে রূপগত সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি 'হীরা'র বুদ্ধিমত্তা এবং শুচিতা সম্পর্কে ইতিবাচকতা প্রকাশ করেছেন। 'হীরা' কোনো 'কুলটা' নারী চরিত্র নয় এরূপ মনোভাব লেখকের বর্ণনায় এবং হীরার মুখে প্রকাশ পেয়েছে। লেখকের ভাষায়-

> তাহার বুদ্ধির প্রভাবে এবং চরিত্রগুণে সে দাসীমধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণিত হইয়াছিল।[১৪]

আগের দিনে সমাজপতি, রাজা-বাদশা কিংবা সম্রাট মহালে দাসীবৃত্তির জন্য যে সমস্ত মেয়েদের স্থান দেওয়া হত, তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময়ের সম্পদশালী পরিবারের মেয়ে কিংবা তারা অবশ্যই সদ্ব্যংশজ। আর্থিক অনটনের কারণে হয়তো তারা রাজদরবার কিংবা জমিদার বাড়িতে কাজ নিত। রাজা, জমিদারও সদ্ব্যংশজ পরিবারের মেয়েদের দাসীবৃত্তির কাজে নিয়োগ দিত। হীরার পিতৃকুল ভালো এবং সে সদ্ব্যংশজ। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে লেখকের পাশাপাশি হীরার মুখ থেকেও বের হয়েছে সে 'কুলটা' নারী নয়। আবার জমিদার বাড়িতে যারা দাসীবৃত্তিতে নিয়োজিত হত তারা নিজ বুদ্ধিমত্তা ও চরিত্রগুণে রাজমহিষী কিংবা রাজা, জমিদারদের প্রিয়ভাজন হতে পারত। হীরার ভেতর সেই গুণ ছিল বলেই সে সূর্যমুখী ও জমিদার নগেন্দ্রের প্রিয়ভাজন হয়েছিল। তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ রূপে পাওয়া যায়। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় তাকে সূর্যমুখী ছদ্মবেশী দেবেন্দ্র তথা হরিদাসী বৈরাগীর রহস্য উৎঘাটনের দায়িত্ব অন্যান্য দাসী রেখে বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বাসের কারণে হীরার ওপর সেই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় হীরা সেই দায়িত্ব অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সুচতুরা নারীর মতই পালন করে। ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রের সঙ্গে যে কথোপকথন হয় সেখানেও তার বুদ্ধি মত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। দেবেন্দ্র রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে হীরা দেবেন্দ্রের কাছে ধরা পড়ে যায় এবং সেখানে যাবার কারণ জানতে চাইলে হীরা উত্তর দিয়েছে-

> কেবল আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়া ছিলাম।[১৫]

হীরার অজস্র গুণগান ঔপন্যাসিক নিজে করেছেন। হীরাকে সুন্দরী, বুদ্ধিমতি, রুচিবোধসম্পন্ন, দুঃসাহসিক, নির্লোভী, আত্মোপলব্ধিকারক, অনুশোচনাকারী এবং সর্বোপরি কৌতুকপ্রবণ করে তুলেছেন। হীরার রুচিবোধ সম্পর্কে জানতে হলে তার আপন গৃহের বর্ণনাই যথেষ্ট বলে মনে হয়। লেখক তার গৃহের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে 'দুইটি ঝরঝোরে মেটে ঘর। তাহাতে আলোপন-পদ্ম আঁকা-পাখী আঁকা-ঠাকুর আঁকা। উঠান নিকান-এক পাশে রাঙ্গা শাক, তার কাছে দোপাটি, মল্লিকা, গোলাপ ফুল।'[১৬] হীরার বাড়ির এই বর্ণনা সাপেক্ষে বলা যায় হীরা নিঃসন্দেহে সুন্দর গোছানো একটা সাংসারিক মেয়ে, যাকে আমরা বাঙালি-সুলভ বলি। কিন্তু বাঙালি নারীর সঙ্গে তার একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন। সংসারজীবী বাঙালি নারীরা গৃহস্থালীর কাজে লাগবে না এরূপ অন্য কোনো কিছু রোপণ

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত করে না। কিন্তু হীরার বাড়ির আঙিনায় শাক-সবজির পাশাপাশি সৌন্দর্যের আধান নানারকম ফুলের সমাহার লক্ষ করা যায়। তা জমিদার বাড়ি থেকে পাওয়া। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র অন্য দাসীদের বাড়ির বর্ণনা আনেন নি এবং এরূপ সাজানো গোছানো কোনো বাড়ির বর্ণনা দেন নি; দিলেও সেখানে পূর্ণাঙ্গ কোনো বাড়ির বর্ণনা থাকবে এমত ভরসা ছিল না।

সবার ব্যক্তিত্ব বা আত্মমর্যাদাবোধ এক নয়। কারো কম কারো বেশি। সেটা নির্ভর করে মূলত পরিবারের ওপর। সামাজিকতারও একটা প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই থেকে যায়। হীরার আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল, যা আলাদাভাবে মূল্যায়ণের দাবি রাখে এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই দাবি অনেকটাই পূরণ করেছেন। হীরার চারিত্র্য বিচার করতে গিয়ে সেটার পরিচয় বারবার পাওয়া যায়। দাসীবৃত্তি যে কোনো মর্যাদাপূর্ণ কাজ নয় তা সে বোঝে। সে অন্যান্য দাসী অপেক্ষা সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করার পরও তার আত্মমর্যাদা বোধ অক্ষুণ্ন থেকেছে। তাই সে বলেছে,

> যদি আর দাসীপনা করিতে না হয়, এমনটা হয়, তা হলেই আমার হলো।[১৭]

হীরার জীবনে দেবেন্দ্র না এলে উপন্যাসের কোথাও আত্মমর্যাদাবোধের ঘাটতি পরিলক্ষিত হত না। তার এই আত্মমর্যাদাবোধ কেবল দেবেন্দ্রের কারণে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। দেবেন্দ্রের দ্বারা প্রতারিত না হলে তার মর্যাদাবোধ নিয়ে কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকতো না। প্রেমের কাছে আত্মমর্যাদাবোধ পরাজিত হয়ে প্রেমের মাহাত্ম্যই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। তবে এই পরাজয়কে 'মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ন' বলা যায় না। মর্যাদাবোধ আর প্রেমের ক্ষেত্র এক নয়, উভয়ই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

হীরাকে বঙ্কিম অনেক আত্মসংযমী চরিত্ররূপে প্রথমের দিকে তুলে ধরেছেন। লেখকের ভাষায়-'হীরা চিত্তসংযমে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালিনী এবং সেই ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, সে বিশেষ ধর্মভীতা না হইয়া ও এ পর্যন্ত সতীত্বধর্ম সহজেই রক্ষা করিয়াছিল।'[১৮] চিত্তসংযমের একটা বড় উপাদান হল লোভ। হীরাকে অনেকবার নানা বিষয়ে লোভ সম্বরণ করতে দেখা যায়। আর্থিক বিষয়ে, প্রবঞ্চক হিসেবে এবং নারীর সবচেয়ে বড় লোভের অলংকার; কমলমণির ঘোষিত হারেরও সে লোভ সম্বরণ করেছিল। দেবেন্দ্রের অঙ্গীকৃত অনেক অর্থের লোভও হীরা সম্বরণ করেছে।

> দেবেন্দ্র হীরাকে বহুল অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া, কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন। শুনিয়া ক্রোধে হীরার পদ্মপলাশ চক্ষু রক্তময় হইল কর্ণরন্ধে অগ্নিবৃষ্টি হইল। হীরা গাত্রোত্থান করিয়া কহিল-মহাশয়! আমি দাসী

Dhaka University Institutional Repository

বলিয়া এরূপ কথা বলিলেন। ইহার উত্তর আমি দিতে পরিব না। আমার মুনিবকে বলিব। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবেন।[১৯]

হীরার উপর্যুক্ত উক্তি থেকে তার আত্মসংযম, বিচার-বিবেচনা এবং দুরদর্শিতার পরিচয় মেলে। এখানে দেবেন্দ্রের টাকা নিতে সে যেমন অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তেমনি অপরদিকে কমলমণির হারের লোভও পরিত্যাগ করেছে। কুন্দনন্দিনী হারিয়ে যাবার পর কমলমণি হারের লোভ দেখিয়ে ছিল সকল দাসীদেরকে। হীরার গৃহে কুন্দনন্দিনী থাকলেও হীরা হারের লোভ পরিত্যাগ করেছে কেবল দেবেন্দ্রকে পেতে, দেবেন্দ্রকে জয় করতে।

কমলের হার দেখিয়ে এক একবার লোভ হইয়াছিল কিন্তু সে লোভ সম্বরণ করিল।[২০]

হীরা আত্মসচেতন নারী হওয়ায় সে তার অবস্থান, বিশেষত সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সে দেবেন্দ্রকে ভালোবেসেছে কিন্তু সে জানে এ প্রেমের পরিণতি সহজসাধ্য নয়। তার সামাজিক অবস্থান ও পরিচয় দেবেন্দ্রের সঙ্গে মেলে না। দেবেন্দ্র জমিদার নগেন্দ্রদের বংশজাত। দেদেন্দ্রের সঙ্গে নিজের তুলনা করে আপন মনে সগোক্তি করেছে-'ও পথে ও ধর্ম্মের কাঁটা।'[২১] সুতরাং হীরা জানে দেবেন্দ্র তাকে কোনোভাবেই মেনে নেবে না। কিন্তু তারপরও হীরার বিশ্বাস ছিল দেবেন্দ্র তাকে মেনে নেবে যখন সে জানবে হীরা সদ্ব্যংশজ। হীরার এও বিশ্বাস ছিল যদি সে নগেন্দ্রের বাড়ি দাসীবৃত্তি পরিত্যাগ করে তাহলে দেবেন্দ্র তাকে মেনে নিতেও পারে । সেই বিশ্বাস থেকে সে নগেন্দ্র-বাড়ির দাসীবৃত্তি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। যতক্ষণ না তা পারে ততক্ষণ সে নিজেকে সামলিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। সে বলেছে-

আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা আছে, আপনার ভালবাসার লোভ পড়িয়া কলঙ্ক কিনিব না।[২২]

হীরা যখন জানতে পেরেছে দেবেন্দ্র কুন্দনন্দিনীতে অতিরিক্ত অনুরক্ত তখন সে কিছুটা নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছে। এবং দেবেন্দ্রের চিন্তা থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করেছে। তাই একবার নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর গৃহ থেকে চলে এসেও, দ্বিতীয় বারের মত সেখানে ফিরে গেছে। করণ তার ধারণা ও বিশ্বাস 'পরগৃহের গৃহকর্ম্মাদিতে অনুদিত নিরত থাকিলে সে অন্য মনে এই বিফলানুরাগের বৃশ্চিকদংশন স্বরূপ জ্বালা ভুলিতে পারিবে।'[২৩] কিন্তু হীরা তা পারে নি। কেবল দেবেন্দ্রের ক্ষেত্রে হীরার জীবনের সঞ্চিত ব্রতসমূহের সবগুলোই একে এসে ধসে পড়েছে। ভালোবাসার কবলে পড়ে ইতঃপূর্বের হীরার সর্ব বৈশিষ্ট্য চমৎকারিত্ব ম্লান ও লীন হতে শুরু করে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষ্যানুসারে 'এই

Dhaka University Institutional Repository

ভালোবাসার মত এত বড় শক্তি, এত বড় শিক্ষক সংসারে বুঝি আর নাই।'[২৪] হীরা আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে বেদেন্দ্রের কৈতববাদে বিশ্বাস করে প্রতারিত হয়েছে। নিজের যে দুঃসাহসে দেবেন্দ্রকে প্রহরী দ্বারা ধাওয়া করিয়েছিল, তার ঠিক বিপরীত দুঃসাহসে দেবেন্দ্রের ডাকে তার গৃহে গেছে। দেবেন্দ্রকে, দেবেন্দ্রের ভালোবাসা পেতে সে অধর্মের পথে পা বাড়িয়েছে। তার মতে সে খামখা কারো মন্দ করিতে চায় না। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষমাত্রই আপনার জন্য কোনো না কোনো ক্ষেত্রে স্বার্থপর। এ কারণে কেবল হীরাকে আলাদা করে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'হীরা' চরিত্রকে কৌতুক-প্রবণরূপে রূপায়িত করেছেন। হীরাকে দেখা যায় সর্বদা উচ্ছল, প্রাণবন্ত, একটু দুষ্টু, একটু রোমান্টিক রূপে। সে অন্যকে হালকা খুঁচিয়ে আনন্দ পায়। অন্যদের সঙ্গে ছোট খাট কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-মজা করে সময়কে উপভোগ করে। উদাহরণ স্বরূপ:

১. গঙ্গাজল চুপি চুপি বলিল, "তোকে দেবেন্দ্র বাবু ডেকেছে"।
   - হীরা ..... হাসিয়া বলিল, "তুই কিছু পাবি নাকি?"[২৫]
২. মারি মিন্সের নাকে এক কিল।[২৬]

গায়িকা হিসেবেও 'হীরা' চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে মালতীর সঙ্গে যৌথকণ্ঠে গান করেছে। আর শেষ পরিচ্ছেদে জয়দেব গোস্বামীর দুটো পঙ্‌ক্তি বারবার গেয়েছে।
গানদ্বয়ের পঙ্‌ক্তি যথাক্রমে-

১. মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায় সাগর ছেঁচে তুলবো নাগর পতন করে কায়।[২৭]
২. স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মুণ্ডনং
   দেহি পদপল্লবমুদারং।[২৮]

প্রথম গানে প্রিয়জনকে পাবার প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। আর দ্বিতীয় গানে ঠিক তার বিপরীত বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। দেবেন্দ্র বিরহে প্রণয়বিহ্বল পূর্বদিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে 'প্রণয়ের বিষবাষ্প'[২৯] চারিদিকের বাতাসকে বেদনাবিধূর ও হাহাকারে ধ্বনিত করে তুলেছে।

'হীরা' চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্থান, কাল ও পাত্রভেদে সংলাপ ব্যবহার করেছেন। উপযুক্ততা অনুসারে সাধু, চলিত ও আঞ্চলিকতার ব্যবহার লক্ষণীয়। হীরা যখন সহকর্মী দাসী, যারা তার অপেক্ষা জমিদার বাড়িতে নিম্ন শেণিভুক্ত বলে বিবেচিত তাদের সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছে; তখন অনেকটা সাধারণ গ্রামীণ পটভূমিতে আঁকা অশিক্ষিত নারীর প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। হীরা বচনে এবং

Dhaka University Institutional Repository

চলনে স্বভাবসিদ্ধ চঞ্চলা, নির্ভীক এবং স্পষ্টভাষী। তার কথা ও কাজে প্রথম থেকে শেষাবধি কোনোরকম জড়তার ছাপ নেই। সে নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীকে কিছুটা সমীহ করে চলতো। আর কারো সঙ্গে সমঝোতা করতে দেখা যায় না। তবে কেবল দেবেন্দ্রর কাছে নিজেকে সমর্পণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। হীরার আচরণের মূল উৎস উচ্ছলতা, উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। একারণে তাকে সবাই কেবল ভয়ই পেত না, সমীহ করে চলতো-এটা তার অর্জন। তার নানামুখী সংলাপে তার বুদ্ধিমত্তা ও ঔচিত্যের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।

১. কে রে মাগি? (আঞ্চলিক)[৩০]

২. আবার বল ত? (সাধারণ চলিত)[৩১]

৩. ঘরের ভেতর এস ত? (সাধারণ চলিত)[৩২]

'১' নম্বর সংলাপটি হীরার অপরিচিত ব্যক্তিকে লক্ষ করে। কুন্দনন্দিনী যখন নগেন্দ্রের বাড়ি থেকে রাতের আঁধারে পালিয়ে ভুলক্রমে হীরার বাড়ির দরজায় ঠেস দিয়ে বসেছিল, তখন অপরিচিত দুষ্টু প্রকৃতির কোনো মানুষ ভেবে হীরা অনুরূপ মন্তব্য করেছে। হীরা একাকী একটা বাড়িতে এক বৃদ্ধা মাসীর সঙ্গে থাকে। নিজেকে বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে তাকে এরূপ কঠিন হতে হয়েছে। সে সময় এবং পাত্র ভেবে কথা বলে থাকে। স্থানটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার কাছে। তাই যথাক্রমে '২' নম্বর ও '৩' নম্বর সংলাপ বলেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে সে কঠোর নয় বরং সাহায্যসুলভ, নমনীয়, কমনীয়। আঞ্চলিকতা থেকে সাধারণ চলিতে তার সংলাপ রূপান্তরিত হয়েছে। আঞ্চলিকতা কিংবা চলিতেই কেবল নয় তার সংলাপে পরিশুদ্ধ সাধুরীতিরও ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ:

১. বুঝিয়াছি, তিরস্কারে পলাইয়াছ। আমি কাহারও সাক্ষাতে বলিব না।[৩৩]

২. মা ঠুকুরাণী কাঁদিতেছ কেন?[৩৪]

হীরার সংলাপের ভাষা বৈচিত্র্যময়। অনেকটা প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তিত হয়েছে। সংলাপের অবিমিশ্রতা তার একটা বড় ইতিবাচক দিক। আরেক উল্লেখযোগ্য দিক হল তার সংলাপে কোনো জড়তা কিংবা আড়ষ্ঠতা নেই; সহজ, সরল ও সর্বদা স্পষ্ট বাচনভঙ্গি। মানবীয় কৌতুকবোধও রয়েছে তার ভেতর।

১. যে দিন তুমি আমাকে উৎকৃষ্ট করিয়া নাথি মারিয়া তাড়াইলে, সেই দিন হইতেই আমি পাগল হইয়াছি।[৩৫]

২. এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।[৩৬]

হীরা নির্ভিক চিত্তে তার বক্তব্য প্রকাশ করেছে। নিজের প্রতি আস্থা, দৃঢ় মনোবল না থাকলে কেউ এভাবে বলতে পারে না। তার এই মনোবল এসেছে কিছুটা বংশীয়ভাবে আর কিছুটা নিজ ব্যক্তিত্বগুণে।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হীরার কথা ও সংলাপে অলঙ্কারের ব্যবহার করেছেন। সেখানে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, মালোপমা, শ্লেষ অলঙ্কারের যথোপযুক্ত ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এ সমস্ত অলঙ্কারের ব্যবহার 'হীরা' চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত করেছে। উপমা, উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে হীরা'র প্রেমের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। উৎপেক্ষার সাহায্যে হীরার চরিত্রের ভূমিকা সম্পর্কে আগাম বিবৃতি প্রদান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ:

> মুখখানি যেন মেঘঢাকা চাঁদ; চুলগুলি যেন সাপ ফণা ধরিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে।[৩৭]

এক বাক্যে দু'বার উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার হয়েছে। দুটো উপমাই 'হীরা' চরিত্রের নেতিবাচকতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম উপমার দ্বারা মনে হয় হীরা 'রামগরুড়ের ছানা' অর্থাৎ গোমরামুখো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয় বরং উল্টোটা। তাকে বেশির ভাগ সময়; দেবেন্দ্র কর্তৃক প্রতারিত হবার পূর্ব পর্যন্ত হাস্যজ্জ্বল কৌতুকপ্রবণ নারী হিসেবেই দেখা যায়। দ্বিতীয় উৎপ্রেক্ষার দ্বারা তার চুলকে মানে তাকেই বিষধর ভুজঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাকে ভয়ংকর নারী হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সে যা করছে তা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের বাইরে না কিংবা ঐচ্ছিক নয়। হীরার সৌন্দর্য বর্ণনায় মালোপমা'র ব্যবহার করা হয়েছে। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়-

> বস্তুতঃ সে চক্ষু সুন্দর। চক্ষু বৃহৎ নিবিড়, কৃষ্ণতার প্রদীপ্ত এবং বিলোলকটাক্ষ।[৩৮]

একটি মাত্র উপমেয়ের জন্য একাধিক উপমানের ব্যবহারে উপমা অলঙ্কারের যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তাকেই সাধারণভাবে বলা হয় মালোপমা। এখানে হীরার 'চক্ষু' উপমেয় যার জন্য একাধিক উপমান যথা বৃহৎ, নিবিড়, কৃষ্ণ, প্রদীপ্ত এবং বিলোলকটাক্ষ ব্যবহৃত হয়েছে। দেবেন্দ্র কর্তৃক প্রতারিত হবার পর তার বসন-ভূষণের অবস্থা বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র সাহায্য নিয়েছেন 'পরিকর' অলঙ্কারের। পঞ্চাশতম বা সমাপ্তি পরিচ্ছেদে হীরার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এভাবে-

> তাহার বসন অতি মলিন, শতধা ছিন্ন, শতগ্রন্থিবিশিষ্ট এবং এত স্বল্পায়ত যে, তাহা জানুর নীচে পড়ে নাই, এবং তদ্দ্বারা পৃষ্ঠ ও মস্তক আবৃত হয় নাই।[৩৯]

অপ্রধান এই অলঙ্কারকে বলা হয় পরিকর। 'একাধিক বিশেষণের ব্যবহারে অভিপ্রেত ভাবের চমৎকারিত্ব প্রকাশে যে অলঙ্কার বা সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয় তার নাম পরিকর।'[৪০] হীরার দুরবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার বসনের পরিচয় একাধিক বিশেষণ যোগে দিয়েছেন। 'অতি মলিন', 'শতধা ছিন্ন', 'শতগ্রন্থিবিশিষ্ট' ও 'স্বল্পায়ত' -এই মোট চারটি বিশেষণ ব্যবহার করে তার করুণ অবস্থার ভাব প্রকাশ করেছেন। তাই বাক্যটির অলঙ্কার হল পরিকর। শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কারের একটা বিভাজন কারণমালা। একটি কারণে কার্য পরবর্তী কার্যের কারণ হলে এবং এইভাবে কার্য-কারণ শৃঙ্খলা চলতে থাকলে যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয় বা অলঙ্কার হয় তার নাম কারণমালা।'[৪১] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হীরার করুণ অবস্থা ও পরিণতির বর্ণনা দিতে গিয়ে কার্যকারণ অলঙ্কারের স্মরণাপন্ন হয়েছেন।

> যখন আমি উন্মত্ত হইতাম, তখন আমি ঘরে পড়িয়া থাকিতাম; যখন ভালো থাকিতাম, তখন কাজকর্ম্ম করিতাম।[৪২]

হীরা নিজেই নিজের করুণাবস্থা বর্ণনা করেছে। কোন্ অবস্থার প্রেক্ষিতে তার দৈনন্দিন জীবনে কোন্ ঘটনা ঘটেছে তার বর্ণনা দিয়েছে। কারণ ও ফল অনেকটা চক্রাকারে প্রবাহিত হয়েছে। ফলে বাক্যটির অলঙ্কার হয়েছে কারণমালা। এরপর দেখা যায় হীরার বক্তব্যের অতিশয়োক্তি অলঙ্কার ধ্বনিত হয়েছে। সে কুন্দনন্দিনীকে দেবেন্দ্রের প্রতি তার প্রেমের গভীরতা বোঝাতে বলেছে-

> আমিও একজনকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভালোবাসিতাম
> অথবা, 'আমি তাহাকে লক্ষ স্বামীর অপেক্ষা ভালোবাসিতাম।[৪৩]

অলঙ্কার ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্রের অপার পারঙ্গম লক্ষ করা যায়। তিনি শ্লেষ অলঙ্কার ও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের যৌথ ব্যবহার করেছেন হীরার সংলাপের মাঝে। উদাহরণ:

> আশীর্ব্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।[৪৪]

প্রথম অংশ 'আশীর্ব্বাদ করি' অংশের মাধ্যমে অভঙ্গ শ্লেষ বক্রোক্তি অলঙ্কার বোঝোনো হয়েছে। 'আশীর্ব্বাদ' শব্দটি এখানে স্বাভাবিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বক্তা বলেছে এক অর্থে, শুনে অন্য অর্থ মনে হয়েছে; এমন হলে বিষয়টিকে অভঙ্গশ্লেষ বক্রোক্তি বলা হয়। দ্বিতীয় অংশ উৎপ্রেক্ষার মনে হয়, কারণ সেখানে 'যেন' দ্বারা সন্দেহ বোঝানো হয়েছে। উৎপ্রেক্ষার এই নিয়মানুযায়ী উৎপ্রেক্ষাই বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রমদা

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-'প্রমদা'কে পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অঙ্কন করেছেন। তার ইতিবাচক দিক হল সে লোভী হলেও পাপাচারী কিংবা খুনী নয়। সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপটে একজন স্বার্থপর ব্যক্তিমাত্রের প্রতিচ্ছবি প্রমদা। লেখক তার স্বপক্ষে অনেক কথা বলেছেন। 'প্রমদা'র আচরণ বংশানুক্রমিক। পিতা রামদেব চক্রবর্তী সম্পর্কেও লেখকের নেতিবাচক ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া ঔপন্যাসিক আরেকটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন, সেটা হল আর্থিক। রামদেব চক্রবর্তী গরীব ছিলেন; প্রমদাকেও অভাব অনটনের ভেতর দিয়ে বড় হতে হয়েছে। ফলে শশিভূষণের সঙ্গে বিয়ের পর যখন কিছু নগদ টাকা-পয়সা তার হাতে গেছে, তখন সে অনেক দিনের না পাওয়াকে পুষিয়ে নিতে চেয়েছে, তাতে 'অর্থই অনর্থের মূল' প্রবাদটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে প্রমদা'র জীবনে। প্রমদার সম্পর্কে লেখক আরও জানিয়েছেন প্রমদার জননী ও ভ্রাতা তার পাঠানো অর্থে গ্রাসাচ্ছাদন করে। সুতরাং পিতার পরিবার রক্ষার দায়িত্ব যখন নিজের ওপর অর্পিত হয়েছে, তখন প্রমদা অর্থকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে। প্রমদা পিতৃগৃহে নিয়মিত আহার যেখানে পায় নি, সেখানে নারীসূলভ অন্যান্য চাওয়া-পাওয়া যেমন গহনা, ভালো কাপড় প্রভৃতি; সেগুলো পুরণের অবকাশ ছিল না, তাই সে পিতৃগৃহে সেই অপ্রাপ্তজনিত বাসনাগুলো একে একে পূরণ করে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। এই বাসনা পূরণ করতে গিয়ে সে ধীরে ধীরে স্বার্থবাদী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। সেইসঙ্গে তাকে স্বার্থপর হতে সহায়তা করেছে তার মাতা, ভ্রাতা এবং শ্বশুর বাড়ির গ্রামের আরও কয়েকজন স্বার্থলোভী নারী; যারা প্রয়োজনে তেল, নুন ধার করতে প্রমদার কাছে আসতো; তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হল 'দিগম্বরী ঠাকরুনদিদি। নিজের অবদমিত ও অপ্রাপ্তজনিত বাসনা এবং পরিবার ও সমাজের আরও কয়েকজন স্বার্থপর যারা কিনা অত্যন্ত গরীব; ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সে পরবর্তী সময়ে পূর্ণাঙ্গ স্বার্থলোভী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। সেকারণে ঔপন্যাসিক শেষ পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করলেও প্রমদাকে পরিবার মধ্যে আশ্রয় দেন নি।

ঔপন্যাসিক উপন্যাসের প্রথম থেকেই 'প্রমদা' চরিত্রকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রমদাকে অশিক্ষিত ও গ্রামের সাধারণ নারী হিসেবে দেখিয়েছেন। কোনো বিশেষ ঔদার্যের চোখে তাকে দেখেন নি। উপন্যাসে শেষপর্যন্ত দেখা যায় লেখক বা পাঠক সমাজের কোনো কৃপা তার পক্ষে কাজ করে না। তবে লেখক প্রমদার নেতিবাচক আচরণের কারণ হিসেবে কিছু তথ্য দিয়েছেন। সেই তথ্যে তিনি বংশপরম্পরার বিষয়টিকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বংশপরম্পরা প্রাপ্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সহজে পরিবর্তিত হয় না। প্রমদাও শেষপর্যন্ত বংশীয় প্রভাব পরিত্যাগ করতে পারে নি। উপন্যাসের প্রথম থেকেই দেখা যায়, প্রমদার কথোপকথন বা সংলাপ সহজ, সরল কিংবা সাবলীল নয়;

Dhaka University Institutional Repository

সবসময় কিছুটা শ্লেষ মিশ্রিত, ব্যঙ্গাত্মক ও ঝাঁঝালো। প্রমদা তার জা সরলার সঙ্গে দুটো পয়সা ধার না দিয়ে সরলার সরলত্বকে আঘাত করেছে।

আমি তো আর কল্পতরু হয়ে বসি নি যে, যে যা চাবে তাই দেব।[৪৫]

ঔপন্যাসিক কাহিনি বর্ণনায় সহজ , সরল সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন। সংলাপের ক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। চলিত ভাষায় কিছু বোধগম্য আঞ্চলিক ভাষার শব্দ মিশ্রিত রয়েছে। সংলাপে অনেক লেখকের জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে কিছু সাধুভাষার শব্দ মিশ্রিত হয়েছে। তবে সাধুভাষার যেকোনো শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অব্যয়সূচক অথবা সর্বনামবাচক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধুভাষার শব্দ সংমিশ্রিত হয়েছে। যেমন:

..... আমার যাহা মাসে আসে, আমি যদি তা রেখে চলতে পারতাম তবে আমার ভাবনা কি? কিন্তু তা তো হবার জো নাই। একজন মাথায় মোট করে আনবে আর পাঁচজন তাই ঘরে বসে উড়াবে।[৪৬]

এখানে, চলিত ভাষার বাক্যটিতে আঞ্চলিক শব্দ 'জো' মিশ্রিত হয়েছে। এর ভেতর 'যাহা' 'নাই' শব্দদ্বয় আবার সাধু ভাষার। প্রমদার সংলাপ একমুখী নয়। তার সংলাপে একই সঙ্গে নানা মাত্রা যোগ হয়েছে। প্রমদা তার কথার মাধ্যমে স্বামী শশিভূষণকে সহজেই প্রভাবিত করতে পেরেছে। তার প্রভাবনীয় শক্তি ও উষ্মা লক্ষ করা যায়-দেবের বিধুভূষণ সম্পর্কে শশিভূষণকে লক্ষ করে যে সংলাপ দিয়েছে -

দেখেছ একবার অহঙ্কারটা? তুমি এক কথা বলেছ, তা নয় দুটি মিষ্টি করে তোমায় অনুনয়-বিনয় করুক; তা নয়।[৪৭]

প্রমদাকে সংলাপের মাধ্যমে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত দেখা যায় প্রমদা একটি সাহসী চরিত্র। তার সংলাপের মাঝেও তার পরিচয় মেলে। কিন্তু কোথাও তাকে দেখা যায় না একাকি কোনো অনৈতিক কাজে নিজেকে জড়াতে। সে যা কিছু করেছে তা অবশ্যই কারো সহযোগিতায় করেছে। সরলার সঙ্গে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে সে ইন্দির ঠাকুরণ ও গ্রামের অন্যান্য নারীদের সহযোগিতা নিয়েছে। মেয়েজামাই নুরল এসলামকে হত্যা করার পরিকল্পনা তার হলেও সেখানে স্বামীকে সে প্রভাবিত করে তা করেছে। অর্থাৎ কথা ও কাজে, সব ক্ষেত্রে সে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রেখেছে। তার এই উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে নিম্নোক্ত সংলাপের ভেতর দিয়ে-

তুমি পৃথক করিয়া দিলে, তুমিই তার কারণ জান। আমি পৃথক করেও দিইনি, তার কারণও জানি নে।[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

দেবর, জা সম্পর্কে যেমন আত্মপক্ষ সমর্থন করে যুক্তিখণ্ডন করেছে, স্বামীর প্রতিও তার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। স্বামী শশিভূষণ যখন দেনার দায়ে কারাবাসের উপক্রম হয়েছে, তখনও সে অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করে যুক্তি দেখিয়েছে। স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে স্বামীর প্রতি তার সংলাপ-

তাহাতে আমাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খেতে হবে; সে কি তোমার পক্ষে ভাল হবে?[৪৯]

মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে প্রমদা সব কাজ করেছে। মাতা ও ভ্রাতার প্রশ্রয় তার নেতিবাচক আচরণের মূল কারণ। সেই মাতা ও ভ্রাতার সঙ্গেও তার সংলাপ নমনীয় নয়। কোম্পানি শশিভূষণের হিসাব চাইলে শশিভূষণ বিপদে পড়েছে। সেখান থেকে বাঁচার জন্য সে সহকর্মীদের সঙ্গে কিছু অর্থে রফা করতে চেয়েছে। কিন্তু সেই খবর তার মাতা জানে না জন্য শ্লেষ ও উষ্মা প্রকাশ করে মাতাকে বলেছে-

তুমি কি সমস্ত দিন কানে ছিপি দিয়ে বসে থাক?[৫০]

প্রমদার সৌন্দর্য বর্ণনায় ঔপন্যাসিক অনেক ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। প্রমদার নেতিবাচক আচরণের অন্যান্য কারণের পাশাপশি সৌন্দর্যের বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। প্রমদা যে সুন্দরী তা ঔপন্যাসিক পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন। এবং তিনি দেখিয়েছেন সেই সৌন্দর্যের বলেই প্রমদা তার স্বামী শশিভূষণকে তার প্রতি অনুরক্ত রেখেছে। উপন্যাসের শুরুতেই প্রমদার সৌন্দর্যের বর্ণনা পাওয়া যায় তার প্রতিবেশী নারীদের মাধ্যমে। তবে সেটা কতটুকু সত্য তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে গেছে। লেখকের বর্ণনা অনুসারে পাড়ার কোনো কোনো মহিলা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে প্রমদাকে বড় ঘরের মেয়ে বলে স্তুতিবাদ করত। কেউ কেউ মুখখানিকে বড় সুন্দর বলে অভিহিত করত। তার স্বামী শশিভূষণও তার সৌন্দর্যের একটা বর্ণনা দিয়েছে। প্রতিবেশী ও স্বামীর বর্ণনাক্রমে নিম্নরূপ-

১. কেমন পটলচেরা চক্ষু, কেমন বাঁশীর মত নাকটি ইত্যাদি সত্য কথা অপক্ষপাতে বলিয়া দরকার মত নুনটুকু তেলটুকু লইয়া যান।[৫১]

২. '.... প্রমদার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, মুখচন্দ্রিমা মেঘাচ্ছন্ন'।[৫২]

'১' নম্বর উদ্বৃতিতে প্রমদার 'চোখ' ও 'নাক' -এর সৌন্দর্য বর্ণনায় উপমা অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে। চোখকে চেরা পটলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর নাককে বাঁশীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এখানে, 'চোখ' ও 'নাক' উপমেয় এবং 'চেরা পটল' ও 'বাঁশী' হল উপমান। আবার '২' নম্বর উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে 'মুখ'-কে 'চন্দ্রিমা'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। উপমেয় ও উপমানকে 'মত' ভাবের দ্বারা তুলনা

Dhaka University Institutional Repository

করা বোঝালে উপমা অলঙ্কার হয়। সুতরাং উদ্ধৃতিদ্বয় উপমা অলঙ্কার। প্রমদার ক্ষেত্রে যে সমস্ত অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ হতে। ইতিবাচকভাবে কোনো অলঙ্কারের ব্যবহার দেখা যায় না বললেই চলে। এটা নির্ভরও করে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। ঔপন্যাসিক তারকনাথ কেন প্রমদার ক্ষেত্রে সব অলঙ্কারকে নেতিবাচক ও ব্যঙ্গাত্মকভাবে উল্লেখ করেছেন তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। লেখকের একটা সীমাবদ্ধতা বলে মনে হয়। কারণ লেখক ইচ্ছে করলে প্রমদার সৌন্দর্য কিংবা অন্য কাজের ভেতর কিছু ইতিবাচক অলঙ্কারের ব্যবহার করতে পারতেন। লেখক প্রমদার বাচনভঙ্গিকে শ্লেষ অলঙ্কারে ভূষিত করেছেন। শশিভূষণ স্ত্রীকর্তৃক প্রবঞ্চনার শিকার হলে 'প্রমদা' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এভাবে-

১. প্রমদার বাক্যগুলি এমন মিষ্ট যে, একবার শুনিলে আর কেহ তাহা দুইবার শুনিতে ইচ্ছা করিত না।[৫৩]

২. শশিভুষণের ঘরে স্বয়ং লক্ষ্মী অবতীর্ণ।[৫৪]

এখানে প্রথম উদ্ধৃতিতে 'এমন মিষ্ট যে,' দ্বারা শ্রুতিমাধুর্য বা শিষ্টতা না বুঝিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ কর্কশ কিংবা তিক্তভাষণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার দ্বিতীয় উদ্ধৃতি দ্বারা ও 'স্বয়ং লক্ষ্মী অবতীর্ণ' বলতে বৈপরীত্য অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। 'স্বয়ং লক্ষ্মী অবতীর্ণ' বলতে মূলত 'গৃহকর্মসুনিপুণা' বা পরিবারের সবার জন্য মঙ্গলজনক কোনো নারীকে বোঝায়। কিন্তু এখানে তা না বুঝিয়ে স্বার্থপর এক নারীর প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করা হয়েছে; যে কিনা স্বামীর বিপদে কাজে না এসে তাকে বিপদে ফেলে পালিয়ে গেছে। কোনো একটা বাক্যাংশ দ্বারা একই সঙ্গে দুটো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শ্লেষ অলঙ্কার বলা হয়। লক্ষ্মী অবতীর্ণ হওয়া বলতে সাধারণত মঙ্গলসূচকতা বোঝায়। সুতরাং উদ্ধৃতিদ্বয় শ্লেষ অলঙ্কার প্রকাশক। প্রমদা কোনো কারণে রাগান্বিত হলে তার চেহারাগত প্রকৃতির অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক পরিকর অলঙ্কারের ব্যবহার করেছেন।

শশিভূষণ তাঁহার আরক্ত নয়ন, মলিন বদন ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, কথাটা কি? [৫৫]

একাধিক বিশেষণ পদ ব্যবহার করে কোনো অবস্থার বর্ণনা করলে তাকে পরিকর অলঙ্কার বলা হয়। উদ্ধৃতিতে শশিভূষণ প্রমদার রাগান্বিত অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে 'আরক্ত'; 'মলিন' ও 'ঘন ঘন' বিশেষণ দ্বারা প্রমদার বিশেষ অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। পরিকর অলঙ্কারে যার ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রমদা তার স্বার্থের পথে সমসময় বিড়ম্বনা মনে করেছে দেবর বিধুভূষণ ও জা সরলা'কে। তাই তাদের সম্পর্কে সে স্বামী শশিভূষণকে অনেকবার ভুল বোঝানোর চেষ্টা করেছে। বিধুভূষণ সম্পর্কে প্রমদার মনোভাব বর্ণনায় ঔপন্যাসিক উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের ব্যবহার করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তুমি মনে মনে ভাব, তোমার ভাইটি যেন রামের ভাই লক্ষণ।[৫৬]

উদ্ধৃতিতে বিধুভূষণকে রামের ভাইয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিধুভূষণ ও রামের ভাই লক্ষণ-এর মধ্যে নিকট সাদৃশ্য বর্তমান। অর্থাৎ উপমান ও উপমেয়'র ভেতর নিকট সাদৃশ্য থাকলে এবং উপমান ও উপমেয় উভয় যদি 'যেন' দ্বারা যুক্ত থাকে তাহলে তা উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের আওতায় পড়ে। সুতরাং বাক্যটি উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের উদাহরণ।

জেব-উন্নিসা

জেব-উন্নিসা চরিত্রটিকে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসের ছত্রছায়ায় মূর্ত করে তুলেছেন। মুঘল সম্রাটদের অন্তঃপুরের বা হেরেমের নিগূঢ় কাহিনী বিন্যাসে জেব-উন্নিসাকে মুখ্য করেছেন। জেব-উন্নিসা চরিত্রের মধ্য দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার এক অভিন্ন চিত্র অঙ্কনে প্রয়াস পেয়েছেন। সম্রাটনন্দিনীদের ক্ষমতালিপ্সু মনোভাব, তাদের প্রেমের স্বরূপ সবমিলিয়ে মুঘলদের পাপাচারের দিকটির ওপর ঔপন্যাসিক সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। মুঘল সম্রাটদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ, বিরোধের নানাবিধ কারণগুলোও তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। পুরো মুঘল সাম্রাজ্য শাসনের প্রতিচ্ছবি অঙ্কনে ঔপন্যাসিক জেব-উন্নিসাকেই আশ্রয় করেছেন। মুঘল সম্রাটদের প্রেম ও বহুগামিতার বিষয়টিও জেব-উন্নিসা চরিত্রটির ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উদহারণস্বরূপ তৃতীয় পরিচ্ছেদে জেব-উন্নিসা বলেছে-

১. শাহজাদীরা শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ করে না। বাদশাহজাদীর দুইশতী মনস্বদারকে কি বিবাহ করতে পারে?[৫৭]
২. ঔরঙ্গজেব কথাটা না বুঝিলেন, তাহা নহে। জেব-উন্নিসার কুচরিত্রের কথা তিনি সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতেন।[৫৮]

জেব-উন্নিসার ভেতর আত্মমর্যাদা ও বংশগত গৌরবের বিষয়টি ফুটে উঠেছে প্রথম উদ্ধৃতির মাধ্যমে। এও বোঝা যায় রাজ্যের দুইশত মনস্বদার তার অধীনে। তারা সবাই তার কৈতববাদের স্বীকার তাদের মধ্যে মবারক উল্লেখযোগ্য; মবারককে উদ্দেশ্য করেই জেব-উন্নিসা বিবাহ সম্পর্কে 'শাহজাদীরা শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ করে না' কথাটি বলেছে। জেব-উন্নিসার আচরণের বিষয়টি পিতা ঔরঙ্গজেব জানার পরও কোনো পদক্ষেপ নেন নি। বরং পরবর্তী সময়ে জেব-উন্নিসার অভিযোগের প্রেক্ষিতে মবারকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছেন। জেব-উন্নিসা চরিত্রের ভেতর দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। জেব-উন্নিসা একাধিপত্য অর্জনে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

কৌশলী হয়েছে। তার বিমাতা উদিপুরী বেগমের একচ্ছত্র অধিকার তার মনে বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। ফলে সে কৌশল রূপনগরের রাজপুতকন্যা চঞ্চলকুমারীকে বিমাতা হিসেবে আনতে চেয়েছে। কারণ সে জানে চঞ্চলকুমারী উদিপুরী বেগমের চেয়ে সুন্দরী। সুতরাং সে যদি মহলে আসে তাহেল সৌন্দর্যগুণে উদিপুরী বেগমের স্থান চঞ্চলকুমারী দখল করবে আর যখন সে জানবে তাকে মুঘল হেরেমের কর্ত্রী করার পেছনে জেব-উন্নিসার মূল ভূমিকা ছিল, তখন সে অবশ্যই তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। সেই কৃতজ্ঞতা বোধই জেব-উন্নিসার একাধিপত্যে সাহায্য করবে। তার এই পরিকল্পনা মবারককে বলেছে এভাবে-

> .....উদিপুরীর রূপের বড়াই আর সহ্য হয় না। শুনিলাম, রূপনগরওয়ালী আরও খুব-সুরৎ। যদি হয়, তবে উদিপুরীর বদলে সেই বাদশাহের উপর প্রভুত্ব করিবে। আমি তাহাকে আনিতেছি, ইহা জানিলে, রূপনগরওয়ালী আমার বশীভূত থাকিবে। তা হলেই আমার একাধিপত্যের যে একটু কণ্টক আছে, তাহা দূর হইবে।'[৫৯]

উপরন্তু মবারককে সে বুঝিয়ে বলে দিয়েছে যেন সে চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং জানায় কার অনুগ্রহে সে মুঘল সাম্রাজ্যের হেরেমে প্রবেশ করেছে। তার ভাষায়.... তাহাকে জানাইবে যে, আমারই অনুগ্রহে সে বাদশাহের বেগম হইতেছে।'[৬০] এই কথাটির মাধ্যমে মূলত জেব-উন্নিসার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েছে।

'জেব-উন্নিসা' চরিত্রের সংলাপ ও ভাষা মার্জিত, সংযত ও পরিশীলিত। কোনোরূপ আঞ্চলিকতা বিবর্জিত নিটোল সাধু ভাষায় রচিত। জেব-উন্নিসার সংবদ্ধ কথোপকথনের ভেতর দিয়ে একদিকে যেমন মুঘল হেরেমের রূচিবোধের পরিচয় অনুমিত হয়, তেমনি ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত বাচনভঙ্গির পরিচয়ও পাওয়া যায়। জেব-উন্নিসার কথোপকথনের একটা বিশেষ লক্ষণীয় দিক হল মাঝে মাঝে ঐচ্ছিক প্রবণতা থেকে হিন্দি বাক্যে অধীন কর্মচারীদের আদেশ দিয়েছে। রাণা সিংহের গৃহে বন্দী অবস্থায় অসংযত হয়েও ভুলক্রমে হিন্দিতে রাণা সিংহের হেরেমের বাঁদীদের আদেশ দিয়েছে। এতে ঔপন্যাসিকের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। তবে এটা হতে পারে যে অনেক বাঁদী স্বদেশীয় হিন্দি ভাষী ছিল; একারণে হয়তো তাদের সঙ্গে হিন্দি ভাষা ব্যবহার করে থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ: চতুর্থ পরিচ্ছেদে জেব-উন্নিসা নিজ হেরেমের প্রহরিণীকে বলেছে-নাচ্‌নেওয়ালী গোল্‌কো বোলাও।[৬১] 'নাচ্‌নেওয়ালী' বলতে দরিয়াবিবিকে বোঝানো হয়েছে। দরিয়াবিবির গানের গলা শুনে তাকে প্রহরিণীকে দিয়ে ডাকিয়েছে। প্রেমোচ্ছ্বাসসমৃদ্ধ ও বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ 'জেব-উন্নিসা' চরিত্রের লক্ষণীয় দিক। তার প্রত্যেকটি সংলাপে বুদ্ধিদীপ্ততার সঙ্গে পরিকল্পনার ছোঁয়া মিশ্রিত। মবারক ও জেব-উন্নিসার ভেতর কথোপকথন-

> মবারক - কিন্তু ইহারও বোধ হয় তুমি জান যে, মবারক মৃত্যুকে ভয় করে না।

Dhaka University Institutional Repository

জেব-উন্নিসা- মরণের অপেক্ষা আর কি দণ্ড নাই?
মবারক- তোমার বিচ্ছেদ।[৬২]

জেব-উন্নিসা, তার প্রতি মবারককে প্রীতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানত। মৃত্যু অপেক্ষা জেব-উন্নিসার সান্নিধ্য পরিত্যাগ মবারকের নিকট বেশি বিষময় সেটা জেব-উন্নিসার গোচরবহিঃর্ভুত ছিল না জন্যই জেব-উন্নিসা মবারককে বলেছে 'মরণের অপেক্ষা আর কি দণ্ড নাই?' এটা জেব-উন্নিসার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার ফল। জেব-উন্নিসার কৈতববাদে মুগ্ধ দুইশত মনস্বদার। তাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রথম থেকেই দেখা যায় মবারককে দেয়া হচ্ছে। মবারকের সঙ্গে সত্যিকার প্রেমিকার মত সংলাপে লিপ্ত হতে দেখা যায় জেব-উন্নিসাকে।

তুমি আমার প্রাণাধিক, - তোমাকে যতক্ষণ দেখি ততক্ষণ আমি সুখে থাকি। তুমি পালঙ্কের উপর আসিয়া বস- আমি তোমাকে আতর মাখাই।[৬৩]

'জেব-উন্নিসা' চরিত্রকে ঘিরে নানারকম অলঙ্কারের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। উপমা একটি রচনার বিশেষ করে উপন্যাস সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য। আলোচ্য উপন্যাসেও তাই উপমার সংখ্যাই বেশি। কয়েকটি উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য-

১. এই মহিষের মত বাঁদীগুলো হজরতের তামাকু সাজে, আমি তাহা দেখিতে পারি না।[৬৪]
২. দিল্লীতে তোমার মত কয়টা বানর আছে?[৬৫]
৩. এখন পাথরে লুটাইয়া পড়িয়া, চাষার মেয়ের মত মাথা কুটিতে লাগিল।[৬৬]

প্রথম ব্যবহৃত উপমা হল 'মহিষের মত'। মহিষের সঙ্গে বাঁদিগুলোকে তুলনা করা হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে। রূপনগরের রাজপুত-কন্যা চঞ্চলকুমারীকে মুঘল হেরেমে আনার অভিপ্রায়ে উদিপুরী বেগমকে উদ্বুদ্ধ করতে ওভাবে বাঁদীগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করেছে। দ্বিতীয় উপমা 'তোমার মত বানর' বোঝাতে মবারককে বানরের সঙ্গে তুলনা করেছে কিছুটা হাস্যরসের ছলে। তৃতীয় উপমা 'চাষার মেয়ের মত'; স্বেচ্ছাচারিতায় মবারককে হারিয়ে বিরহতাপে তার করুণ অবস্থাকে নিম্নস্তরের মানুষের কাতারে দাঁড় করিয়েছে।। মুঘলকন্যার স্বভাবসুলভ কঠিন ব্যক্তিত্বকে কোমল মনোভাবে রূপান্তরিত করেছে। জেব-উন্নিসার রূপ বর্ণনায় মালোপমার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ: চতুর্থ পরিচ্ছেদে নির্ম্মলকুমারীর মাধ্যমে জেব-উন্নিসার রূপবর্ণন হয়েছে এভাবে-

সর্বাপেক্ষা জেব-উন্নিসার বিচিত্র, রত্নপুষ্পমিশ্রিত অলঙ্কার প্রভায়, চন্দ্রসূর্যতুল্য উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যপ্রভায় চমকিত হইল।[৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

একাধিক উপমার ব্যবহার হলে তাকে মালোপমা বলা হয়। জেব-উন্নিসার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক তার সৌন্দর্যকে 'রত্নপুষ্পমিশ্রিত অলঙ্কারের প্রভা'; ও 'চন্দ্র-সূর্যের ঔজ্জ্বল্যে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। এরূপ একাধিক উপমার ব্যবহার হলে তাকে মালোপমা বলা হয়। পরিকর অলঙ্কার ব্যবহার বঙ্কিমচন্দ্রের একটা স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য। জেব-উন্নিসার ক্ষেত্রে তার ব্যবহার দেখা যায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে-

> কিন্তু অপ্সরার তখন চক্ষু ঢুলু ঢুলু; মুখ রক্তবর্ণ; চিত্ত বিভ্রান্ত; দ্রাক্ষা সুধার পূর্ণাধিকার....।[৬৮]

'ঢুলু ঢুলু'; রক্তবর্ণ; 'বিভ্রান্ত'-এই তিনটি বিশেষণ দ্বারা যথাক্রমে জেব-উন্নিসার চক্ষু, মুখ ও চিত্তের অবস্থা বোঝানো হয়েছে। এভাবে একাধিক বিশেষণ দ্বারা বর্ণনা চিত্রকর্মকেই পরিকর অলঙ্কারে অভিধায়িত করা হয়। এছাড়াও লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একই বাক্যে একাধিক অলঙ্কারের ব্যবহার করেছেন। জেব-উন্নিসার ক্ষেত্রে সেই ব্যবহারও লক্ষণীয়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে-

> তারপর ছিন্ন লতার মত সহসা চঞ্চলকুমারীর চরণে পড়িয়া গিয়া, চঞ্চলকুমারীর পায়ের উপর মুখ রাখিয়া, পদ্মের উপর পদ্মখানি উল্টাইয়া দিয়া, অশ্রুশিশিরে তাহা নিষিক্ত করিল।[৬৯]

'ছিন্ন লতার মত' এটা উপমা অলঙ্কার, আর 'পদ্মের উপর পদ্মখানি' এটা যমক অলঙ্কার, বাক্যের মাঝে থাকায় তা মধ্য যমক। মবারককে দেখতে উদগ্রিব জেব-উন্নিসা তার রাজকন্যা সুলভ ব্যক্তিত্ব পরিত্যাগ করে রাজপুত কন্যা চঞ্চল কুমারীর সামনে ভূলুণ্ঠিত হতে দ্বিধা করে নি। প্রিয়তম মবারকের জন্য সে চঞ্চলকুমারীর পদ্মপায়ে অশ্রু নিষিক্ত করেছে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র যমকের চমৎকার ব্যবহার করেছেন। দুটো পদ্ম; একপদ্ম চঞ্চলকুমারীর চরণ আরেক পদ্ম জেব-উন্নিসার লোচন।

জায়েদা, মায়মুনা

মশাররফ হোসেন পারিবারিক ও জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত সপত্নীবাদের উপাদান জয়েদা-চরিত্রে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। সপত্নীর জ্বালা থেকে মুক্তির জন্য হাসানকে বধ করতে প্রবৃত্ত হলেও স্বামীর জন্য জায়েদার ভালোবাসা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মায়মুনার প্রলোভন, প্ররোচনা, কূট-পরামর্শ এবং সপত্নীবাদের অন্তর্জ্বালার পাশাপাশি তাই দেখা যায় স্বামীর প্রতি জায়েদার গভীর প্রণয়াভাব, অনুরাগ ও ভালোবাসা-'জায়েদা মলিনমুখী'-হইয়া উঠিয়া গেলেন। যেখানে গেলেন, সেখানেও স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন না। পুনরায় নিজ কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলেন। একদিকে রাজভোগের লোভ, অপরদিকে স্বামীর প্রণয়, এই দুইটি ক্রমে ক্রমে তুলনা করিতে লাগিলেন। 'দুরাশা? পাষাণ ভাঙ্গিয়া তুলাদণ্ড মনোমত ঠিক করিয়া অসীম দুঃখভার চাপাইয়া দিলেন, অথচ স্বামীর প্রাণের

Dhaka University Institutional Repository

দিকেই বেশি ভারী হইল। কিন্তু জয়নাবের নাম মনে পড়িবামাত্রই পরিমানদণ্ডের যে দিকে স্বামীর প্রাণ, সেই দিক একবারে লঘু হইয়া উচ্চে উঠিল।'[৭০] (মহরম পর্ব্ব, ত্রয়োদশ প্রবাহ।) এরূপ তুলনামূলক আত্মদ্বন্দ্বই জায়েদাকে দেবীতুল্য না করে সাধারণ রক্তমাংসের মানুষে পরিণত করেছে; যাদের মন ও মানসে হিংসা লোভ স্বাভাবিক। 'এই ত আজ তোরই জন্য-পাপীয়সি!-কেবল তোরই জন্য জায়েদা এই স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিল।'[৭১] (মহরম পর্ব্ব, সপ্তদশ প্রবাহ)। জায়েদার এই সগোক্তির মাধ্যমে সপত্নীবাদ প্রকাশ পায় নি বরং স্বামী হাসানের প্রতি হৃদয়ের গভীরতা নিঃসৃত ভালবাসা এবং একটা গোপন অভিমানও প্রকাশিত হয়েছে। লেখক মশাররফ হোসেন নিজেই দ্বিধান্বিত-'এক অন্তরে দুই মূর্তির স্থাপন হওয়া অসম্ভব। ইহার পর তিনটি যে কী প্রকারে সঙ্কুলান হইল, সমভাবে সমশ্রেণিতে স্থান পাইল, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসিল না; সুতরাং পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিলাম না।'[৭২]

'জায়েদা' চরিত্রটিতে লেখকের দ্বৈত সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জায়েদার কথা-বার্তায় নেতিবাচকতা ও ইতিবাচকতা উভয় বিষয়ই ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। মায়মুনা কর্তৃক প্রভাবিত হবার প্রথম পর্যায় পর্যন্ত তার আচরণে ইতিবাচকতা প্রকাশ পেয়েছে। তখন কথায় তার স্বামী হাসানের প্রতি ছিল অপার ভালোবাসা দরদ ও যত্নশীলতা। উদাহরণ:

> .....আমাকে যে ভালবাসিবে, তাহার ঔষধ কী? তাহাও যেন হইল, কারণ আমি হাতে করিয়া খাওয়াইব, আমাকেই ভালবাসার ভার সইতে হইবে....।[৭৩]

মায়মুনা যখন তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছে তখন সে মায়মুনাকে নিরস্ত্র করার প্রয়াস চালিয়েছে। মায়মুনার ভাষায়-

> পাগলের মতো একদিন কী বলিয়া ছিলাম, তুমি তাই মনে করিয়া রাখিয়াছ; যাক ও কথা যাক, ও তুমি আর কখনোই মনে করিও না। কোনো চেষ্টা করিও না। আমার মাথা খাও। আর ও কথা মুখে আনিও না।[৭৪]

মায়মুনার দ্বারা বারবার উদ্দীপ্ত হয়ে একসময় তার মনের একান্তকোণে লুকিয়ে থাকা কথা তার কাছে প্রকাশ করেছে। কারণ মায়মুনাকেই কেবল সে পরমাত্মীয় মনে করেছে। মায়মুনাকে সে সখীর মত ভালোবাসত এবং বিশ্বাস করত। তাছাড়া বাড়ির মধ্যে বা আশে পাশে আর কেউ ছিল না যার সঙ্গে সে মনের কোনো গোপন কথা প্রকাশ করে। বড় স্বতাকে সে কিছুটা ভয় মিশ্রিত সম্মান করত আর ছোট স্বতা জয়নবকে সহ্য করতে পারতো না। ফলে সে মায়মুনাকে তার গোপন কষ্টের কথা জানিয়েছে।

> তিনি কথা কহেন, কিন্তু পূর্বকার সে স্বর নাই, মিষ্টতা নাই। ভালোবাসেন, কিন্তু তাহাতে রস নাই। আদর করেন, কিন্তু সে আদরে মন গলে না, বরং বিরক্তিই জন্মে। আগে জায়েদার নিকট সময়ের দীর্ঘতা আশা করিতেন; এখন যত কম হয়, ততই মঙ্গল, তাহাই ইচ্ছা।[৭৫]

ব্যক্তিমাত্রেই নিকট আত্মীয় বিশেষত পরিবার, পরিবারের বাইরে প্রিয় কোনো ব্যক্তি বা বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। জায়েদা মায়মুনাকে বিশ্বস্ত ও বন্ধু মনে করেছে। তাই মায়মুনার উপর্যুপরি প্রলোভন-প্রস্তাব সে অস্বীকার করতে পারে নি। সে কারণে মায়মুনা এজিদের রাজরাণী হওয়া এবং অনেক অর্থের লোভ সম্বরণ না করে সম্মতি দিয়েছে। সম্মতি দেওয়ার পূর্বে সগোক্তি করেছে এভাবে-

> প্রথম শত্রুর প্রতি হিংসা, শত্রুর মনে ব্যথা দেওয়া, পরিণামে একের অভাব বটে, কিন্তু মনের ও অর্থের সুখ অসীম। আমার উভয় পক্ষেই সুখ। মায়মুনার কথার কেন অবাধ্য হইব?[৭৬]

জায়েদা মায়মুনার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও বিবেক বিসর্জন দেয় নি। আত্মোপলব্ধি করার শক্তি সে হারিয়ে ফেলে নি। সে স্বামীর প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হলেও মাঝে মাঝে তার ভেতর অপরাধবোধ জাগ্রত হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই জয়নাবের কথা মনে হওয়ায় তার জাগ্রত অপরাধবোধ বিলুপ্ত হয়েছে। পুনরায় জাগ্রত হয়েছে এবং বিলুপ্ত হয়েছে। এরূপ একাধিকবার তার ভেতরে অপরাধবোধ জেগে উঠেছে। তার সংলাপ বা আত্মকথন হতে তার জাগ্রত অপরাধবোধের স্বরূপ বোঝা যায়-

> প্রিয়বস্তুকে একবার চক্ষের অন্তর করিতে-জগৎচক্ষুর অন্তর করিতে কতই যত্ন, কতই চেষ্টা করিতেছি।[৭৭]

জায়েদার ভাষা সহজ, সরল সাধু। জায়দা স্বামী হাসানকে বিষপান করিয়েছে, কিন্তু তার আচার-আচরণ কিংবা কথাবার্তায় কঠোর বা নিষ্ঠুরভাবের কোনো প্রকাশ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। সবসময় শুদ্ধ তবে সাবলীল নয়, কিছুটা ভয় মিশ্রিত। ভাষার গঠনে কোনো তেজদীপ্ততা নেই, অহংবোধ নেই, শ্লেষ নেই; নিটোল, কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির।

মায়মুনা নেতিবাচক কোনো চরিত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে নি। এজিদের প্রধানমন্ত্রী মারোয়ানের দ্বারা গরীব মায়মুনাকে অনেক অর্থের লোভ দেখিয়ে প্রভাবিত করতে দেখা যায়। মারোয়ানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মায়মুনা ধীরে ধীরে খলকপট হয়ে উঠেছে। হাসানের মৃত্যু কামনায় জায়েদাকে কূটমন্ত্র দ্বারা প্রবঞ্চিত করেছে। সেটা করতে গিয়ে তাকে অনেক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হয়েছে অনেক কৌশলী হতে হয়েছে। তার বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপের উদাহরণ-

Dhaka University Institutional Repository

১. সপত্নীবাদ না আছে এমন স্ত্রী জগতে জন্মে নাই।[৭৮]
২. কাঁদিয়া কাঁদিয়া মায়মুনা বলিতে লাগিলেন, "জায়েদা? তুমি কেন মরিতে চাও? তুমি করিলে কী না করিতে পার?.... মনে করিলেই তুমি রাজরাণী, মনে না করিলেই ভিখারিনী।"[৭৯]

প্রথম সংলাপটি মারোয়ানকে লক্ষ করে মায়মুনা বলেছে। মারোয়ান, মায়মুনার কাছে হাসানকে হত্যা করা সম্ভব হবে কিনা জানতে চাওয়ার উত্তরে মায়মুনা উক্তিটি করেছে। দ্বিতীয় সংলাপে দেখা যায় জায়েদার কষ্টকে নিজের মনে করে চোখের জল ফেলতে; মূলত তা হল মায়মুনার কৈতববাদ মাত্র। কৈতববাদের পাশাপাশি শ্লেষাত্মক, ব্যঙ্গবিদ্রূপের চিত্রও ফুটে উঠেছে মায়মুনার কথায়-

তবে কি আপোষ হইয়াছে, না ভাগ বণ্টন বিলি ব্যবস্থা করিয়া ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে? কিংবা মনের মকদ্দমায় সালিশী নিষ্পত্তি হইয়া মিটমাট হইয়া গিয়াছে।[৮০]

মায়মুনা জায়েদাকে বিভ্রান্ত করতে হরেকরকম কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। কখনো কপটবক্তব্যে, কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সর্বোপরি অপূর্ব লোভ দেখিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। মরিয়ার পুত্র এজিদ দামেস্ক নগরীর সর্বময় কর্তা। তার স্ত্রী হওয়া এবং সেই সঙ্গে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার লোভ সামলানো যে কোনো মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। জায়েদাও উপর্যুপরি প্রভাবে নিজেকে অতিমানবী বা নিষ্পাপ আত্মায় পরিণত না করে সাধারণ রক্তে-মাংসে গড়া মানবীয় আত্মার হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছে। মায়মুনা জায়েদাকে বলেছে-

যে রাজরাণী জয়নাব হইবে, সেই রাজরাণী। আবার প্রথমেই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার।[৮১]

'জায়েদা' চরিত্র বিশ্লেষণ এবং জায়েদার সংলাপ বিচার করলে কিছু অলঙ্কারের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। জায়েদা মায়মুনাকে লক্ষ করে বলেছে-

সেই গৃহ, সেই স্বামী, সেই হাসান, সেই জায়েদা সকলেই রহিয়াছে, অথচ ইহার মধ্যে কী যেন অভাব রহিয়াছে।[৮২]

বাক্যটিতে বারবার 'সেই' শব্দটি এসেছে। এরূপ পরপর একই শব্দ একাধিকবার এলে যে অলঙ্কারের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় অনুপ্রাস। একই শব্দ দুইয়ের অধিক বার আসলে বৃত্তানুপ্রাস হয়। সুতরাং বাক্যটির অলঙ্কার বৃত্তানুপ্রাস। জায়েদার সংলাপে রূপক অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখা যায়। জায়েদা মায়মুনার প্রস্তাব গ্রহণ এবং তা কার্যে পরিণত করার পর তাকে বলেছে--

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু বোন! তুমি আমাকে নিরাশ্রয় করিয়া বিষাদ-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিও না।[৮৩]

মায়মুনার সংলাপেও জায়েদার অনুরূপ কিছু সংখ্যক অলঙ্কারের ব্যবহার দেখা যায়। মায়মুনা জায়েদাকে প্রভাবিত করতে অনেক কৌশল অবলম্বন করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা কৌশল হলো কথার জাল বিছিয়ে জায়েদাকে সেই জালে আটকানো। জায়েদার ক্ষেত্রে মায়মুনা যা করেছে- কথায় কথায়, কথার ছলনায়, কথায় ভর দিয়ে, কথা ফাটিয়ে, কথার ফাঁক দিয়ে, কথার পোষকতা করে, কথার বিপক্ষতা করে, স্বপক্ষ বিপক্ষ সকল দিকে যেয়ে মায়মুনা জায়েদার মনের কথা বের করতে চেয়েছে। মায়মুনার কথাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেখানে 'কথা' শব্দটি সাতবার রয়েছে; 'কথার' শব্দটি চারবার আছে। পরপর একই শব্দ একাধিক বার আসলে অলঙ্কারের নিয়মানুযায়ী সেটাকে বলা হয় অনুপ্রাস। শব্দটি যদি দুইবার আসে তাহলে ছেকানুপ্রাস আর যদি ততোধিক বার আসে তাহলে হবে বৃত্তানুপ্রাস। আবার বর্ণের মিল বিন্যাসের দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলেও বাক্যটির অলঙ্কার হবে বৃত্তানুপ্রাস। কারণ 'ক' বর্ণটি দশবার পর পর এসেছে; সেদিক থেকেও বর্ণের বৃত্তানুপ্রাস ঘটেছে। সুতরাং বাক্যটির মূল সুর বৃত্তানুপ্রাস অলঙ্কার।

এজিদ ও মারওয়ান

বিষাদ-সিন্ধু খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, জীবনাচরিতও নয়, তেমনি আঁটঘাট বাঁধা বিধিবদ্ধ উপন্যাসও নয়। এটা ইতিহাস, উপন্যাস, সৃষ্টিধর্মীয় রচনা ও নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের সর্ববিধ সংমিশ্রণে রোমান্টিক আবেগমাখানো এক সঙ্কর সৃষ্টি। এতে উপন্যাসের লক্ষণ আছে প্রচুর, একটা মূল আবেগও আছে, শিথিল বিন্যস্ত প্লটকে একীকরণের চেষ্টা আছে, সংলাপ আছে এবং সমগ্র আখ্যাকে একটা পরিণতি দেবার সজ্ঞান প্রচেষ্টাও আছে। তবু 'বিষাদ-সিন্ধু' সমালোচনার মাপকাঠিতে কোনো বিশেষ এক ধরনের সৃষ্টি নয়।[৮৪] কাজী আবদুল মান্নান 'বিষাদ-সিন্ধু' সম্পর্কে বলেছেন- একদিকে তাঁর আশৈশবের সংস্কার অন্যদিকে তাঁর ঘনিষ্ঠ শিল্পচেতনা এ দুয়ের সংমিশ্রণে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।[৮৫] তিনি *বিষাদ-সিন্ধু*'কে 'বিচলিত শিল্পী-চিত্তের অভিব্যক্তি' বলেও মত প্রকাশ করেন। ।[৮৬] *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসের তিনটি পর্বের মধ্যে প্রথম পর্ব থেকে পরবর্তী পর্বগুলো ক্রমশ শিল্পসমৃদ্ধি হারিয়েছে। প্রথম পর্বে যেভাবে দুর্দান্ত প্রতাপের সঙ্গে শুরু হয়েছিল, পরবর্তী পর্বগুলোতে তা ক্রমশ ফিকে হয়ে এসেছে। বিশেষ করে, তৃতীয় পর্বের একমুখিতায় উপন্যাসের টান্‌টান ভাবটাকে দুর্বল করে দিয়েছে বলে সমালোচকরা মত প্রকাশ করেছেন। অনেকটা এ কারণেই উক্ত উপন্যাসটিকে অপরিণত বলে মনে হয়। তবে ঔপন্যাসিকের জনপ্রিয়তার সার্থকতা বিষয়ে কোনো কথা বলা চলে না, এক কথায় অবিসংবাদিত। বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক আনিসুজ্জামান-এর মতে, মধ্যযুগীয় ধর্মচেতনার জীবন বিমুখ আচ্ছন্নতাকে

Dhaka University Institutional Repository

অপসারিত করে ইহলোকের ইন্দ্রিয়পরবশ মানব-মানবীর হর্ষশোকের মহামূল্যকে তিনি যে কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, সেটাই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এজন্যই *'বিষাদ-সিন্ধু'*র প্রধান চরিত্রসমূহ কিস্‌সা-কাহিনীর ক্রোড়োদ্ভূত হয়েও অনেকদূর পর্যন্ত মৃত্তিকাসংলগ্ন, প্রিয়-পরিজন বেষ্টিত, শত্রু-মিত্র পরিবৃত, সজীব নরনারী।[৮৭]

প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে অপরাধ প্রবণতা থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি হলে তা হঠাৎ করে সামনে চলে আসতে পারে। এজিদের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে। এজিদ ভালোবাসার মানুষকে হারিয়ে কট্টর হয়ে উঠলেও সে মনের অজান্তেই আত্মদ্বন্দ্ব, অনুশোচনা ও পাপবোধে বিদগ্ধ হয়। ঔপন্যাসিক এজিদ মানসের সে দিকটি খুব সূক্ষ্মভাবে সচেতনতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। যতক্ষণ সে জাগ্রত ও স্বাভাবিক ছিল ততক্ষণ এজিদ প্রতিশোধ প্রবণায় উন্মত্ত হয়ে থেকেছে। প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ না থাকলে কারো পক্ষে এমন দুর্দান্ত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যখন সে নিজের আয়ত্তের বাইরে গিয়েছে তখন আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। আয়ত্তের বাইরে বা নিয়ন্ত্রণহীনতা ঘটেছে দুটো ক্ষেত্রে নিদ্রা এবং সুরাপানে নিমগ্ন থাকাকালীন। উক্ত দুটো মুহূর্তে সে অন্তর্মানসের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পরাভূত হয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছে। পাপবোধ মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে। কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তেই সে জেগে উঠেছে আপন মহিমায়। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে হয়ে উঠেছে অবিচল, দৃঢ়প্রত্যয়ী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ এক উন্মত্ত প্রেমিকসত্তার আধার।

১. এজিদ সুরাপ্রভাবে ঘোর নিদ্রাভিভূত। অনেক দিনের পর পিতাকে আজ বোধ হয় স্বপ্নে দেখিয়াই বলিলেন, "আমাকে রক্ষা করুন। আমি আর কখনোই হাসানের অনিষ্ট করিব না।"[৮৮]
২. এজিদের চক্ষে ঘুম নাই, ক্রমে পেয়ালা পূর্ণ করিতেছে, উদরে ঢালিতেছে। কিছুতেই মন প্রফুল্ল হয় না, আনন্দও জন্মে না- মনের চিন্তাও দূর হয় না। ঐ কথা-ঐ ওমর আলীর নিষ্কৃতির কথা-জয়নালের নিরুদ্দেশের কথা-মধ্যে মধ্যে আবদুল্লাহ্ জেয়াদের খণ্ডিত শিরের কত কথা মনে পড়িতেছে, -পেয়ালা চলিতেছে।[৮৯]

মারওয়ানের ক্ষেত্রেও অপরাধপ্রবণতাকে ছাপিয়ে আকস্মিকভাবে উচিত-অনুচিত বিষয়টি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। নৃশংসতাকে ছাপিয়ে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছে। তিনটি ক্ষেত্রে মারওয়ানের এরূপ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে- পরোক্ষভাবে। এক. প্রথম যুদ্ধে হোসেন ও মদিনাবাসীর প্রতি। দুই. হোসেনের মস্তক ছেদনের পর হোসেনের শিবিরে প্রবেশ করে মর্মস্পর্শী দৃশ্য অবলোকন করে। 'মারওয়ান বলিতে লাগিল, "ভাতৃগণ! হোসেন পরিবারের প্রতি কেহ কোনো প্রকার অত্যাচার করিয়ো না। সাবধান তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কোনো কথা মুখে আনিয়ো না।'[৯০] পুনরায় বলেছে, 'এখন আপনারা মহারাজ এজিদ-সৈন্য-হস্তে চির-বন্দি। বন্দির প্রতি অত্যাচার-অবিচার কাপুরুষের কার্য। বরং আপনাদের জীবন রক্ষার প্রতি সর্বদা আমাদের দৃষ্টি থাকিবে। ক্ষুৎপিপাসা নিবারণহেতু যদি কোনো

Dhaka University Institutional Repository

দ্রব্যের অভাব হইয়া থাকে, বলুন, আমি সে অভাব মোচন করিতে প্রস্তুত আছি।'[৯১] তিন. হানিফার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে। উপর্যুক্ত তিনটি ক্ষেত্রে মারওয়ানের আচরণে তাকে কখনোই মনে হয় না, তার দ্বারা হাসান ও হোসেনের ধ্বংস ও মৃত্যুর বিজয়পতাকা সূচিত হয়েছে। ভাবলে অবাক হতে হয়, এ সেই মারওয়ান যার কূটকৌশল ভয়াবহ যুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর। তবে সত্যকে সত্য বলার ক্ষেত্রে মারওয়ান কখনো কার্পণ্য করে নি। তাইতো হানিফার বাহুবল সম্পর্কে বলেছে-'যদি জানিতাম যে, হোসেন ব্যতীত মোহাম্মদ হানিফা নামে প্রবল পরাক্রান্ত আরো একজন বীর আছে, তাহা হইলে বৃদ্ধ সচিবের কথা কখনো অবহেলা করিতাম না; আপনার মত প্রবল করিয়া কোনোকালেই অগ্রসর হইতাম না; যদি হইতাম তবে অগ্রে হানিফার বধসাধন না করিয়া হোসেনের বিরুদ্ধে কিছুতেই অস্ত্র ধরিতাম না। ভ্রমই লোকের সর্বনাশের মূল। ভ্রমই মানুষের অমঙ্গলের কারণ।'[৯২] সে সত্যকে স্বীকার করেছে কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে ভয় পেয়ে কখনো পিছিয়েও যায় নি। তার উক্ত চিন্তা ও চেতনার ভেতর দিয়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের প্রতীকী ছায়া প্রকাশিত হয়েছে, যা ব্যক্তিমাত্রেরই থাকা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে সে এজিদকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। হোসেনপুত্র জয়নালকে বধ করার ব্যাপারে বার বার বাধা দেওয়াকে স্ববিরোধী মনে হলেও তা ছিল তার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও ভাবীদৃশ্য কল্পনায় একটি চৌকস পরিকল্পনা মাত্র।

> মহারাজ! এ সময় জয়নাল আবেদীনের প্রাণবিনাশ করিলে আর নিস্তার নাই। এ জ্বলন্ত আগুন এখন নির্বাণের উপায় আছে-এখনো রক্ষার উপায় আছে- এখনো সন্ধির আশা আছে। কিন্তু জয়নালের কোনো অনিষ্ট ঘটাইলে ধন, জন, রাজ্য, প্রাণ সমূলে বিনাশের সুপ্রশস্ত পথ পরিস্কার করিয়া দেওয়া হইবে।[৯৩]

'বিষাদ-সিন্ধুর-র ঘটনার বিবরণ নিটোল, নিখুঁত এবং বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বর্ণনার দ্বারা নিঃশেষিত। বিষাদ-সিন্ধু-র ভাষাতেও তাই শব্দার্থেই মর্মার্থ মেলে, অন্য কোনো ব্যঞ্জনা সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হয় না।'[৯৪] *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসের ভাষা মূলত সাধু। লেখকের বর্ণনা এবং চরিত্রের সংলাপ উভয়ক্ষেত্রে। কিন্তু সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে বিজাতীয় কিছু শব্দ। যেগুলো আমাদের সমাজ, সংস্কার, সংস্কৃতির সঙ্গে যায় না। কিন্তু নতুনত্বের বিচারে তা উৎড়িয়ে যায়। পাঠকের একঘেয়েমি দূর করে এক নতুন স্বাদের ভুবনে কয়েকদিন পরিভ্রমণের মতো পাঠকের মনে বায়ুপরিবর্তনের সজীবতা জাগায়। মীর মশাররফ হোসেন অনেকটা সচেতনভাবে প্রয়োজনের তাগিদে শব্দগুলো বসিয়েছেন। কিছুটা তার সংস্কারও হতে পারে। তবে সেজন্য তিনি পাঠকসমাজের কাছে তিনি মার্জনা চেয়েছেন। যদি সেটার প্রয়োজন ছিল না। কেননা এক জন উন্নত লেখকের ক্ষেত্রে তা গ্রহণসিদ্ধ। তিনি প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে বিনীতভাবে জানাচ্ছেন; "শাস্ত্রানুসারে পাপভয়ে ও সমাজের দৃঢ়বন্ধনে বাধ্য হইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু'-র মধ্যে কতোগুলি বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার করিতে হইল। বিজ্ঞমণ্ডলী ইহাতে যদি কোনো প্রকার দোষ বিবেচনা করেন, সদয়ভাবে মার্জনা করিবেন।"[৯৫]

Dhaka University Institutional Repository

বিনোদিনী

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর উপন্যাসে নারীচরিত্রসমূহ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ। এর ব্যাখ্যা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন, নারী চরিত্রসমূহের মধ্য দিয়ে নানা বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা রয়েছে; যা পুরষের উদ্যমের ভেতর সঞ্চারিত হতে বাধা পেয়ে তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটেছে। ফলে, পুরুষ তখন আপনার সৃষ্টিতে আঘাত করে, পীড়া দেয় এবং নিজে পীড়িত হয়। বিনোদিনীও তার ব্যতিক্রম নয়। উপন্যাসের সূচনালগ্নে মানব চরিত্রের নানামুখী বিষয়াবলি প্রকাশিত হতে থাকে। তাই বিনোদিনীর মতো চরিত্রগুলো সর্বাগ্রে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিনোদিনীর সৌন্দর্য, তার ভাষা ব্যবহার এবং সংলাপও তাই সর্বসাধারণের চোখের আড়াল থাকে না। বেরিয়ে আসে আপন মহিমায় জনসমুদ্রে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *চোখের বালি* উপন্যাসে 'বিনোদিনী' চরিত্রে একমুখী দৃষ্টি রাখেন নি। কখনো তাকে সমাজের কাছে করেছেন অনুসরণীয়, বরণীয় আবার তাকেই করেছেন নিন্দনীয়। উপন্যাসটি যে সময়ে রচিত সে সময় সামাজিক ব্যবস্থা ছিল পুরুষ শাসিত। তাই নারীকে গুরুত্ব দেবার কোনো কারণ উপস্থিত ছিল না সমাজব্যবস্থায়। নারীদের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দেবার মতো দেবতাদের সন্ধানও খুব কষ্টে মিলতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যাঙ্গনে সেই চেষ্টাই করেছেন। কিন্তু পুরোপুরি সমাজের বাহিরে যেতে পারেন নি। যাবার চেষ্টা করেছেন কিংবা বলা যায় যাবার পথটাকে কেবল জনসম্মুখ্যে তুলে ধরেছেন। বিষয়টা দাঁড়ায় এমন যে, কেউ যদি যায় সে পথে যেতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে এমনটি বলা যায় এ জন্য যে, যদি তিনি পুরুষশাসিত সমাজের বাইরে যেতে চাইতেন তাহলে বিধবা বিনোদিনীকে বিহারী থেকে আলাদা করতেন না। তবে, তিনি প্রেম-প্রীতি মূল্যহীন এমন সমাজের নৈকষ্য প্রতিচ্ছবি আঁকতে কোনো কার্পণ্যবোধ করেন নি। নইলে, বিনোদিনী চরিত্রটিকে এত নিখুঁত ও সুন্দর করে আঁকা সম্ভব ছিল না।

সমাজকে হঠাৎ করে পরিবর্তন করা যায় না। ধীরে ধীরে পরিবর্তন করতে হয়। সেজন্য মাঝে মাঝে নিয়মিত আঘাত করতে হয়। তবেই হয়তো অনিয়ম, অসাম্য কিংবা কুসংস্কার দূর করা সম্ভব হয়। যুগে যুগে, কালে কালে এমনটিই ঘটতে দেখা যায়। তাছাড়া, এক জন সাহিত্যিকের কাজ সমাজসংস্কার করা নয়। শুধু সেদিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই করে দেখিয়েছেন। বিনোদিনী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিনোদিনীকে এমন এক চরিত্র হিসেবে অঙ্কন করেছেন, যার ভেতর রয়েছে ভালোমন্দ চিন্তাবোধ, বিদ্রোহ, সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে ধিক্কার দেবার মতো মানসিক শক্তি, বর্তমানে থেকে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ভাবনার অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি নেতিবাচক ও ভুলভ্রান্তি বিশিষ্ট মানবীয় গুণাবলি সম্পন্ন সাধারণ মানুষ হিসেবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিনোদিনীর রূপ ও সৌন্দর্যকে খুব স্বল্প কথায় চমৎকারিত্বের সঙ্গে সহজ ও সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। তবে তার সৌন্দর্যকে তিনি দুটি ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। গভীর উপলব্ধি ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে এভাবে কখনো রূপকে বিশ্লেষণ করা বা বলা যায় না। বিনোদিনীর রূপজ সৌন্দর্যের প্রথম ধাপ হলো- সর্বজন বিদিত স্বভাবসৌন্দর্য; দ্বিতীয় ধাপ হলো-বিরহ সৌন্দর্য। বিহারীর প্রেমে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত তার সৌন্দর্য প্রথম ধাপের অন্তর্ভুক্ত এবং বিহারীর প্রেমে মত্ত হবার পর তার দ্বিতীয় ধাপের বিরহ সৌন্দর্যের দেখা পাওয়া যায়।

১. "সত্যই মাসি, আমি বাড়াইয়া বলিতেছি না। তার যেমন বুদ্ধি তেমনি রূপ, কাজকর্মে তার তেমনি হাত।" [৯৬]
২. বিরহতাপে রমণীর সৌন্দর্যকে সুকুমার করিয়া তোলে, মহেন্দ্র এ কথা সংস্কৃত কাব্যে পড়িয়াছিল। আজ বিনোদিনীকে দেখিয়া সে তাহা যতই অনুভব করিতে লাগিল, ততই সুখমিশ্রিত দুঃখের সুতীব্র আলোড়নে তাহার হৃদয় একান্ত মথিত হইয়া উঠিল।[৯৭]

ভাষার ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম একটি দৃষ্টিনন্দন দিক। তার মতো করে ভাষার নানাবিধ ব্যবহার খুব কম লেখকের লেখনীর মধ্যেই পাওয়া যায়। পুরুষদের জন্য পুরুষালি ভাষা, নারীদের জন্য নারীসুলভ ভাষা ব্যবহারে তিনি অন্যতম। তিনি ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ ধাঁচের অপরাপর অন্যতম লেখক। তাছাড়া প্রেম নিবেদনের ভাষা এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভাষাও তাঁর লেখনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হাস্যকৌতুক এবং ঠাট্টা তামশার ক্ষেত্রেও তাঁর ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচ সকল পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি কেড়ে নেয়। বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও উক্ত বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। বিনোদিনী ও আশালতার মাঝে যে কথাবার্তা তার অধিকাংশ হাস্যরসাত্মক, বুদ্ধিদীপ্ত ও মার্জিত শৃঙ্কার রসে সিক্ত।

১. চকোরী যে আজ চাঁদকে ছাড়িয়া মেঘের দরবারে![৯৮]
২. তোমার দুই ছত্র চিঠি আমার নির্বাসনের আহার-তাহা যদি না পাই, তবে আমার কেবল নির্বাসনদণ্ড নহে, প্রাণদণ্ড।[৯৯]

বিনোদিনীর আত্মবিশ্বাস প্রখর। সেই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সে মহেন্দ্রর দিকে তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়তেও দ্বিধা করে নি। আশালতার সামনে তাকে খাটো করেছে। যদিও আশালতা সেটা বুঝতে পারে নি। উপন্যাস জুড়ে অনেক সংলাপের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি সংলাপ হলো- 'ঠাকুরপো, আমি হার মানিয়াছি, না তোমাকে হার মানাইয়াছি?'[১০০]। কারণ এই সংলাপের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুরো উপন্যাসের একটি বিশেষ দিক। হার মানিয়াছি, না মানাইয়াছি। হার সে বিনোদিনী কখনো মানে নি সেটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য সে হার মানিয়েছে। তবে যে প্রক্রিয়াটি সে অবলম্বন করেছে সেটাই বিনোদিনী চরিত্রের মূলত নেতিবাচক দিক। তাছাড়া পরবর্তী সময়ে দেখা যায় সে নিজেও হার মেনেছে তবে সেটা মহেন্দ্রের কাছে নয়, বিহারীর কাছে। তার সংলাপে নেই কোনো জড়তা কিংবা ভীতিভাব। সহজ, সাবলীল কিন্তু অদম্য। এর উদাহরণ-

Dhaka University Institutional Repository

বিনোদিনী ক্রুদ্ধা রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে একবার চাহিল। তাহার পর অগ্রসর হইয়া অবিচলিতভাবে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, "যাইব।"[১০১]

রবীন্দ্র-উপন্যাসে তাত্ত্বিক সৌন্দর্য বা তত্ত্বকথা বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। *চোখের বালি* উপন্যাসেও তা দেখা যায়। প্রায় প্রতিটি চরিত্রের ভেতর এ ধরনের বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়। সংসার, সাংসারিক ও সামাজিক মর্যাদা, বিধবা, মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ে উক্ত তাত্ত্বিক বক্তব্য *চোখের বালি* উপন্যাসে দেখা যায়। বিনোদিনী সুখসন্ধানী। কিন্তু সংসারে কোথাও সেই সুখ-ই সে খুঁজে পায় না। পিতাগৃহে, স্বামীগৃহে, প্রেম প্রত্যাশী গৃহে তথা মহেন্দ্রের গৃহে এবং শেষ পর্যন্ত বিহারীর কাছেও সে সুখ খুঁজে পায় নি। অধিকার কেউ কাউকে দেয় না। সেজন্য লড়াই কিংবা সংগ্রাম করার প্রয়োজন হয়। বিনোদিনী সেটা করেও প্রকৃত অর্থে যথাযথ বা বাঞ্ছনীয় সে সম্মান কিংবা মর্যাদা সে লাভ করতে পারে নি। তৎকালীন সংসারে বিধবাদের কোথাও ঠাঁই হতো না। বিনোদিনীরও তাই ঠাঁই হয় না তথাকথিত সমাজ-সংসারে। প্রচলিত সত্য- নদীর এ কূল ভাঙে, ও পাড় গড়ে। কিন্তু বিনোদিনীর জীবনের কোনো কূল গড়ে ওঠে নি, কেবল ভেঙেই গেছে। তার অপরাধ সে বিধবা। সংসারী নারী হিসেবে যে সমস্ত গুণ তার থাকার দরকার ছিল সবই তার আছে। তারপরও তার ঠাঁই কোথাও হয় নি, সে বিধবা বলে। বিনোদিনীর জীবনাচরণে সেই বিষয়ই বার বার এসেছে। যার শেষ আশ্রয়স্থল একটাই মন্দের ভালো- কাশী। অন্তত সেই সমাজে প্রচলিত ছিল না। সব সময়ই সেটা সবার কাছে নিরুৎসাহের ছিল, সহমরণপ্রথা বিলুপ্তির পর থেকে। বিধবা'রা বৈধব্যব্রত পালন করবে বাকী জীবন সেটাই তার নিয়তি। তাই বলে কেউ স্বেচ্ছায় আত্মহননের পথ বেছে নেবে সেটা সমাজ মেনে নেওয়ার দুঃসাহস দেখাতো না। তাই বেঁধে মারা যাবে, পুড়ে মরা যাবে না। উপর্যুক্ত সত্যগুলো হেঁয়ালি বা তত্ত্বকথা হিসেবে ঘুরে ফিরে এসেছে চোখের বালি উপন্যাসে। নিম্নে তার কিছু নিদর্শন দিতে প্রয়াস পাব।

১. সংসারের সুখের স্থানই সব চেয়ে সংকীর্ণ-কোথাও তাহাকে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে রাখিবার অবকাশ নাই।[১০২]
২. অধিকারলাভের যে মর্যাদা আছে, সেই মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে অধিকারপ্রয়োগকে সংযত করিতে হয়।[১০৩]
৩. কষ্টের ভালো চিকিৎসা ছিল যখন বিধবারা পুড়িয়া মরিত-এখন এ তো কেবল বাঁধিয়া মারা।[১০৪]
৪. উগ্র বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা আনে-মৃত্যু আনে না।[১০৫]

Dhaka University Institutional Repository

গোলাপজান ও দুর্গা

আনোয়ারা উপন্যাসে নজিবুর রহমান অনেকগুলো নেতিবাচক চরিত্র ব্যবহার করেছেন। তাদের মধ্যে দু'জন নারীকে প্রধানরূপে দেখিয়েছেন। একজন কেন্দ্রিয় নারী চরিত্র আনোয়ারার বিমাতা 'গোলাপজান' এবং অপরজন ভাগ্যবিড়ম্বিত বৈষ্ণবী-নারী 'দুর্গা'। গোলাপজানের নেতিবাচক আচরণের মূল কারণ দুটো; একটা বংশানুক্রমিক অপরটি নিয়তি। অন্যদিকে 'দুর্গা' চরিত্রের নেতিবাচকতার কারণ হিসেবে দেখা যায় ভাগ্যবিড়ম্বনা বা নিয়তি। কেননা তাকে অনেকবার সঙ্গীকে জড়িয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন কিংবা বলা যায় স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করতে দেখা গেছে, কিন্তু নিয়তি তাকে দেশান্তরিত করেছে, বারবার সঙ্গিহীন করেছে। জীবনের শেষ পর্যায়ে যৌবন ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি পৌঁছে ভাগ্যের শিকার হয়ে এবং গ্রামের প্রভাবশালী কয়েকজন ব্যক্তির প্রভাবে এবং চক্রান্তকারিণী হিসেবে পরিচিতি করেছে। আব্বাস আলী, রহমতুল্লাহ প্রভৃতি ব্যক্তি দুর্গার জীবনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। লেখক একদিকে যেমন দুর্গা ও গোলাপজানের পথে আসার সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত কমনীয়তার সঙ্গে প্রথমেই বর্ণনা করে নিয়েছেন। গোলাপজানের ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষের ধারাবাহিকতা টেনে দেখাতে চেয়েছেন যে, তার নিষ্ঠুরতা বংশানুক্রমিক প্রাপ্ত, তার পূর্বপুরুষ দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল, সেই পরম্পরায় তাকেও সাহসী হতে দেখা যায়। তার সাহসকে শেক্সপীয়রের লেডি ম্যাকবেথের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কারণ লেডি ম্যাকবেথ স্বামীসহযোগে যেভাবে রাজা ডানকানকে হত্যা করেছিল, হুবহু একই কায়দায় গোলাপজান তাদের জামাইকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে নিজেদের ছেলে বাদশাহকে হত্যা করেছে। লেডি ম্যাকবেথ যেভাবে তার স্বামীকে উৎসাহিত, উদ্দীপিত ও প্রভাবিত করেছিল অনুরূপ গোলাপজান তার স্বামী খোরশেদ আলী ভূঞাকে উদ্দীপ্ত করেছে, পৌরুষকে আঘাত করে সহযোগিতায় রাজি করিয়েছে। এতে মনে হয় লেখক নজিবর রহমান শেক্সপীয়রকে এই এক স্থলে কেবল হয়তো ধারণাকে অনুকরণ করে থাকবেন। অপরদিকে দুর্গার ক্ষেত্রে নিয়তির বিপর্যয় কখনো তার পিছু ছাড়েনি। বারবার বিপর্যয়ের মুখোমুখী হতে হয়েছে। জীবন-সঙ্গীদের একের পর এক মৃত্যুকে সে উপেক্ষা করে নতুন জীবনসঙ্গী সহযোগে নতুনভাবে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ তরুণ বৈষ্ণবও যখন মুত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তখন মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে, বিপর্যস্ত হয়েছে। এই বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়েছে গ্রামের সুযোগসন্ধানী, কুচক্রী ব্যক্তিরা। তাদের কবল থেকে বের হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাদের কুচক্রে নিজেকেও কুচক্রী সাজতে হয়েছে। আনোয়ারার মত সতী নারীর সর্বনাশ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। শেষ পরিণতি হয়েছে কারাবাস। তাকে প্রভাবিত ও সাহায্য এবং চক্রান্ত করার জন্য আব্বাস আলী, খাদেম আলী ও করিমের সাজা হয়েছে। কিন্তু মূল হোতা, উৎসমুখ, প্রশ্নয়দানকারী পিতা রহমুতল্লার সাজা হয়নি। অথচ তারই বেশি শাস্তি হবার কথা ছিল। লেখকসহ বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করলে এখনও এরূপ ঘটনা দৃষ্ট হয়। মূল অপরাধী সবসময়, সবকালে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এই যে স্ত্রীলোকটি দেখিতেছেন, এইটি বদমাইশ দলের গোড়া। ইহার নাম দুর্গা।[১০৬]

গোলাপজানের সংলাপ রচিত হয়েছে সাধারণ সাধুভাষায় কিছুটা দাম্ভিকতা, কপটাভিমান, বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ, আত্মসচেতন, নিঃসঙ্কোচ, কটাক্ষের মিশেলে। আনোয়ারার সঙ্গে তার কথাবার্তা বক্রাত্মক, প্রতিবেশীদের সঙ্গে দাম্ভিকতা ও গর্বমিশ্রিত, স্বামীর সঙ্গে কপট অভিমান, বুদ্ধিদীপ্ত। শাশুড়ি, আনোয়ারা, স্বামীসহ সবার সঙ্গেই তার কথোপকথন নির্ভীকচিত্ত বিশিষ্ট। উদাহরণস্বরূপ চতুর্থ পরিচ্ছেদে স্বামীর সঙ্গে তার সংলাপ-

গোলাপজান গর্বভরে নিঃসঙ্কোচে কহিল, 'বেশ করিয়াছি, আরও করিব।[১০৭]

বাঙালি মন ও মানসে গেঁথে যাওয়া ধারণা হল বিমাতা মাত্রেই ক্রূর প্রকৃতির একজন মানুষ। তাছাড়া ধরেই নেওয়া হয় বিমাতাদের আচরণ হবে নেতিবাচক। বিমাতা গোলাপজানের প্রকৃতি ও গতানুগতিক ধারার বাইরে যায় নি। ফলে প্রমদার কাছে স্বামীর পূর্ব স্ত্রীর কন্যা আনোয়ারার মূল্যায়ণ সমাজের অন্যান্য বিমাতাদের মতই। আনোয়ারার কোনো বিষয়ে ইতিবাচকতা প্রমদার মুখে পাওয়া যায় না। আনোয়ারার সৌন্দর্য নিয়ে যখন পাড়ার অন্যান্য নারীদের ভেতর কথা হচ্ছিল তখন প্রমদা বলেছে-

আমাদের গাঁয়ের রেবতী ঠাকুরের কন্যা এ মেয়ের চেয়ে বেশি সুন্দরী।[১০৮]

দুর্গা ও গোলাপজান একই শ্রেণিভুক্ত হলেও দুর্গার সংলাপ গোলাপজানের সংলাপ অপেক্ষা একটু ভিন্নতর। গোলাপজান কথোপকথনে নির্জলা সাধু ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু দুর্গার সংলাপে সাধুভাষা ব্যবহৃত হলেও তা চলিতের অনেক কাছাকাছি। আর বিশেষত্ব হল তা ব্যক্তি উপযোগী ভাষা। আনোয়ারার দাসী ও আব্বাসের সঙ্গে যথাক্রমে দুর্গার সংলাপ-

১. কেন গো, কেন?[১০৯]

২. আব্বাসের সঙ্গে সংলাপ-যাদু, শীতে কষ্ট পাইতেছি, হাতখালি, উপায় কি?[১১০]

আনোয়ারার দাসীর সঙ্গে তার সম্বোধন 'গো' এবং রহমতুল্লাহর পুত্র আব্বাস আলীকে 'যাদু' এগুলো আঞ্চলিক শব্দ হিসেবে পরিচিত। বুদ্ধিদীপ্ত এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ সংলাপও লক্ষ করা যায়। আব্বাসের উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং নিজের ভরণপোষণের জন্য সে আব্বাসের নিকট আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করেছে এভাবে-'ঘরে একমুঠো চালও নাই, ভিক্ষা ত কেবল তোমারই কার্যোপলক্ষে কাল হাট হইবে কি দিয়া, তাই ভাবিতেছি।'[১১১] দুর্গার কথাবার্তায় চটুলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আনোয়ারাকে হস্তগত করতে সে যথেষ্ট সতর্কতা, সচেতনতা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। তারই বক্তব্য থেকে তার

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধিমত্তার ভাব বোঝা যায়। চলতে গিয়ে তাকে নানা রকম মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। এ কারণে যথোপযুক্ত ভাষা তার আয়ত্তে। সে স্বাভাবিক কথাবার্তায় যেমন সিদ্ধ, তেমনি কৈতববাদমিশ্রিত সংলাপেও দক্ষ। আব্বাসের সঙ্গে তার সংলাপে উপযুক্ত কৈতববাদ প্রকাশ পেয়েছে-

তোমার কার্য হাসিলের জন্য আমার রাত্রিতে ঘুম হয় না; নিশ্চিত থাকা দূরের কথা।[১১২]

দুর্গা সামাজিক মানুষ নয়। সমাজের নির্দিষ্ট রীতি-নীতিতে সে অভ্যস্ত নয়। তারপরও তার আচরণে কোনোরূপ অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয় না। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের মত দুর্গার আচরণেও আত্মসম্মানবোধ, মানবীয় চাওয়া-পাওয়া কিংবা প্রতিহিংসা লক্ষ করা যায়। আনোয়ারা ঐশ্বরিক কারণে দুর্গাকে সন্দেহ করেছে, তার অতিরিক্ত আগ্রহবোধ পছন্দ করে নি। তাই আনোয়ারা দাসী দ্বারা দুর্গা বৈষ্ণবীকে তাদের বাড়ি যেতে নিষেধ করেছিল। এই বিষয়টা দুর্গার আত্মসম্মানবোধে আঘাত করেছিল। তাই সে সগোক্তি করেছে-

আমার নাম দুর্গা বৈষ্ণবী। আমি এ অপমানের শোধ লইব, তবে ছাড়িব।[১১৩]

ঔপন্যাসিক নজিবর রহমান গোলাপজানকে নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করলেও তার রূপবর্ণনায় অনেকগুলো অলঙ্কার ইতিবাচক অর্থে ব্যবহার করেছেন- যেটা নজিবর রহমান তাঁর 'প্রমদা' চরিত্রে দেখান নি। গোলাপজানের নেতিবাচক আচরণের একটা বড় কারণ ছিল সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্যকেই লেখক বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কারে সুসজ্জিত করেছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখা যায় লেখক গোলাপজানের সৌন্দর্যকে পৃথিবীর মনোলভা রূপের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন-

গোলাপজান ভুবনমোহিনী।[১১৪]

'ভুবনমোহিনী' শব্দটি সমাসবদ্ধ শব্দ। যাকে বিশ্লেষণ করলে ব্যাসবাক্য দাঁড়ায়, ভুবন রূপ মোহিনী? উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। এজন্য বাক্যটাকে বলা হবে রূপক অলঙ্কার। গোলাপজানের সৌন্দর্য বর্ণনায় ঔপন্যাসিক ততোধিক বিশেষণ অর্থাৎ পরিকর অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। যেমন:

গোলাপজানের দুধে-আলতা-মাখান দেহলাবণ্য ভিত্তিগাত্র সংলগ্ন সুশুভ্র কাচ কাঞ্চনরশ্মি-প্রভায় জুলেখার সৌন্দর্য পরাভূত করিয়াছে।[১১৫]

Dhaka University Institutional Repository

গোলাপজানের দেহলাবণ্যকে দুধ ও আলতার মিশ্রণের সঙ্গে এবং সুশুভ্র কাঁচ ও কাঞ্চন রশ্মির প্রভার সঙ্গে তুলনা করতে বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ একাধিক বিশেষণের ব্যবহারে সৃষ্ট অলঙ্কারকে পরিকর অলঙ্কার বলা হয়।

.... কামিনী কটাক্ষ দামিনীর প্রকৃতিসম্পন্ন।[১১৬]

'কামিনী-কটাক্ষ' সমাসবদ্ধ শব্দ। এটাকে বিশ্লেষণ করলে হবে 'কামিনী রূপ কটাক্ষ'; যা রূপক অলঙ্কারের উদাহরণ। অপরদিকে কামিনী কটাক্ষকে (নারীর বক্রচাহনি) দামিনীর (বিদ্যুৎ) সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা উপমা অলঙ্কারের ব্যবহারও গোলাপজান চরিত্রে দেখা যায়। লেখক শশিভূষণের ওপর গোলাপজানের প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

রৌপ্য-সুন্দরীর মোহিনী মায়ায় পতিও তখন অল্পে অল্পে অতিভূত হইয়া পড়িতেছিলেন।[১১৭]

'রৌপ্য-সুন্দরী' মানে রূপার মত সুন্দরী। উপমান রূপা ও উপমেয় সুন্দরীর ভেতর অভেদ কল্পনা করা যায় বলেই এটা রূপক অলঙ্কার। 'দুর্গা' চরিত্র অঙ্কনে ঔপন্যাসিক বেশি অলঙ্কার ব্যবহার করেননি। কেবল তার একটিমাত্র ইতিবাচক উপমা ব্যবহার করেছেন। দুর্গার নাম দুর্গা হবার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার মুখায়বের সৌন্দর্য দেবী দুর্গার সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন-

তাহাকে দুর্গার মত সুন্দরী দেখাইত বলিয়া তাহার পৈতৃক গুরুদেব দুর্গা নাম রাখিয়া ছিলেন।[১১৮]

উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত অলঙ্কার হল উপমা অলঙ্কার। কারণ দুর্গাকে দেবী দুর্গার সঙ্গে 'মত' দ্বারা সরাসরি তুলনা করেছেন।

কিরণময়ী

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৭৬-১৯৩৮) কিরণময়ী চরিত্রটিকে যে আঙ্গিকে এঁকেছেন তা তৎকালীন সমাজের একটি খুব সাধারণ চিত্র। সামাজিক দৃষ্টিতে বিধবা নারীদের অবৈধ প্রেম। সামাজিকভাবে উক্ত বিষয়টিকে অত্যন্ত ঘৃণিত ও বড় ধরণের অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। তাই সামাজিক দৃষ্টিকোণকে প্রাধান্য দিলে কিরণময়ীকে 'খল' বলা যেতে পারে। কিরণময়ীর নেতিবাচক দিকটি গড়ে উঠেছে অপ্রাপ্তিবোধ থেকে। প্রেমজনিত অপ্রাপ্তিবোধ। প্রত্যেক মানুষের ভেতর প্রেমের বোধ লুক্কায়িত থাকে। উপযুক্ত পাত্র ও পরিবেশ পেলে তার প্রকাশ ঘটে। কিরণময়ীর ক্ষেত্রেও সেটা ঘটেছে। তবে, তার ভেতর প্রেম জেগে ওঠে বিয়ের পর স্বামী যখন মৃত্যুপথযাত্রী। কিরণময়ীর ভাষায়-

Dhaka University Institutional Repository

> কিরণময়ী বিষের মত একটুখানি হাসিয়া কহিল, তিনিই! হায় রে পোড়া কপাল! এ ঘরে স্বামী মর-মর, ও-ঘরে গেলুম তাঁকে নিয়ে ভালবাসার সাধ মিটোতে।[১১৯]

কিরণময়ীকে উপন্যাসের শুরুতে বেশ বুদ্ধিমতি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত সেই বুদ্ধিমত্তাকে ধরে রাখার প্রয়াস দেখা যায় না। উপেন্দ্রের ভাই দিবাকরকে ধরে রাখতে গিয়ে কিরণময়ীর বুদ্ধিমত্তাকে চিহ্নিত করা যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বুদ্ধিমত্তাকে বিসর্জন দিতে দেখা যায় দিবাকরকে ঘিরেই। উপেন্দ্রকে পাওয়ার জন্য এবং নিজের সম্পত্তি হাত ছাড়া যেন না হয়, সেই দুটি দিক থেকে নিশ্চয়তার খাতিরেই কিরণময়ী দিবাকরকে কাছে রাখতে চেয়েছে। ছোট ভাই হিসেবে তাকে নিয়ে সীমালঙ্ঘনের খেলায় মেতে উঠেছে।

> রমনী যে কিরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমতি তাহা জানিতে তাহার বাকী নাই। সে যে সঙ্গত অসঙ্গত সাংসারিক ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা সবিশেষ জানিয়া বুঝিয়াই ও প্রসঙ্গ উস্থাপিত করিয়াছে তাহাতেও সংশয় নাই- হবে, এ কি কথা? কেমন করিয়া কহিল?[১২০]

যুক্তিবাদিতা হিসেবে কিরণময়ীকে খুঁজে পাওয়া যায়। সে অনেক বার অনেক যুক্তি দিয়ে অনেককে পরাজিত করেছে। ঠাকুরপো সতীশকে যুক্তি দিয়ে পরাজিত ও তাকে তার অনুগত ভক্তে রূপান্তরিত করেছে। দিবাকরকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে আরাকানের পথে পাড়ি দিতে বাধ্য করেছে। সুরবালাকে সে যুক্তি দিয়ে পরাজিত করতে পারলেও তার ঈশ্বরপ্রীতিকে সম্মান জানিয়ে পিছনে সরে এসেছে। উপেন্দ্রকে পরাজিত করেছে ভাবলেও পরবর্তী সময়ে তার বোধ হয় যে, সে মূলত উপেন্দ্রের কাছে জিতে নি, বরং উপেন্দ্র তার সঙ্গে তর্কে না জড়িয়ে তাকে সুযোগ দিয়েছে এবং তার তর্ককে ইতিবাচক হিসেবে ধরে পরাজয় বরণ করেছে। যুক্তির সাহায্যে সে অনঙ্গ ডাক্তারকে তার জীবন থেকে একবারে সরিয়ে দিয়েছে।

> হাঁ, ও-গুলো আমার জিনিস বটে, কিন্তু ঐ-গুলোর মায়াতেই আপনার সাহায্য নিয়েছিলুম।[১২১]

কিরণময়ী অপরাধ করলেও তার অপরাধবোধ ছিল। সে পুরো উপন্যাস জুড়ে বেশ কয়েক বার বড় অপরাধ করেছে এবং তার প্রায়শ্চিতও সে করেছে। প্রথমত, অপরাধবোধ তাকে কুড়ে খেয়েছে, দ্বিতীয়ত, অপরাধবোধ তার কাছের মানুষকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে অপরাধ করায় তার ধারণা ছিল অনঙ্গ ডাক্তার তাকে কিছু না বলায় সে অবাক হয় এবং অপরাধবোধের অনলে দগ্ধ হয়। উপেন্দ্র, যাকে পাবার জন্য অনেকগুলো অপরাধ কিরণময়ীর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল, সেই উপেন্দ্রকে সে চিরকালের মতো হারিয়ে ফেলে।

Dhaka University Institutional Repository

> প্রয়োজনের অনুরোধে যে পাপ নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বড় করিয়াছে, সে যে আজ যাও বলিতেই গেল, এমন অসম্ভব কেমন করিয়া হইল! মান-ভিক্ষা, সাধাসাধি, কান্নাকাটি, বিচ্ছেদের মর্মস্পর্শী অনুনয় বিনয়, এ কাজের অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারগুলো, যাহার কল্পনা-মাত্র তাহাকে প্রতিদিন তপ্তশেলে বিঁধিয়া গেছে, সে সমস্তই যে বাকি রহিল। সে কি আর একদিনের জন্য, না, সত্যই সমস্ত নিঃশেষ হইল![১২২]

মানসিক দৃঢ়তা কিরণময়ীর অনেক। সেটা বোঝা যায়, তার স্বামীর মৃত্যুর ক্ষণ সন্নিকটে এলে খুব স্বাভাবিকভাবে সে প্রকৃতির নিয়মকে সহজভাবে গ্রহণ করে এবং উপেন্দ্রের কাছে টেলিগ্রাম করার কথা বলে। সাহস ও মানসিক দৃঢ়তা না থাকলে সে দিবাকরকে নিয়ে অজানার পথে পাড়ি দিতে পারতো না। নিজেকে সংবরণ করতে পারতো না। নারীর ইজ্জত বলতে যা বোঝায়, সেটাকে সে রক্ষা করতে পারতো না। দিবাকরের সঙ্গে অনেকদিন বাস করার পরও সে সেটাকে রক্ষা করতে পেরেছে। যদিও সতীত্বের সংজ্ঞা কি সেটা সমালোচনাবিদ্ধ হয়েছে কিরণময়ীর আচরণগত কারণে।

> কিরণময়ীর মুখের উপর দিয়া শরতের একখণ্ড লঘু মেঘ ভাসিয়া গেল মাত্র। এ মুখের সহিত যাহার বিশেষ পরিচয় নাই, এ ছায়াটুকু তাহার নজরে পড়িবে না। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, এইবার বোধ করি যন্ত্রণার শেষ হ'য়ে এসেছে-তুমি একখানা টেলিগ্রাম করে দাও।[১২৩]

একটি নারীর সত্যিকারের ভূষণ হলো তার সৌন্দর্য। প্রতিটি ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে এই সৌন্দর্যের সংজ্ঞা তাদের নিজেদের মতো করে দিয়েছেন। কারণ সৌন্দর্য বিষয়টি আপেক্ষিক। যাকে কোনো সংজ্ঞায় ধরে রাখা যায় না। দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার মাত্র। এক জন ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দের উপর ভিত্তি করে তার উপন্যাসের চরিত্রে সৌন্দর্যের মান নিরূপিত হয় স্বমহিমায়।

১. কাল দীপের আলোকে যে মুখ সুন্দর দেখাইয়াছিল, আজ দিনের বেলা, সূর্য্যালোকে স্পষ্ট বোঝা গেল এমন সৌন্দর্য্য আর কোনো দিন চোখে পড়ে নাই। জীবিতেও না, ছবিতেও না।[১২৪]
২. সতীশ ব্যথার উপর ব্যথা দিয়া পুনরায় কহিল, খাল খুঁড়ে কুমীর এনো না উপীনদা।[১২৫]

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিরণময়ী চরিত্রে নাস্তিকতা ও আস্তিকতাকে তুলে ধরেছেন। কিরণময়ী নানা যুক্তি উপস্থাপন করে বোঝাতে চেয়েছে কোনো ধর্মগ্রন্থই অভ্রান্ত সত্য নয়। এ নিয়ে সতীশ ও উপেন্দ্রর সঙ্গে তাকে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতে দেখা যায়। বিশেষ করে সতীশকে সে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, ধর্মগ্রন্থে অনেক ভুল ও অসত্য তথ্য রয়েছে। 'বেদ' নামক ধর্মগ্রন্থকেও ভুলে ভরা বলে মন্তব্য করে কিরণময়ী। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ দৃশ্যের পূর্ব পর্যন্ত তাকে এই আস্তিকতাকে আশ্রয় করতে দেখা যায়। কিন্তু প্রেমের কাছে নাস্তিকতা পরিণত হয় আস্তিকতায়। উপেন্দ্রর প্রেমে পড়ে উপন্যাসের শেষ দিকে সে আস্তিক হয়ে ওঠে। যে ধর্মকে সে বিশ্বাস করতো না,

Dhaka University Institutional Repository

সেই দেবতার দুয়ারে সে মাথা নোয়ায় উপেন্দ্রের প্রাণের আশায়, তার রোগমুক্তির জন্য। এই ঘটনার মাধ্যমে মূলত লেখকের ব্যক্তিগত ধর্মীয় মতবাদ ফুটে উঠেছে বলেই মনে হয়।

> তাহার বিস্ময়ের পরিমাণ দেখিয়া কিরণময়ী আবার হাসিল। কহিল, কোন ধর্ম্মগ্রন্থই কখনও অভ্রান্ত সত্য হ'তে পারে না। বেদও ধর্ম্মগ্রন্থ। সুতরাং, এতেও মিথ্যার অভাব নেই।[১২৬]

ঔপন্যাসিকের অনেক ব্যক্তিগত চিন্তাচেতনা কিরণময়ী চরিত্রের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে, প্রেম, ধর্ম, যৌবন, নারীর রূপ প্রভৃতি বিষয়ে লেখকের সুচিন্তিত মতবাদ কিরণময়ীকে আশ্রয় করে তার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। প্রত্যেক ঔপন্যাসিকের বিশেষ করে নারীর রূপ সম্পর্কে সবার একটা নিজস্ব ধারণা রয়েছে, যা তারা অন্তরে লালন ও মনে বিশ্বাস করেন। এবং তা তাদের লেখনীর মাধ্যমে কোনো না কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তাই, প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসে সাধারণত কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রের সৌন্দর্য বর্ণনার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই রকম ধ্যান-ধারণা *চরিত্রহীন* উপন্যাসে কিরণময়ীর রূপবর্ণনা এবং তার মুখে সেটা বেরিয়ে এসেছে।

> মনে হয় সন্তান ধারণের জন্য যে সমস্ত লক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী তাই নারীর রূপ।[১২৭]

চরিত্রহীন উপন্যাসে কিরণময়ীর মূল আবেদন প্রেম। অচরিতার্থ প্রেম। ছোটকালে পরিবারের মানুষদের কাছে পায় নি। বড় হয়ে স্বামীর সংসারে এসে পায় নি। ফলে, তা পাবার ব্যাকুল বাসনা-ই তাকে বিপথগামী করে তোলে। ডাক্তার অনঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সেখানেও সে তার কল্পনার রঙে রাঙানো প্রেমের সঙ্গে মেলে না। ফলে তাকে ত্যাগ করে। উপেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হবার পর তার মনে হয়, যে প্রেমের খোঁজে সে নেমেছে, তা উপেন্দ্রের কাছে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু উপেন্দ্র বিবাহিত হওয়ায় সে একটা হোঁচট খায়, তবে হাল ছাড়ে না। বিভিন্ন কৌশলে তাকে সে কাছে পাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। যখন পায়, তখন আর উপভোগ করার সময় থাকে না। তবে, তার এই প্রেমবাসনা অনেকটা যৌক্তিক। কেননা, সারা জীবন সে প্রেম-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। স্বামীর কাছ থেকে সে সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা করেছিল কিন্তু সেখানেই সে বেশি অবহেলা ও নির্যাতনের স্বীকার হয়। প্রথমত, স্বামী হারানের কাছে, দ্বিতীয়ত, তার শাশুড়ির কাছে। শাশুড়ির নির্যাতন ছিল অমানবিক। নির্যাতনের একটি চিত্র নিম্নরূপ-

> শাশুড়ির পরীক্ষা ছিল আরও কঠোর। সেখানে অতি ক্ষুদ্র ভুল-ভ্রান্তির ক্ষমাও ছিল না! অঘোরময়ী তাঁর রান্নাঘরের হাতা-বেড়ি খন্তি হইতে পোড়া কাঠ পর্যন্ত সবগুলির চিহ্নই ছোট বধুটির দেহে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। একদিন কি একটা অপরাধের শাস্তিবিধান করিয়া তিনি বালিকার চুলগুলি কাটিয়া দিলেন। দুঃখে অভিমানে বধু যখন রান্নাঘরের এক কোণে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল তখন পিঠের উপরে জ্বলন্ত কাঠরে খোঁচা দিয়া অঘোরময়ী চুপ করিতে আদেশ করিলেন। সেই দগ্ধক্ষত আরোগ্য হইতে কিরণময়ীর একমাস লাগিয়াছিল।[১২৮]

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামাসুন্দরী

যোগাযোগ উপন্যাসের প্রায় মাঝামাঝি পর্যায়ে শ্যামাসুন্দরীর আবির্ভাব। উপন্যাসের প্রথম পর্যায় বিকশিত পুঁজিবাদের প্রতীক মধুসূদন ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজের প্রতীভূ বিপ্রদাশকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনিকে সমৃদ্ধকরণ এবং ক্রমশ উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনেই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্যামাসুন্দরীকে উপন্যাসটির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কুমুদিনীর সঙ্গে মধুসূদনের বিয়ের পরই শ্যামাসুন্দরীর দেখা মেলে। শ্যামাসুন্দরী'র চেহরা ও গঠন সম্পর্কে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই বর্ণনা করেছেন। তার ভাষায়-

১. পরিণত বয়সী আঁটসাঁট গড়নের শ্যামবর্ণ একটি সুন্দরী বিধবা।[১২৯]

২. শ্যামা কি কুমুর চেয়ে কম সুন্দরী, না-হয় ওর রঙ একটু কালো- কিন্তু ওর চোখ, ওর চুল, ওর রসালো ঠোঁট![১৩০]

শ্যামাকে ঔপন্যাসিক ভালোবাসার আধার হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। শ্যামা বিধবা নারী হলেও তার প্রেমসত্তা জাগ্রত। এর পেছনের কারণ হতে পারে স্বামীর ভালোবাসা না পাওয়া। তাছাড়া সে যৌবনা রমনী। তার ভালোবাসার পিপাসা তখনো নিবৃত্ত হয় নি। নতুন করে কাউকে বিয়ে করার রীতি তখনো সেভাবে প্রচলিত নয়। বাইরে বের হবার ব্যাপারেও স্বাধীনতা নেই। নতুন করে কোনো মানুষের প্রেমে পড়ার সুযোগও নেই। ফলে এক মাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায় অবিবাহিত মধুসূদন। তাকেই সে আশ্রয় করে বাঁচতে চায়, ভালোবাসতে চায়। নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে চায়। তাই সে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে শুরু করে মধুসূদনকে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়-

> শ্যামার মুশকিল এই মধুসূদনকে সে সত্যিই ভালোবাসে, তাই মধুসূদনের মেজাজের উপর বেশি চাপ দিতে ওর সাহস হয় না, সোহাগ কোন সীমায় স্পর্ধায় এসে পৌঁছবে খুব ভয়ে ভয়ে তারই আন্দাজ করে চলে। মধুসূদনও নিশ্চিত জানে শ্যামার সম্বন্ধে সময় বা ভাবনা নষ্ট করবার দরকার নেই। আদর-আবদার-ঘটিত অপব্যয়ের পরিমাণ সংকোচ করলেও দুর্ঘটনার আশঙ্কা অল্প।[১৩১]

মধুসূদনের বিয়ের পূর্বে মধুসূদন যে শ্যামাকে ভালোবাসতো তা নয়, কিন্তু ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর প্রতি তার কিছু দায় দায়িত্ব থাকে, সেটা সে কিঞ্চিৎ পূরণ করতে চেষ্টা করেছে। সেটাকে ভালোবাসা বলা যায় না। তখন শ্যামার কাছে সেটাই ভালোবাসা ছিল অথবা, সেটাকেই ভালোবাসা হিসেবে ধরে নিয়েছিল। ভেবেছিল ব্যবসায় ব্যস্ত মধুসূদনের ভালোবাসার স্বরূপ হয়তো এমনই ছাড়াছাড়া।

> মধুসূদন যখন শ্যামাকে গ্রহণ করে নি তখন শ্যামার এত অসহ্য দুঃখ ছিল না। সে আপন উপবাসী ভাগ্যকে একরকম করে মেনে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে সামান্য খোরাককেই যথেষ্ট মনে হত।[১৩২]

Dhaka University Institutional Repository

ভালোবাসার অপূর্ব নিদর্শনের দেখা মেলে 'শ্যামাসুন্দরী' চরিত্রের মধ্যে। বার বার অপমানিত হবার পরেও শ্যামা মধুসূদনের কথায় অবাধ্য হতে পারে না। একদিকে ভালোবাসার মানুষ অপর দিকে তার আশ্রয়দাতা, তার অন্নদাতা। তবে আশ্রয় ও অন্নের তুলনায় তার ভালোবাসাটাই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। তাই অপমান হজম করে তারই ডাকে সারা দিয়েছে। যদি ভালোবাসা না থাকতো কিংবা মধুসূদনকে জয়ের বাঞ্ছা না থাকতো তাহলে তার ডাকে শুধু হাজির হলেই হতো কিন্তু সে যাবার পূর্বে নিজেকে পরিপাটি করে নিয়েছে, মেখেছে সুগন্ধি। এর ভেতর দিয়ে তার রুচিশীলতারও পরিচয় মেলে।

১. রাত হয়ে এল। বাইরে থেকে বেহারা খবর দিলে মহারাজ শোবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন। বলবার শক্তি নেই যে যাব না। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে একটা বুটিদার ঢাকাই শাড়ি পরে গায়ে একটু গন্ধ মেখে গেল শোবার ঘরে।[১৩৩]

২. মধুসূদনের আহারের সময় শ্যামাসুন্দরী রোজই উপস্থিত থাকে; আজও ছিল। সদ্য স্নান করে এসেছে-তার অসামান্য কালো ঘন লম্বা চুল পিঠের উপর মেলে-দেওয়া–তার উপর দিয়ে অমলশুভ্র শাড়িটি মাথার উপর টেনে দেওয়া–ভিজে চুল থেকে মাথাঘষা মসলার মৃদু গন্ধ আসছে।[১৩৪]

গভীর ভালোবাসা শুধু কাছে টানে না দূরেও ঠেলে দেয়। কিন্তু শ্যামার ক্ষেত্রে হয়েছে তার ব্যতিক্রম। কাছে টানা, কাছে যাবার আকাঙ্ক্ষাকে করেছে আরো প্রগাঢ়। মধুসূদন জানে শ্যামা তার কাছে কি চায় তারপরও সে নিজেকে যতটা সংযত করা উচিত ছিল ততটা সে করতে পারে নি। বরং মাঝে মাঝে অগ্নিতে ঘৃত ঢালার মতন শ্যামার স্বপ্নকে, তার ভালোবাসার বাসনাকে উস্কিয়ে দিয়েছে। ফলে দিন দিন শ্যামার প্রত্যাশার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

> পথের মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর ঘরের সামনে এসে বেশ প্রকাশ্য কণ্ঠস্বরেই বললে, "ঘরে আছ?"
> শ্যামাসুন্দরী আজ খায় নি; একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে মেজের মাদুরের উপর অবসন্ন ভাবে শুয়ে ছিল। মধুসূদনের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কী ঠাকুরপো?"
> "পান দিলে না আমাকে?"[১৩৫]

ভালোবাসা ভাগাভাগি করবার বিষয় না। কেউ সেটা করতেও চায় না। বাঙালি নারীরা এ বিষয়ে আরো অনেক বেশি সচেতন। তাই তারা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে চায় না, চায় না কেউ সেদিকে হাত বাড়াক। বিয়ের পূর্বে মধুসূদন কেবল তারই ছিল। তারই কেবল তাতে অধিকার ছিল। এই বিশ্বাস ও ধারণা পোষণ করেই সে তার স্বপ্নের জগতকে সাজিয়েছিল। কিন্তু তাতে বাদ সাধে কুমুদিনী মধুসূদনের বধূ হয়ে এসে। কিন্তু শ্যামার কিছুই করবার ছিল না। কারণ তার প্রেমের তো কোনো স্বীকৃতি ছিল না। ছিল না কোনো পারিবারিক কিংবা সামাজিক বৈধতা। ফলে কুমুদিনীর ফটো দেখে সে খুশি হবে এমনটা কখনোই সম্ভব নয়। শ্যামাও সেটা পারে নি। মনে হয় তার ছবিটা ছিড়ে ফেলতে কিন্তু পারে না মধুসূদনের ভয়ে। তাই সে নিজের বিছানার চাদরের ওপর আক্রোশের, অভিমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

Dhaka University Institutional Repository

> এমন সময় একদিন সন্ধেবেলায় শোবার ঘরে এসে দেখে টেবিলের উপর দেয়ালে হেলানো কুমুর ফোটোগ্রাফ। যে বজ্র মাথায় পড়বে তারই বিদ্যুৎ শিখা ওর চোখে এসে পড়ল। যে মাছকে বড়শি বিঁধেছে তারই মতো করে ওর বুকের ভিতরটা ধড় ফড় করতে লাগল। ... এ ঘরে থাকলে এখনই কিছু-একটা লোকসান করে ফেলবে এই ভয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। আপনার ঘরে গিয়ে বিছানার উপর উপুর হয়ে পড়ে চাদরখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে।[১৩৬]

ভালোবাসা স্বল্পভাষী মানুষকেও বাচাল করে তোলে। শ্যামার ক্ষেত্রে তা হয়নি। সে সর্বদাই ছিল বাচাল প্রকৃতির। হতে পারে স্বামীর মৃত্যুর পর তার অতীতকে ভুলবার একটি প্রচেষ্টা। নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখা। তাই সে সবার সঙ্গেই ছিল প্রগলভা। কিন্তু একটা জায়গায় সে ছিল মার্জিত, নমনীয়, কোমনীয় এবং মিতভাষী, সেটা মধুসূদনের কাছে। ভালোবাসার মানুষের মন জয় করবার জন্য বাঙালি মেয়েদের চিরাচরিত নিয়ম মানুষটির ভালোলাগা, মন্দলাগা, কখনো মেনে নেওয়া, কখনোবা মানিয়ে নেওয়া। শ্যামা সেই কাজটিই করেছে। মধুসূদন অল্পকথার মানুষ। সুতরাং তাকেও স্বল্পভাষী হতে হবে এটাই যেন বাস্তবতা। তাই শ্যামা যা চিন্তা করে -

> প্রগলভা শ্যামা ওর কাছে ভারি চুপ করে থাকত; জানত মধুসূদন বেশি কথা সইতে পারে না।[১৩৭]

শ্যামাসুন্দরী সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছে। প্রতিটা দিন প্রতিটি মুহূর্ত তার একটিই লক্ষ্য কীভাবে মধুসূদনের নিকটবর্তী হওয়া যায়। তাই সে দুপুর এবং রাতটাকে বেছে নিয়েছে। কারণ দুপুরে মধুসূদন খেতে আসে এবং রাত্রে যখন সে ঘরে ফেরে। এই সময়দুটো ছাড়া তাকে পাওয়া কঠিন, উপরন্তু সময়দুটো নিরাপদও বটে। দুপুরে খাবার সময় যেমন তাকে কাছে থেকে খাওয়ানো কিংবা বাতাস করা যায়, তেমনি রাত্রে ঘরে ফেরার সময় মনমানসিকতাও ভালো থাকে।

> অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাবার ঝিলমিল-দেওয়া রাস্তাটাতে লণ্ঠনে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে, সেইখানে এসেই মধুসূদন দেখলে একখানা লাল শাল গায়ে জড়িয়ে শ্যামা দাঁড়িয়ে। চলে যাবার উপক্রম করে আবার সে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, "চালাকি করব না ঠাকুরপো। যা দেখতে পাচ্ছি তাতে চোখে ঘুম আসে না। আমরা তো আজ আসি নি, কত কালের সম্বন্ধ, আমরা সইব কী করে?"[১৩৮]

যোগাযোগ উপন্যাসটির ভাষা, উপন্যাসের বর্ণনা, স্টাইল ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। সমালোচকদের বিচারে মোতি'র মার ভাষা শ্রেণিকরণ অনুযায়ী ঠিক নয়। তবে শ্যামাসুন্দরীর ভাষা ও কথোপকথন অনেকটাই মানানসই। ভূদেব চৌধুরীর মতে, উপন্যাসটি অস্ফুট এপিক কল্পনার নিরিখ অবসান এবং গল্পের থিমে চরিত্রের আচরণে জগতের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে কোথাও যদি বেধেও যায়,

Dhaka University Institutional Repository

তাহলেও সেখানে হিসেব নিকেশের প্রশ্ন ওঠে না পৃথক সচেতন ভাবনার দরবারে। এবং সেটাই *যোগাযোগ* উপন্যাসের শিল্প চারুতার স্বাতন্ত্র্য। সমালোচক নীহাররঞ্জন রায়-এর মতে, *যোগাযোগ* এর বাক্যভঙ্গি তীব্র শাণিত; বুদ্ধির দীপ্তি এবং এপিগ্রাম সূক্ষ্ম তীক্ষ্ম ব্যঙ্গময় ঔজ্জ্বল্যে ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি যেন রৌদ্রকিরণে ঝলকিত মৃদু উদ্বেলিত জলস্রোতের মতন দীপ্ত ও শাণিত। *যোগাযোগ* উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরীর ভাষা রহস্যঘেরা। তার মনের বক্তব্য পাঠক সমাজে স্পষ্ট হলেও তা উপন্যাসটির অন্যান্য চরিত্রের কাছে তা মাঝে মাঝেই রহস্যের আবর্তে বন্দী।

> আমরা তো ভেবেছিলুম শেষ পর্যন্ত জমাখরচের খাতাই হবে ওর বউ। তা ঐ খাতার মধ্যে জাদু আছে ভাই, এত বয়সে এমন সুন্দরী ঐ খাতার জোরেই জুটল। এখন হজম করতে পারলে হয়।[১৩৯]

যোগাযোগ উপন্যাসে শ্যামার কথায় আঞ্চলিক ধাঁচের মিশ্রণ রয়েছে। কিছুটা উপন্যাসের সফল ও জনপ্রিয় স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নারীচরিত্রের কথোপকথের মতো। যেমন : বলতে পারিনে, হেদিয়ে গেল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও এ ধরনের শব্দ পাওয়া যায়। শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনকে বলেছে-

> "তা তো বলতে পারি নে, দাদা দাদা করেই বউ হেদিয়ে গেল। তা একবার কি দেখতে যাবে?"[১৪০]

মধুসূদনের সঙ্গে শ্যামার প্রায় প্রতিটি কথায় দুই ধরনের অর্থ বোঝায়। প্রথমত, সে উপদেশ দেয়, দ্বিতীয়ত, শাসনের উপায় বাতলে দেয়। সর্বোপরি নিজেকে আড়াল করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

১. "মিছে রাগ করছ ঠাকুরপো, ওরা বড়োঘরের মেয়ে, পোষ মানতে সময় লাগবে।"[১৪১]
২. "ঠাকুরপো, তোমার কথা শুনে হাসি পায়। তা দোষ হয়েছে কী, আমাদের কালে কথায় কথায় মানিনীর মান ভাঙাতে হত, এখন না-হয় মুর্ছো ভাঙাতে হবে।"[১৪২]

যোগাযোগ উপন্যাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিরামচিহ্নের ব্যবহার হয়েছে। বাংলা উপন্যাসে বিরাম চিহ্নের এমন ব্যবহার বিরল। এর ফলে উপন্যাসটির গড়ন যেমন ব্যতিক্রম ধাঁচের হয়েছে, তেমনি শিল্পগুণ বিচারে উপন্যাসের মান কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন হয়েছে। বিরাম চিহ্নের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায় উদ্ধরণ (" ") চিহ্নকে। এ ছাড়া উপন্যাসটি খণ্ড খণ্ড সংলাপ ধাঁচের হওয়ায় সেখানে কমা (,) এবং বিস্ময়বোধক চিহ্নের ব্যবহার হয়েছে। বিশেষ লক্ষ্যণীয় দিক হলো একই সঙ্গে পর পর দুটি সম্বোধনবাচক পদ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম সম্বোধনের পর কমা এবং দ্বিতীয় সম্বোধনের পর সম্বোধন সূচক (!) বিরাম চিহ্নের ব্যবহার হয়েছে। সচরাচর সম্বোধনবাচক পদের পূর্বে উদ্ধরণ চিহ্নের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার হয় না। কারণ সম্বোধনবাচক পদ একটি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র অব্যয় পদ। কিন্তু উপন্যাসে সেটা ব্যবহার হতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ:

১. "আমার এত সোহাগে কাজ নেই।"[১৪৩]

২. শ্যামা বললে, "মহারাজকে বলো আমার অসুখ করেছে।"[১৪৪]

৩. "ওমা, কী আপদ! তোমার ছবি আমি কোথায় পাব যে বের করে আনব?"[১৪৫]

শ্রীহরি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)-এর *গণদেবতা (১৯৪২)* একটি বিশেষ ধরনের উপন্যাস। *গণদেবতা* মানে কোনো রথী-মহারথীর কাহিনি সেখানে নেই। আছে, সাধারণ মানুষ পরিবর্তনের ইতস্ততা, বিচলিত মনোভাব। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটিতে সেই পরিবর্তমান সমাজের ছবি এঁকেছেন। গ্রামবাংলার এই রূপ *গণদেবতা*'র আগে আর কোনো উপন্যাসে সম্ভবত দেখা যায় নি। উপন্যাসটিতে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার প্রথা ও সাধারণ মানুষের ভেতরে জেগে ওঠা ধনবান থেকে ধনতান্ত্রিক প্রথায় পরিণত হওয়াকে মূল করে দেখানো হয়েছে। সেই সঙ্গে তৎকালীন সমাজের নানাবিধ ব্যবস্থা, তাদের জীবনযাত্রাও অত্যন্ত চমৎকারিত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। আরো উল্লেখযোগ্যভাবে দেখানো হয়েছে নব্য জাগরিত হওয়া কংগ্রেসকে। ঔপন্যাসিক নিজেও যেহেতু গান্ধীবাদী ছিলেন, তাই তাঁর উপন্যাসেও সেটার একটা স্পষ্ট ছাপ লক্ষ করা যায়। ফলে, উপন্যাসের অন্যতম একটি চরিত্র হিসেবে শ্রীহরি পরিগণিত হয়েছে। লেখক তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এ কারণে শ্রীহরিকে একদিক দিয়ে বিবেচনা করা যায় না। চরিত্রটি বিচার করতে হলে তার প্রতিটি আচরণিক বৈশিষ্ট্যকে বিচার করার প্রয়োজন পড়ে। প্রথমত, বোঝা যায় লেখক ধনতন্ত্রকে ইতিবাচক হিসেবে দেখেন নি কিংবা দেখাতে চান নি। সেখানে উপন্যাস হিসেবে নয় বরং লেখকের অন্তর্দৃষ্টিই মূলত ভেসে উঠেছে। কালীপুরের সম্ভ্রান্ত শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে দ্বারকা চৌধুরী ছিলেন পৈতৃকভাবে সম্পদশালী। অপর দিকে, ছিরু পাল হয়েছে সামান্য চাষী থেকে মহাজন, পরে জমিদারের গোমস্তা, শেষে জমিদার। এক দিকে দ্বারকা চৌধুরীর পতন, বিপরীতে ছিরু পালে উত্থান। তাই তো, ছিরু পাল হয়েছে শ্রীহরি ঘোষ। শুরুতে সে গরীব একরোখা জেদি কৃষক, পরিশেষে সে জমিদার, ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। প্রথমে উলঙ্গ কৃষক, পরে দস্তুর মতো ভদ্র পোষাকের জমিদার। প্রথমে ভাঙার জন্য অস্থিরতা, পরে গড়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত। প্রথমে প্রকাশ্য মদ্যপ, পরে গোপনে। সর্বোপরি বলা যায়, প্রকৃতির সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল একটি আধুনিক চরিত্র শ্রীহরি ঘোষ। যা সামন্ততান্ত্রিকতা ভেঙে ধনতান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত হবার স্পষ্ট লক্ষণ। এ কারণেই 'শ্রীহরি' চরিত্রে এত বৈচিত্র্য।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যের বেশিরভাগ উপন্যাসে সৌন্দর্যচর্চা একটি প্রথা হিসেবে পরিণত হয়েছে। *গণদেবতা* উপন্যাসেও স্বল্পপরিসরে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহরি চরিত্রের মুখে পদ্ম-এর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন যথাযথ ও সালঙ্কারিক। বর্ণনা নাতিদীর্ঘ হলেও অসাধারণ সৌন্দর্যচেতনা সেখানে উন্মুক্ত হয়েছে। পদ্ম-এর সৌন্দর্যে উদ্বেলিত ও মুহুর্মুহু শিহরিত হয়েছে ছিরু পাল। মৃত্যুর মুখেও যে মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারে, সৌন্দর্য কল্পনা করতে পারে তা ছিরুকে না দেখলে বোঝা যায় না। একটু তাড়াহুড়ো করলে, একটু বেশি উত্তেজিত হলে তার প্রাণ যেতে পারতো, তার ব্যবস্থা দেখেও সে পুলকিত হয়েছে পদ্মকে দেখে। কেননা, পদ্মের হাতে ছিল তখন শাণিত তীব্র ধারালো একটা দা। সে যদি না ভেবে পদ্মের ঘরে ঢুকতো, তাহলে আর রক্ষা হতো বলেই মনে হয়। বিশেষত, পদ্মের যে সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেছে তাকে নির্ঘাত বলির যুপকাষ্ঠে ঢুকতে হতো।

১. ছিরু ভাবিতেছিল, লাফ দিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে কি না? কিন্তু দিবালোককে তাহার বড় ভয়, সে স্পন্দিতবক্ষে দ্বিধা করিতেছিল।[১৪৬]
২. শ্রীহরির উগ্র চোখ দুইটি সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্বলিয়া উঠিল। ওই উজ্জ্বল শ্যামাবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী বধূটির প্রতি তাহার অন্তরের নগদ কামনায় একটি প্রগাঢ় আসক্তি আছে। তাহার মনে পড়ে, ডোবার ঘাটে দণ্ডায়মান পদ্মের অবগুণ্ঠিত মুখ;- বড় বড় চোখ, ছোট কপাল ঘিরিয়া ঘন কালো একরাশি চুল, ঈষৎ বাঁকা নাক, গালের পাশে বড় একটি তিল, তাহার হাতে শাণিত দা, নিষ্ঠুর কৌতুকের মৃদু হাসিতে বিকশিত ছোট ছোট সুন্দর দাঁতের সারিটি পর্যন্ত তার মনোমধ্যে ঝলমল করিয়া ওঠে। [১৪৭]
৩. পুরুষ নারীকে একান্তভাবে একক ও নিতান্তভাবে নিজস্ব করিয়া পাইতে চায়, এক জনশূন্য লোকে- সে তাহাকে চায় চোরের সম্পদের মত, অন্ধকার গুহার নিস্তব্ধতম আবেষ্টনীর মধ্যে সর্পের সর্পিণীর মত- শতপাকের নাগপাশের বন্ধনের মধ্যে![১৪৮]

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিরু পালকে নেতিবাচক হিসেবে সচেতনভাবেই সৃষ্টি করেছেন বলে, সেখানে ছিরু পালকে সৌন্দর্যপিপাসু করে সৃষ্টি করলেও তার ভেতর আদিরস মিশ্রিত করেছেন। উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের ভেতরও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সৌন্দর্যচিন্তা, প্রেম ও কাম বিষয়গুলো দেখা যায়। কিন্তু তাদেরকে কখনোও কামাগ্নিতে জ্বলতে দেখা যায় না। ছিরু পালের ক্ষেত্রে তা দেখা যায়। শুধু দুর্গা নয়, আরো অনেকের কাছে যাবার ঘটনা পাওয়া যায়। এমন কি তাকে পদ্ম-র প্রতিও কামাসক্ত হতে দেখা যায়।

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *গণদেবতা* উপন্যাসে শ্রীহরি পালকে নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় দিক থেকেই বিবেচনা করেছেন। তৎকালীন সমাজের সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক জীবনকে আঁকতে যেয়ে ক্রমান্বয়ে এক দিকে দ্বারকা চৌধুরী অপর দিকে ছিরু পালকে নিয়ে এসেছেন। ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি ছিরু পাল। তাকে নানা চড়াই-উৎড়াই পার করে ছিরু পাল থেকে শ্রীহরি ঘোষ হতে হয়েছে। দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় তাকে কখনো হতে হয়েছে দেবতা, কখনো খড়গ হাতে অসুর। খড়গ হাতে অসুরনৃত্যে ভেঙে গেছে অনেকগুলো পরিবার তথা একটা পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা, আবার

Dhaka University Institutional Repository

তাকেই হতে হয়েছে তাদের মুক্তির দূতরূপী দেবতা। সাধারণ সামাজিক জনগণের সুবিধাপ্রবণ মনোভাবও সেই সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে, যদিও তারা নিরুপায় শ্রেণির প্রতিবাদহীন যথার্থ উত্তরসূরী। দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক-

১. গ্রামের পাঁচজনকে লইয়া উঠিবার-বসিবার সুবিধার জন্যই শ্রীহরি পৃথক পাঠশালা-ঘরের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। জমিদার তরফ হইতে জায়গার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে সে-ই। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর সে, সে-ই দেওয়ালের খরচ মঞ্জুর করাইয়াছে; নিজে দিয়াছে নগদ পঁচিশ টাকা। তা ছাড়া চালের কাঠ, খড়, দরজা-জানালার কাঠও যে দিয়াছে শ্রীহরি।[১৪৯]
২. হ্যাঁ। একটা কুয়োও হচ্ছে-ওই ষষ্ঠীতলায়। ঘোষ মশায়, মানে, আমাদের শ্রীহরি ঘোষ গ্রামের উপকারের জন্য এইসব করে দিচ্ছেন।[১৫০]

মজিদ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) বাংলা সাহিত্যে মৌলিক চেতনা প্রবাহের সার্থক স্রষ্টা। মাত্র তিনটি উপন্যাসের জনক তিনি। তার মধ্যে অন্যতম হলো *লালসালু* (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)। উপন্যাসটি ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হওয়ার ফলে বিদেশী পাঠকদের কাছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বেশ পরিচিত হয়ে ওঠেন। *লালসালু* উপন্যাসে ধর্মকে ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষণের সহায়ক, চরিত্র-চিত্রণ এবং তাদের মুখে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটির কাহিনি, চরিত্র, ভাষা, চরিত্র-চিত্রণ, উৎকর্ষ ও বুদ্ধিদীপ্ত পরিণতি দান ঔপন্যাসিকে সুস্থ সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ চিন্তারই পরিচয় বহন করেছে। 'বাংলা কথাসাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতি এবং অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রয়োগ করে যে ক'জন[১৫১] সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মার্শেল প্রুস্ত (১৮৭১-১৯২২), জেমস্ জয়েস (১৮৮২-১৯৪২), ভার্জিনিয়া উলফ্ (১৮৮২-১৯৪১), জাঁ-পল সাত্রে (১৯০৫-১৯৮০) প্রমুখের রচনা থেকে মূলত তিনি চেতনাপ্রবাহের রীতির ধারনা গ্রহণ করেছেন বলে ধারনা করা হয়। কেননা, কথাসাহিত্যে চেতনাপ্রবাহের সমগ্র ধারনা ইউরোপীয়।

ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *লালসালু* উপন্যাসের চরিত্রগুলোর সংলাপে ময়মনসিংহ অঞ্চলের মানুষের ভাষা ব্যবহার করেছেন। পূর্ববঙ্গের এই অঞ্চলের ভাষায় সহযোগী চরিত্রগুলোও তাদের বক্তব্য প্রদান করেছে। আর ঔপন্যাসিক বর্ণনা-বিশ্লেষণে মান্যচলিত[১৫২] ভাষা ব্যবহার করেছেন। মান্যচলিত এবং চরিত্রের আঞ্চলিক ভাষা মিলে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে জীবন্ত। কাহিনির সঙ্গে ভাষার সমন্বয় সাধনে ঔপন্যাসিক তার দক্ষতার নির্মল তুলির স্পর্শ বুলিয়েছেন। তার এই ধরনের ভাষা ও সংলাপ প্রয়োগের দক্ষতা বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেছে। '*লালসালু* উপন্যাসে মজিদের ভাষাকে বৃত্তিক ভাষা'[১৫৩] এবং 'মোল্লাবুলি'[১৫৪] হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সমাজে নানা

Dhaka University Institutional Repository

পেশার নানা বৃত্তির মানুষ বাস করে। তাদের বৃত্তির ওপর ভিত্তি করে তাদের ভাষারও একটি নির্দিষ্ট বলয় গড়ে ওঠে। মজিদ সেই বলয়েরই এক জন স্বতন্ত্র মানুষ। উপন্যাসের চরিত্রগুলো এক অঞ্চলের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তারা পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেছে স্ব স্ব বোধ ও সামাজিক অবস্থানের দিকে খেয়াল রেখে। ভাবপ্রকাশের ভিন্নতার কারণে বক্তা ও শ্রোতার সামাজিক অবস্থান, পেশা ও বিশেষ আদর্শের প্রতি আনুগত্যবোধ, ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধ, নানা সংস্কারের প্রতি নিঃশর্ত অনুসরণ, প্রভাব কিংবা অবজ্ঞা প্রকাশ, সাংস্কৃতিক অনুশীলন, শিক্ষা প্রভৃতি তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। মজিদ ও খালেক ব্যাপারীর মধ্যে সে পার্থক্য সুস্পষ্ট লক্ষ করা যায়। Gladson- এর মতে, ভাষা প্রকাশের এই ভিন্নতাকে `Code-Swutcgubg' in which a single speaker uses different varieties at different time[১৫৫] বুঝিয়েছেন। তবে ভাষা ও দর্শনের আলোচনায় সেটা ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করার অবকাশ থেকে যায়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব *লালসালু* উপন্যাসের চরিত্রের সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ। ইতঃপূর্বে প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৭৪) তার *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) উপন্যাসে এবং দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩১-১৮৭৩) তাঁর *নীল দর্পণ* (১৮৬০) নাটকে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন। নাটকটি জনপ্রিয়তার পেছনে ভাষা ব্যবহারের কৃতিত্ব ছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৭১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) প্রমুখ কথাসাহিত্যিক তাঁদের রচনায় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে সাফল্যলাভ করেন। শুরুতে ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা শেখানোর জন্য উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) তাঁর *কথোপকথন* (১৮০২) গ্রন্থে কলকাতার শহরতলী ও যশোর অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষাকে ব্যবহার করেন। অনেকেই তাদের সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে সফলতা লাভ করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র ভাষা সম্পর্কে শহিদ মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) বলেছেন, 'কখনও কোনো বিশিষ্ট পদের অকৃত্রিম আঞ্চলিকতা অটুট রেখেও সমগ্র বাক্যটি গঠন করেন পরিমার্জিত সাহিত্যিক গদ্যরীতির আদলে। আবার কখনও আদ্যপ্রান্ত সঞ্চারিত করেন যা সন্দেহাতীতরূপে পূর্ববঙ্গীয়।'[১৫৬] কবি হাসান হাফিজুর রহমান *মাহেনও* পত্রিকার ১৩৭২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় ওয়ালীউল্লাহ্-র গদ্যের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, প্রকরণে ও বিশ্লেষণে আধুনিক, কিন্তু বিষয় উপস্থাপনে অত্যন্ত গ্রামীণ ও প্রাচীন উপকরণে নির্ভরশীল হয়েছে। ... এর দরুণ এক্ষেত্রে তাঁর শিল্পীমন ও পরিণত বক্তব্য উদবেদনা যথার্থ উপজীব্য সমন্বিত হতে পারে নি বলেই মনে হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র গদ্যের ভাষাকে আরো অনেকেই ইতিবাচকভাবে নেন নি। আব্দুল হক, আবুল হোসেন, দিলীপ মালাকার প্রমুখ অন্যতম। আবুল হোসেন মন্তব্য করেছেন, 'অনেকদিন বিদেশে থেকে বাংলা বই

Dhaka University Institutional Repository

পত্তর পড়তে না পেরে নিয়মিত লেখার সুযোগ হারিয়ে বাংলার কান যেন ওয়ালীউল্লাহ্-র ঠিক ছিল না। ওঁর পরবর্তী সব লেখার মধ্যেই কি ধরা পড়ে না?'[১৫৭]

মজিদ ধর্মীয় সংস্কৃতি পুষ্ট এক জন ধর্মান্ধ ও ধর্মব্যবসায়ী। সে মাজারের খাদেম ও ইমাম। পোশাক-পরিচ্ছদ তার পেশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এমন কি দৈহিক গঠনও তার মানানসই। মাথায় টুপি। মুখে ক'গোছা দাঁড়ি। চোখ কোটরাগত। সুর মিষ্টি। কথাবার্তায় আরবি-ফারসি এবং হিন্দি-উর্দু শব্দ ব্যবহার করে। ঔপন্যাসিক তাই মজিদের মুখে আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে যুৎসই শব্দ ব্যবহার করেছেন- লোটা, মিঞা, ভুর ভুর, ভাতার, তানার, এৎবার প্রভৃতি। সংলাপেও সেটা দেখা যায়-

১. তুমি কী হলফ কইরা বলতে পারো তোমার দিলে ময়লা নাই?[১৫৮]
২. বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কী বদদোয়া দিছিলা নি?[১৫৯]
৩. একটু থেমে আস্তে বলে, ওর ঘোর এখনো কাটে নাই। আছর ছাড়লে এই রকমটা হয়।[১৬০]

লালসালু উপন্যাস বিশেষত মজিদ চরিত্রটির সংলাপের ভাষায় উপমা ও উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অন্ধকার যেন, সাপের মতো, কাদামাটি যেন, বিশ্বাসের পাথরে যেন প্রভৃতি।

১. অন্ধকার সাপের মতো চকচক করে তার চোখ। মনের অস্থিরতা কাটে না।[১৬১]
২. সাদা মসৃণ পা, রোদ-পানি বা পথের কাদামাটি যেন কখনো স্পর্শ করেনি।[১৬২]
৩. বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।[১৬৩]

গুজাবুড়ি

'গুজাবুড়ি' শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১) সৃষ্ট এক অনুপম নেতিবাচক চরিত্র। সমুদ্র উপকূলবর্তী দারিদ্র্য পীড়িত জনজীবনের নিখাঁদ গাঁথুনি সম্বলিত চিত্রের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ভাস্বর *সারেং বৌ* উপন্যাসটি। উপন্যাসটিতে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সেই শাশ্বত রূপের প্রতিনিধিত্ব করেছে এক সাগর অপরজন গুজাবুড়ি। গুজাবুড়ি, যার প্রাত্যহিক কর্মের বেতর দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে উপন্যাসে বর্ণিত তৎকালীন সমস্যাসঙ্কুল জীবন যাত্রার এক বৃহৎ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক।

'গুজাবুড়ি' চরিত্রটিকে ঔপন্যাসিক অভিনব কায়দায়, নিজস্বভঙ্গিতে শৈল্পিক চিন্তা-ধারায় পরিপাটি করে সাজিয়েছেন। বিভিন্ন গুণাবলির মধ্যে কূটকৌশল চালনায় সুদক্ষরূপে গড়ে প্রকাশ করেছেন। কখনো কৌশলী, কখনো উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন, কখনো দূরদর্শী, কখনো স্বাগোক্তিক আচরণ বৈশিষ্ট্যের

Dhaka University Institutional Repository

উন্মোচন, প্রসারণ ও পরিণতি সূচিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক শহীদুল্লাহ কায়সার গুজাবুড়ির মাধ্যমে সারেং-পাড়ার সারেং বৌদের যাপিত জীবনের সমস্যা ও সমুদ্র উপকূলবর্তী জনজীবন উপস্থাপন করেছেন। তার নেতিবাচকতার পেছনের নেয়ামকগুলোকেও এড়িয়ে যান নি, গুজাবুড়ির চারিত্র্য কাঠামো লক্ষ করলে প্রথমেই তাকে প্রলুব্ধকারী হিসেবে দেখা যায়। সে উপন্যাসের কেন্দ্রিয় ও নায়িকা চরিত্র নবিতুনকে বলেছে-

আর কতকাল নবিতুন। এবার একটা সাংগা টাংগা কর।[১৬৪]

স্বামী কদম সারেং কয়েক বছর ধরে নিখোঁজ। তার কাছে সারেং অনিশ্চয়তা, ভয়, সংশয় ও সর্বোপরি আত্মবিশ্বাসের মিশেলে সমুদ্রের কোনো এক জাহাজে অবস্থানরত। সেই সুযোগে গ্রামের কুটমতলববাজ মোড়লের অনৈতিক প্রস্তাবে রাজী করাতে গুজাবুড়িকে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে নবিতুনের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। একারণে গুজাবুড়ি নবিতুনের চোখে হয়ে পড়েছে 'খল'। তার ভাষায়- ধীরতা ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে আত্মবিশ্বাস গুজাবুড়ির কূটকৌশলের মূল সম্বল। যাকে পুঁজি করে লুন্দর শেখের ইচ্ছে পূরণে সে সহকারিতা করে থাকে। ইতঃপূর্বে করেছে, নবিতুনের ক্ষেত্রেও তা দিয়ে নবিতুনকে অধর্মের প্রতি টানতে চেষ্টা করে গেছে। গিরমার ধীরতা, একনিষ্ঠতা ও আত্মবিশ্বাস ত্রিস্বি শক্তিমত্তার পরিচায়ক তার স্বগতোক্তি-

১. সগীর মা মনে মনে হাসে। প্রথম প্রথম এমনিই হয়। শরম করে। তেজ দেখায় রাগ দেখায়। রাগের চোটে হাঁড়ি ভাঙ্গে, গালি ছোড়ে। তারপর আস্তে আস্তে নরম হয়। টোপ গেলে। একদিন সুড়সুড় করে বেড়িয়ে আসে সগির মার পেছন পেছন।[১৬৫]

২. গুজাবুড়ি জানে কত সবুর করতে হয় এসব কামে, সবুরে মেওয়া ফলে।[১৬৬]

যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছাতে, সেটা যদি কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়, তাহলে তার মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সার্বিক মনোভাব বুঝে নিতে হয়। প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিকে ছোট-বড় কোনো সমস্যার সাহায্য-সহযোগিতা করে তার চিত্তকে বশে আনার প্রয়োজন পড়ে। গুজাবুড়ি শিক্ষিত না হলেও বয়স সাপেক্ষে অভিজ্ঞতার ভারে পারিবারিক ও সামাজিক প্রকৃতি থেকেই অনেক কূট-কৌশল আয়ত্তে আনতে পেরেছিল। তারই ধারাবাহিকতায় কখনো সে হয়েছে বাঙ্ময়ী, কখনো পরদুঃখকাতরা নারীর ভূমিকায় অভিনয়কারিণী। উদাহরণঃ

নবিতুনের দুঃখে ছলছল ওর চোখ![১৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

'গুজাবুড়ি' চরিত্রের ভেতর দিয়ে ঔপন্যাসিক তৎকালীন সমাজের কুসংস্কারের অবয়ব এঁকেছেন নৈপুণ্য সহযোগে, সারেং বৌ উপন্যাসের প্রেক্ষিত যে সময়ের সমাজ, সেখানে অনেক কুসংস্কারের পাশাপাশি স্বামীহীন নারীকে স্বামীর অকাল প্রয়াণের জন্য দায়ী করা হত। সন্তানদের মৃত্যু হলেও অনুরূপভাবে তাকেই দায়ী করা হত। তার প্রমাণ মেলে গুজাবুড়ি চরিত্রের ভেতর দিয়ে। কারণ সে স্বামী ও সন্তানহীনা নারী। তাই তাকে বলা হয়েছে-

.....বের হ তুই। মেয়ে খাগী, ছেলে খাগী, খসম খাগী।'[১৬৮]

'খসম' অর্থ স্বামী। 'খাগী' অর্থ যে খেয়েছে। সুতরাং 'মেয়ে খাগী,' 'ছেলে খাগি' ও 'খসম খাগি' অর্থ হল যে ছেলে, মেয়ে ও স্বামীকে খেয়ে ফেলেছে বা যার কারণে মেয়ে, ছেলে ও স্বামী মারা গেছে। গুজাবুড়ির চরিত্রের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর দিক হিসেবে ঔপন্যাসিক যেটা দেখিয়েছেন, সেটা বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তা। পৃথিবীতে বড় বড়, মহতী অথবা কদর্যপূর্ণ কাজগুলো হয়ে থাকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে। গুজাবুড়ি যতগুলো নেতিবাচক কাজ লুন্দর শেখের প্ররোচনায়, পৃষ্ঠপোষকতায় করেছে তার গোপনীয়তা রক্ষায় সেসর্বদা সচেতন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। নবিতুনকে নানাভঙ্গিতে প্রভাবিত করতে গিয়েও তার ব্যত্যয় ঘটে নি।

...অনেক অপবাদ তার। কিন্তু হাটে কখনও হাড়ি ভাঙ্গেনি, কারও মান ভাঙ্গেনি গুজাবুড়ি।[১৬৯]

গুজাবুড়ির ভাষা ব্যবহার ও সংলাপে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় ঔপন্যাসিক শহীদুল্লা কায়সার *সারেং বৌ* উপন্যাসে সাধারণ চলিত ভাষার ব্যবহার করেছেন। লেখকের নিজস্ব বিবৃতি এবং চরিত্রের ভাষা ও সংলাপ সব ক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। পুরো উপন্যাস জুড়ে অজস্র আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা গুজাবুড়ির ভাষায় অধিক ব্যবহৃত। শব্দের এরূপ ব্যবহার অনেক সাহিত্যিক হয়তো করেছেন কিন্তু তাঁর বিশেষত্ব হল; তিনি আঞ্চলিক শব্দগুলোকে উদ্ধরণ চিহ্নের ভেতরে রেখে সেগুলোকে ব্যবহার করেছেন। যেমন: 'বিরথাই',[১৭০] কিন্তক',[১৭১] 'মিডা',[১৭২] 'বালা',[১৭৩] 'কেরাসি',[১৭৪] 'বাংলা,'[১৭৫] প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ব্যবহারও বেশ লক্ষ করবার মত বিষয়। অনেক সংলাপে ক্রিয়াপদকে বাক্যের শেষে না রেখে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পূর্বে ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ:

১. ভেবে দেখরে নবিতুন .....।[১৭৬]

২. কত দেখল সগীর মা।[১৭৭]

৩. শুনলাম দুপুরে নাকি পাক চড়েনি তোর।[১৭৮]

৪. শঙ্কামুক্ত হয়ে মনে মনে হাসে গুজাবুড়ি।[১৭৯]

৫. পান্থা আছে রে নবিতুন, পান্থা?[১৮০]

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত পাঁচটি বাক্যেই যথাক্রমে তোর, নবিতুন, সগীর মা, গুজাবুড়ি ও নবিতুন পদগুলোর পূর্বে 'চেড়েনি'; 'দেখবে'; 'দেখল; 'হাসে' ও 'আছে রে' ক্রিয়াপদসমূহকে বসানো হয়েছে। কেবল 'তোর' শব্দটি সর্বনাম আর বাকি চারটি বিশেষ্যপদ। শব্দের এরূপ ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে তেমন লক্ষ করা যায় না। ক্রিয়া পদের এই বিশেষ ব্যবহারে শহীদুল্লা কায়সারের অবদান ও ব্যবধান অগ্রগণ্য।

গুজাবুড়ির কথোপকথনে, স্বগোক্তিতে এবং তার সম্পর্কে লেখক ও অন্যান্য চরিত্রের বিবৃতিতে বেশকিছু অলঙ্কারের ব্যবহার ঘটেছে।

জোয়ানকির সুরুজ এবার ডুবে গেলে আবার কি উঠবেরে?[১৮১]

'জোয়ানকির সুরুজ' অর্থাৎ সূর্যের সঙ্গে যৌবন ধর্মের তুলনা করা হয়েছে। (বস্তুত শারীরিক লাবণ্যকে বোঝাচ্ছে) কিন্তু কার যৌবন সেটা প্রচ্ছন্ন আছে অর্থাৎ নবিতুন এখানে অপ্রকটিত। এই অলঙ্কারকে অতিশয়োক্তি বলা হচ্ছে।

.... গুজাবুড়ির ওই শকুনী মুখ দেখলে আর ওই শয়তানী কথা শুনলে না মেজাজ থাকে ঠিক, না মন লাগে কামে।[১৮২]

বাক্যটির অলঙ্কার হল অনুপ্রাস। বাক্যটিতে 'ওই শব্দটি দুইবার এসেছে। পর পর এভাবে কোনো শব্দ, শব্দাংশ কিংবা বর্ণ দুইবার এলে তাকে বলা হয় ছেকানুপ্রাস। আবার, 'শ' বর্ণটি দুইয়ের অধিক; তিন বার এসেছে। তাই এটাকে বলা হয় বৃত্তানুপ্রাস অর্থাৎ যা বার বার ঘুরে ফিরে আসে সেটাই বৃত্তানুপ্রাস।

১. গুজাবুড়ি, তুই কুটনী, তুই শয়তান, দূর হ তুই।[১৮৩]
২. কত দেখল সগির মা। কুলকন্যার কুল দেখল, তেজ দেখল, মান দেখল, সতি বৌর সতীত্ব দেখল।[১৮৪]

'তুই' শব্দটি পর পর তিন বার এসেছে। সে কারণে বাক্যটির অলঙ্কার হবে বৃত্তানুপ্রাস। বাক্যটির গঠন দুর্বলতা লক্ষণীয়। পুরো উদ্ধৃতি মিলে একটা সার্থক বাক্য হতে পারত। বার বার দাঁড়ি চিহ্ন ব্যবহার করে ছোট ছোট বাক্যে বিভক্ত করা ঠিক হয়েছে বলে মনে হয় না। পুরো উদ্ধৃতিটিকে যদি একটা বাক্য হিসেবে চিহ্নিত করি তাহলে দেখা যাবে সেখানে 'দেখল' শব্দ রয়েছে পাঁচবার। সুতরাং বাক্যটির অলঙ্কার হবে বৃত্তানুপ্রাস। আবার বাক্যটিতে দুইবার 'কু' শব্দাংশ এবং 'স' বর্ণ রয়েছে; যা ছেকানুপ্রাসের লক্ষণ। সুতরাং বলা যায় বাক্যটিতে ছেকানুপ্রাস ও বৃত্তানুপ্রাসের সম্মিলন ঘটেছে।

গুজাবুড়ির গলাটা যেন এই ভর সন্ধ্যায় অলক্ষ্মী প্যাঁচার ডাক।[১৮৫]

Dhaka University Institutional Repository

বাক্যটিতে উৎপ্রেক্ষা অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে। 'গুজাবুড়ির গলা'কে তুলনা করা হয়েছে অলক্ষ্মী প্যাঁচার ডাক'-এর সঙ্গে। দুটো বিষয়ের ভেতর পার্থক্য নিয়ে সন্দেহ দেখা যায়। কোনটা উপমান, কোন্‌টা উপমেয় এটা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে এবং উভয়ের ভেতর নিকট সাদৃশ্য 'যেন' শব্দ দ্বারা সংযুক্ত আছে। ফলে বাক্যটির অলঙ্কার নিঃসন্দেহে উৎপ্রেক্ষা।

অনেক তেজীর তেজ নিবিয়েছে, অনেক দেমাকির দেমাক কিনেছে গুজাবুড়ি।[১৮৬]

বাক্যটিতে 'ত' ও 'জ' বর্ণদ্বয় পরপর 'তেজীর' ও 'তেজ' শব্দদ্বয়ে এসেছে। আবার, 'দেমাকির' ও 'দেমাক' শব্দদ্বয়ে 'দ'; 'ম' এবং 'ক' বর্ণদ্বয় পরপর এসেছে। যেহেতু প্রত্যেক বর্ণ দুইবারের অধিক আসে নি সুতরাং বাক্যটির অলঙ্কার অবশ্যই ছেকানুপ্রাস।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থনির্দেশনা

১. আনিসুজ্জামান (সম্পাদক), *আলালের ঘরের দুলাল* (ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৯), পৃ. ৩৩

২. আনিসুজ্জামান (সম্পাদক), তদেব, পৃ. ৮৬

৩. তদেব, পৃ. ৪৬

৪. তদেব, পৃ. ৭৫

৫. তদেব, পৃ. ১০৮

৬. তদেব, পৃ. ৮৭

৭. তদেব, পৃ. ৪৯

৮. তদেব, পৃ. ১০১

৯. সফিউদ্দিন আহমদ (সম্পাদক), *বঙ্কিম রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড* (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০০৮), পৃ. ১১৮।

১০. সফিউদ্দিন আহমদ (সম্পাদক), *বঙ্কিম রচনাসমগ্র, বিষবৃক্ষ*, তদেব, পৃ. ১১৯।

১১. সফিউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ১২৫।

১২. তদেব, পৃ. ১০১।

১৩. তদেব, পৃ. ১১৮।

১৪. তদেব।

১৫. তদেব, পৃ. ১২৪।

১৬. তদেব, পৃ. ১২৩।

১৭. তদেব, পৃ. ১২৬।

১৮. তদেব, পৃ. ১৪০।

১৯. তদেব, পৃ. ১২৪।

২০. তদেব, পৃ. ১২৫।

২১. তদেব।

২২. তদেব, পৃ. ১৩১।

২৩. তদেব, পৃ. ১৪০।

২৪. তপংকর চক্রবর্তী (সম্পাদক), *শরৎরচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ প্রকাশন, ২০০৬), পৃ. ৩৯৫।

২৫. সফিউদ্দিন আহমদ (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

২৬. তদেব, পৃ. ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

২৭. তদেব, পৃ. ১২৪।

২৮. তদেব, পৃ. ১৬০।

২৯. ক্ষেত্র গুপ্ত, *বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: শিল্পরীতি* (কলিকাতা: গ্রন্থনিলয় প্রকাশন, ১৯৭৪), পৃ. ৮১।

৩০. সফিউদ্দিন আহমদ (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩।

৩১. তদেব।

৩২. তদেব।

৩৩. তদেব, পৃ. ১২৩।

৩৪. তদেব, পৃ. ১৫৬।

৩৫. তদেব, পৃ. ১৫৯।

৩৬. তদেব, পৃ. ১৬০।

৩৭. তদেব, পৃ. ১১৮।

৩৮. তদেব, পৃ. ১৩০।

৩৯. তদেব' পৃ. ১৫৯।

৪০. আবদুল নঈম, *বাঙলা অলঙ্কার* (যশোর: পূর্বা প্রকাশনা, ১৯৯৭), পৃ. ১৮৫।

৪১. আবদুল নঈম, তদেব, পৃ. ১৩৫।

৪২. পূর্বোক্ত, শফিউদ্দিন আহমদ (সম্পাদক), তদেব পৃ. ১৫৯।

৪৩. তদেব, পৃ.১৫৭।

৪৪. তদেব, পৃ. ১৬০।

৪৫. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *স্বর্ণলতা* (ঢাকা: প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ১৩৬৭), পৃ. ৮।

৪৬. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তদেব।

৪৭. তদেব, পৃ. ২২।

৪৮. তদেব, পৃ. ৩৮।

৪৯. তদেব, পৃ. ১২৬।

৫০. তদেব, পৃ. ১২৫।

৫১. তদেব, পৃ. ৮।

৫২. তদেব, পৃ. ৪৭।

৫৩. তদেব, পৃ. ১০।

৫৪. তদেব, পৃ. ১২৪।

৫৫. তদেব, পৃ. ১১।

৫৬. তদেব, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. সফিউদ্দিন আহমদ (সম্পাদক), *বঙ্কিম রচনাসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭১।

৫৮. তদেব, পৃ. ৫১০।

৫৯. তদেব, পৃ. ৪৭৭।

৬০. তদেব।

৬১. তদেব, পৃ. ৪৭৩।

৬২. তদেব, পৃ. ৪৭১।

৬৩. তদেব, পৃ. ৪৭৭।

৬৪. তদেব, পৃ. ৪৭৫।

৬৫. তদেব, পৃ. ৪৭৭।

৬৬. তদেব, পৃ. ৫১২।

৬৭. তদেব, পৃ. ৫০৫।

৬৮. তদেব।

৬৯. তদেব, পৃ. ৫২৩।

৭০. বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক) *বিষাদ-সিন্ধু* (ঢাকা: অবসর প্রকাশ, ২০০৬), পৃ. ৪৪।

৭১. তদেব, পৃ. ৬৫।

৭২. তদেব, পৃ. ২২।

৭৩. তদেব, পৃ. ৪৪।

৭৪. তদেব।

৭৫. তদেব, পৃ. ৪৩।

৭৬. তদেব, পৃ. ৪৪।

৭৭. তদেব, পৃ. ৬৯।

৭৮. তদেব, পৃ. ৪০।

৭৯. তদেব, পৃ. ৪৩।

৮০. তদেব।

৮১. তদেব, পৃ. ৪৪।

৮২. তদেব, পৃ. ২১।

৮৩. তদেব, পৃ. ৪৬।

৮৪. হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদক), *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদক), *মশাররফ রচনাসম্ভার, দ্বিতীয় খণ্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. ২৯ (ভূমিকা)।

৮৬. কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদক), *মশাররফ রচনাসম্ভার, পঞ্চম খণ্ড* (তদেব), প. ৬-৯ (আমার জীবনী)।

৮৭. আনিসুজ্জামান (সম্পাদক), *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ৪০ (বিষাদ-সিন্ধুর পুনর্বিচার)।

৮৮. হাসান আজিজুল হক (সম্পাদক), *বিষাদ-সিন্ধু* (ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১১), পৃ. ৭৬।

৮৯. হাসান আজিজুল হক (সম্পাদক), পৃ. ২২৪।

৯০. তদেব, পৃ. ১৩৯।

৯১. তদেব।

৯২. তদেব, পৃ. ১৮৬।

৯৩. তদেব।

৯৪. তদেব, পৃ. ভূমিকা।

৯৫. তদেব।

৯৬. সৌমিত্র শেখর (সম্পাদক), *শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক উপন্যাস* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ৯৪।

৯৭. সৌমিত্র শেখর (সম্পাদক), তদেব, পৃ. ১৬০।

৯৮. তদেব, পৃ. ৪৪।

৯৯. তদেব, পৃ. ১৩৪।

১০০. তদেব, পৃ. ৭৩।

১০১. তদেব, পৃ. ১২২।

১০২. তদেব, প. ১৯১।

১০৩. তদেব, পৃ. ১৯২।

১০৪. তদেব, পৃ. ১৬৪।

১০৫. তদেব, পৃ. ১১৭।

১০৬. মোহাম্মদ নজিবর রহমান, *আনোয়ারা* (ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০০৬), পৃ. ৮৩।

১০৭. মোহাম্মদ নজিবর রহমান, *আনোয়ারা*, তদেব, পৃ. ১৯।

১০৮. তদেব, পৃ. ৪৪।

১০৯. তদেব, পৃ. ৬৯।

১১০. তদেব, প. ৬৪।

১১১. তদেব, পৃ. ৭১।

১১২. তদেব, পৃ. ৬৭।

১১৩. তদেব, পৃ. ৬৯।

১১৪. তদেব, পৃ. ১৭।

১১৫. তদেব, পৃ. ২০।

১১৬. তদেব, পৃ. ১২৯।

১১৭. তদেব।

১১৮. তদেব, পৃ. ৬৩।

১১৯. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *চরিত্রহীন* (ঢাকা: চলাচল প্রকাশনী, ১৯৬৩), প. ২৫২।

১২০. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *চরিত্রহীন*, তদেব, পৃ. ২১৮।

১২১. তদেব, পৃ. ১৫৯।

১২২. তদেব, পৃ. ১৬০।

১২৩. তদেব, পৃ. ১৭০।

১২৪. তদেব, প. ১২৮।

১২৫. তদেব, পৃ. ১১৬।

১২৬. তদেব, পৃ. ২২৩।

১২৭. তদেব, পৃ. ২৯৪।

১২৮. তদেব, পৃ. ৩৩৮।

১২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *যোগাযোগ* (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০১০), পৃ. ৪৩।

১৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *যোগাযোগ* (তদেব), পৃ. ৪৭।

১৩১. তদেব, পৃ. ১২৩।

১৩২. তদেব, পৃ. ১২৪।

১৩৩. তদেব।

১৩৪. তদেব, পৃ. ৫৫-৫৬।

১৩৫. তদেব, পৃ. ৯২।

১৩৬. তদেব, পৃ. ১২৪।

১৩৭. তদেব, প. ৪৭।

১৩৮. তদেব, পৃ: ৭০।

১৩৯. তদেব, পৃ. ৪৩।

১৪০. তদেব, পৃ. ৪৬।

১৪১. তদেব।

Dhaka University Institutional Repository

১৪২. তদেব, প. ৪৭।

১৪৩. তদেব, পৃ. ১২৪।

১৪৪. তদেব, পৃ. ১২৫।

১৪৫. তদেব।

১৪৬. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *গণদেবতা* (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ. ৩৭।

১৪৭. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *গণদেবতা*, তদেব, পৃ. ১০৩।

১৪৮. তদেব, পৃ. ১০৬।

১৪৯. তদেব, পৃ. ২০১।

১৫০. তদেব, পৃ. ১১৮।

১৫১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *ওয়ালীউল্লাহ* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৯৬), পৃ. ২০।

১৫২. পবিত্র সরকার, *পকেট বাঙলা ব্যাকরণ* (কলকাতা: আজকাল প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ১০।

১৫৩. মনসুর মুসা, *লালসালুর ভাষারীতি* (ঢাকা: অনিন্দ প্রকাশন, ১৯৮৮), পৃ. ৬৬।

১৫৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

১৫৫. Brasil Barnstain, *Class Code Control, vi, 1* (London: Roughlage & Kaganpaul, 1971), P-29.

১৫৬. মুনীর চৌধুরী, *বাংলা গদ্যরীতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৩৮৩), পৃ. ৩৬।

১৫৭. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাদক), আবুল হোসেন, কিছুস্মৃতি: ওয়ালীউল্লাহ, (ঢাকা: সময়, ১৩৮৬), পৃ. ৮ম সংখ্যা।

১৫৮. ড. সৌমিত্র শেখর (সম্পাদক), *লালসালু* (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০০৬), প. ৩২।

১৫৯. ড. সৌমিত্র শেখর (সম্পাদক), তদেব, পৃ. ৮৫।

১৬০. তদেব, পৃ. ৯৪।

১৬১. তদেব, পৃ. ৩৭।

১৬২. তদেব, পৃ. ৫৮।

১৬৩. তদেব, পৃ. ৯৫।

১৬৪. শহীদুল্লা কায়সার, *সারেং বৌ* (ঢাকা: জোনাকী প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ১০।

১৬৫. তদেব।

১৬৬. তদেব, পৃ. ১৬।

১৬৭. তদেব, পৃ. ২৬।

১৬৮. তদেব, পৃ. ২৪।

১৬৯. তদেব, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

১৭০. তদেব, পৃঃ ২৫।

১৭১. তদেব, পৃ. ১১।

১৭২. তদেব।

১৭৩. তদেব, পৃ. ২৪।

১৭৪. তদেব।

১৭৫. তদেব।

১৭৬. তদেব, পৃ. ২৫।

১৭৭. তদেব, পৃ:১০।

১৭৮. তদেব, পৃ. ১১।

১৭৯. তদেব, পৃঃ ২৪।

১৮০. তদেব, পৃঃ ২৫।

১৮১. তদেব, পৃ. ৬৪।

১৮২. তদেব, পৃ. ১০।

১৮৩. তদেব।

১৮৪. তদেব।

১৮৫. তদেব, পৃ. ১১।

১৮৬. তদেব, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ শতকে রচিত উপন্যাসে 'খল' নর ও নারী চরিত্র

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালি সমাজ এবং মানসে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দেয়। এর কারণ ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন এবং তার মাধ্যমে পাশ্চাত্য চিন্তার সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালির পরিচয়। এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে বাস্তবতার আমেজ মিশ্রিত ছিল বলেই অনেকে একে বাঙালি জাতির নবজাগরণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাই নবজাগরণের প্রারম্ভে রচিত বাংলা সাহিত্যে যে চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা আত্মপ্রকাশিত তার অধিকাংশ পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ বিধৃত। অর্থাৎ পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত সংস্করণের ফলিত রূপ বাংলা সাহিত্য। উদাহরণ স্বরূপ: *দি মার্চেন্ট অব ভেসি* অবলম্বনে হরচন্দ্র ঘোসের *ভানুমতি চিত্তবিলাস*; *প্যারাডাইজ লস্ট* অবলম্বনে গিশিচন্দ্র বসুর *স্বর্গভ্রষ্ট কাব্য*; *দি কমেডি অব এররস* অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের *ভ্রান্তিবিলাস*; *গ্যালিভারস ট্রাভেলস* অবলম্বনে উপেন্দ্রনাথ মিত্রের *অপূর্ব দেশভ্রমণ* উল্লেখযোগ্য।

সবদেশের সবকালের সাহিত্যের পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে প্রধানত মানব সত্যকে কেন্দ্র করে। সেই সঙ্গে যুগের সামাজিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক জীবনচিত্রণ, কখনো কখনো মানবমনের নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াসও চলে অবিচলভাবে। সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন অনেক আগে হলেও বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। উপন্যাস সাহিত্যের এক পূর্ণাঙ্গ শাখা যেখানে 'খল' নর ও নারী চরিত্র তার মহামূল্যবান উপাদান (Asset) হিসেবে বিবেচ্য। 'খল' বলতে কোনো চরিত্রের কেবল দোষ-ত্রুটি বা নেতিবাচকতা-কে বোঝায় না। বরং খলতাই অনেক সামাজিক উপন্যাস যেমন-*বিষবৃক্ষ*, *বিষাদ-সিন্ধু*, *আনোয়ারা*, *সারেং বৌ* প্রভৃতি উপন্যাসের প্রাণ। 'খল' চরিত্র সাধারণত সামাজিক উপন্যাসে মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিক জটিলতার আবহ কিংবা বলয় সৃষ্টি করে। ফলে সামাজিক উপন্যাসগুলো যেমন প্রাণস্পন্দিত হয়, তেমনি গতিশীল বা প্রাণচাঞ্চল্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। খল-চরিত্রসমূহ উপন্যাসের স্বাভাবিক গতিকে কখনো উৎকর্ষের দিকে, কখনো অপকর্ষের (falling of action)-এর দিকে নিয়ে যায়। ফলে পাঠকের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়, একঘেয়েমি দূর হয়, উপন্যাসগুলো হয়ে উঠে সুপাঠ্য। তাছাড়া টানটান রহস্য ঘেরা একটা আচ্ছাদন সৃষ্টিতেও খল চরিত্রের ভূমিকা অনন্য। 'খল-চরিত্র' সচেতনতার ধারক ও বাহক হিসেবেও কাজ করে। হীরা, মায়মুনা, জয়েদা, দুর্গা কিংবা গুজাবুড়ির মতো চরিত্রসমূহ থেকে বাস্তবের কলুষতা, নির্মমতা ও জটিলতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকেই

Dhaka University Institutional Repository

আবির্ভাব খল-চরিত্রের, পক্ষান্তরে খল-নারী চরিত্রের। বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস মতান্তরে নক্শা (Sketch) *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮)। প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠকুরের (১৮১৪-১৮৮৩) এই উপন্যাসে প্রথমত 'খল' নর-নারী চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। এরপর বাংলা সাহিত্যের সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) হাতে খল-নারী চরিত্রের সার্থকতা, পূর্ণাঙ্গতা এবং যথার্থ বিকাশ লাভ ঘটতে দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে অনেক ঔপন্যাসিক তাদের উপন্যাসে খল-নারী চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাঁদের উপন্যাসর 'খল' নর ও নারী চরিত্রসমূহে গতানুগতিক বৈশিষ্ট্য উৎরিয়ে ভিন্নতার স্বাদ এনে দিয়েছেন; দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতার পরিচয় দিয়েছেন। যাঁরা এই প্রসারতার কাজটি করেছেন। তাঁদের মধ্যে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), মোহাম্মদ নজিবুর রহমান (১৮৭৬-১৯৩৫), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম 'খল' নর ও নারী চিহ্নিত করার মানসে প্যারীচাঁদ মিত্রের সামাজিক নকশা বা উপন্যাস *আলালের ঘরের দুলাল*'কে নেওয়া হয়েছে। সে কারণে অভিসন্দর্ভের ব্যাপ্তিকাল ১৮৫৮ থেকে ধরা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'খল' নামক বৈশিষ্ট্য কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা আচরণগত রূপভেদ ঘটেছে কিনা তা জানতে এবং কোনো পরিবর্তন ঘটে থাকলে কী কী বা কোন্ কোন্ বিষয়ের পরিবর্তন ঘটেছে তা জানতে বা বিচার-বিশ্লেষণ করতে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিচরণের প্রয়া চালানো হয়েছে। ১৮৫৮ সালে রচিত *আলালের ঘরের দুলাল* উপন্যাসে আমরা 'ঠকচাচা' ও 'ঠকচাচি' নামক চরিত্র পাওয়া যায়, যাদেরকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম নেতিবাচক বা 'খল' চরিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে প্রায় প্রত্যেক ঔপন্যাসিক বিভিন্ন আঙ্গিকে তাদের উপন্যাসে এরূপ নেতিবাচক চরিত্রের অবস্থান দেখিয়েছেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *রাজমোহন্স ওয়াইফ*-এর সুখির মা, *দুর্গেশনন্দিনী*'র বিমলা, *মৃণালিনী*'র গিরিজায়া *রাজসিংহ*-এর জেব-উন্নিসা, দরিয়াবিবি; *বিষবৃক্ষ*-এর হীরা; *দেবী চৌধুরাণী*'র ফুলমণি উল্লেখযোগ্য খল-নারী চরিত্র। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের *স্বর্ণলতা* উপন্যাসে প্রমদা চরিত্র; মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসে জায়েদা ও মায়মুনা; নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের *আনোয়ারা* উপন্যাসে গোলাপজান ও দুর্গা; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চাঁপা ডাঙ্গার বৌ* উপন্যাসে টিকুরীর খুড়ি; শামসুদ্দিন আবুল কালামের *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসে টিয়াবিবি; শহীদুল্লাহ কায়সারের *সারেং বৌ* উপন্যাসে গুজাবুড়ি উল্লেখযোগ্য খল-নারী চরিত্র। অপর দিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র *লালসালু* উপন্যাসে মিজিদ, *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসে মারোয়ান ও এজিদ, *গণদেবতা* উপন্যাসে শ্রীহরি পাল উল্লেখযোগ্য 'খল' নর চরিত্র। এই সমস্ত চরিত্র প্রায় সব সমালোচকের নিকটই 'খল' বা নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু 'খলতা' একটা আপেক্ষিক বিষয়। যে কেউ যে কোনো মুহূর্তে কোনো মানুষের দৃষ্টিতে খল হয়ে উঠতে পারে। সেরকম একটা চরিত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে 'জেব-উন্নিসা'কে; যে প্রতিনিধিত্ব করেছে রোহিনী, বিনোদিনী, কিরণময়ী। তারা সবাই কোনো না সময় কারো না কারো চোখে কিছু সময়ের জন্য হলেও 'খল' ছিল।

সময়ের পরিসর কম হওয়ায় অনেক 'খল' নর-নারী চরিত্রের ভেতর থেকে উপন্যাস রচনার সময় ও চরিত্রের নানামুখী বৈশিষ্ট্যগত দিক বিবেচনা করে কেবল প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাসের কর্তৃত্বস্থানীয় চরিত্রসমূহকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

প্যারীচাঁদ মিত্রঃ *আলালের ঘরের দুলাল* : ঠকচাচা

আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে পরিচিত। টেকচাঁদ ঠাকুর তথা প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। ডিরোজিওর অগ্রগণ্য শিষ্য। ইয়ং বেঙ্গলের অপর সদস্য রাধানাথ সিকদারের সহযোগিতায় ১৮৫৪-১৮৫৮ সাল পর্যন্ত 'মাসিক পত্রিকা' নামক সাময়িকী পত্রিকায় ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৫৭ সালের জুন পর্যন্ত *আলালের ঘরের দুলাল* ২০টি অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। *আলালের ঘরের দুলাল* উপন্যাসটিকে অনেকে উপন্যাস বলতে চান নি। অনেকের মতে এটি একটি 'সামাজিক নক্সা'। তবে 'কাহিনীর ধারাবাহিকতা, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বাস্তব চিত্রাঙ্কন এবং চরিত্রচিত্রণের দক্ষতা বিবেচনা করে একে উপন্যাসই বলতে হয়। নকশার রীতি এর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই এর চরিত্রগুলি সাদা অথবা কালো রঙে চিত্রিত-সেখানে ধূসরের কোনো স্থান নেই।'[১]

আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম একটি মৌলিক উপাদান চরিত্রসৃষ্টি। ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের কাহিনি তথা ঘটনা সংস্থানের প্রয়োজনে এসব চরিত্রের অবতারণা করে থাকেন। মূলত চরিত্রের ভেতর দিয়েই কাহিনি গতি লাভ করে এবং পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। উপন্যাসে সাধারণত দুই ধরনের চরিত্র লক্ষ করা যায়-১। আবর্ত চরিত্র ২। সম্প্রসারিত চরিত্র। যে সমস্ত চরিত্র উপন্যাসের ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত ও আবর্তিত হয় কিংবা কখনো কখনো উপন্যাসের ঘটনাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই চরিত্রগুলোকে কেন্দ্রীয় বা প্রধান চরিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। অপর শ্রেণির চরিত্রগুলো বিশেষ ঘটনা সংঘটনে সহায়তা করে থাকে অথবা প্রয়োজনীয় কোনো কাজ বা লক্ষ্য সম্পন্ন করে ক্ষান্ত হয়ে থাকে। তবে *আলালের ঘরের দুলাল* উপন্যাসে দুই ধরনের চরিত্র লক্ষ করা যায়। এক. আদর্শবাদী বা নীতিনিষ্ঠ চরিত্র এবং দুই. আদর্শবিচ্যুত বা নীতিজ্ঞান বিবর্জিত চরিত্র। এই অংশে আমরা পাই

ঠকচাচা, মতিলাল, বাঞ্ছারাম, বক্রেশ্বর, হলধর ও গদাধর চরিত্রসমূহ। আমাদের গবেষণা কর্মের প্রয়োজনে আমরা কেবল 'ঠকচাচা' আলোচনার প্রয়াস পাব।

আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসের একটি অপূর্ব চরিত্র ঠকচাচা তথা মোকাজান। এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তিনি হলেন 'ঠকচাচা', যদিও তিনি এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় কিংবা নায়ক চরিত্র নন। রঙ্গমঞ্চের সুবিশাল পরিসরে তার ব্যক্তিত্ব প্রস্ফূটিত হয়েছে তার নানা রকম ফন্দি-ফিকির ও ঠকবাজীতে। প্রমথনাথ বিশী তাঁর *বাংলা সাহিত্যে নর-নারী* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন- সুনীতির মানদণ্ডে ভাঁড়ুদত্ত ও ঠকচাচা যতখানি খাটো, সবাক্যের মানদণ্ডে তাহারা ততখানি বড়।

> এক বেটা নেড়ে তাহার নাম ঠকচাচা। সে বেটা জোয়াচোরের পাদশা। তার হাড়ে ভেল্‌কি হয়।[২]

তৎকালীন মুসলিম সমাজের ধূর্ত প্রতিনিধিদের অন্যতম হলেন ঠকচাচা। লেখকের নিপুণ কারুকার্যে চরিত্রটিতে প্রাণধর্ম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

> মুই বলি এসব ফেল্‌ত বাতে দরকার কি? ত্যাল খেড়ের বাতেতে কি মোদের প্যাট ভরবে? মকদ্দমাটার বনিয়াদটা পেকড়ে সেজিয়া ফেলা যাওক।[৩]

ঠকচাচার এ ধরনের চিন্তাচেতনার পেছনে কাজ করেছে তৎকালীন সমাজ। যে সমাজে সতত মূল্যহীন ও পরাজিত সত্তায় পরিণত। সেই কারণেই ঠকচাচা মিথ্যার বেসাতিতে হয়ে উঠেছেন সম্রাট। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন শুভ ও অশুভের ধরণীতে অশুভের শক্তিই প্রবল। সুতরাং সে সমাজে ভালো থেকে কোনো লাভ নেই। ঠকচাচা প্রত্যক্ষ ও বাস্তববাদী মানুষ। তিনি নগদ তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাই তিনি বলেছেন-

> মাশার লেড়কা বুরা নহে, বরদা বাবুই নব বদের জড়-ওনাকে তফাত করিলে লেড়কা ভালো হবে-বাবু সাহেব। হেন্দুর লেড়কা হয়ে হেন্দুর মফিক পাল পার্বণ করা মোনাসেব, আর দুনিয়াদারি করিতে গেলে ভালা, বুরা দুই চাই-দুনিয়া সাচ্চা নয়-মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করবো?[৪]

ঠকচাচা কেবল তার স্ত্রী 'ঠকচাচী'র কাছে কিছুটা সংযত। কারণ মাঝে মাঝে তাকে স্ত্রীর কাছে ঝামটা খেতে হত। কারণ ঠকচাচা বুদ্ধির জোরে রোজগার করে আর ঠকচাচী টাকা রোজগার করে স্ত্রী বিদ্যার বলে। তাই সে মোড়ার উপর বসে ঠকচাচার লাভক্ষতির হিসেব করে। বলে-

Dhaka University Institutional Repository

> তুমি হর রোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও-তাতে মোর আর লেড়কাবালার কি ফয়দা? তুমি হর ঘড়ি বলো যে বহুত কাম, এতনা বাতে বি মোদের পেটের জ্বালা যায়। মোর দেল বড়ো চায় যে জরি চর পিনে দশজন ভালো ভালো রেণ্ডির বিচে ফিরি, লেকেন রোপেয়া কড়ি কিছুই দেখি না তুমি দেয়ানার মতো চুপচাপ মেরে হাবতিলে বসেই রহ।[৫]

ঠকচাচার উত্তর নিজের ফন্দি-ফিকিরের আস্ফালন, কৌতুককর, তার সঙ্গে কাহিনী কথকের কারুণ্যও জড়িত হয়ে গেছে বলে মনে হয়। তাই তিনি বলেন-

> আমি যে কোশেশ করি তা কি বলব, মোর কেত্না ফিকির–কেত্না ফন্দি-কেতনা প্যাঁচ-কেত্না শেস্ত তা জবানিতে বলা যায় না, শিকার দস্তে এল এল হয় আবার পেলিয়া যায়।[৬]

বাবুরামবাবুর ছেলে মতিলাল মদ্য পান ও মদ্যপ অবস্থায় চৌকিদারকে আঘাত করার দায়ে গ্রেফতার হলে প্রথম মোকাজান বা ঠকচাচার আবির্ভাব হয় উপন্যাসে। সেখানে বাবুরামবাবু তাকে ডেকে পাঠায়। কারণ সবার মতো বাবুরামবাবুও জানেন আদালতের বিষয়ে অভিজ্ঞ। শুধু তাই নয় আদালতের যেকোনো বিষয়ে তার জানাশোনা অনেক, তিলকে তাল করিতে তার জুড়ি নেই, যেকোনো সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য প্রমাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সে অদ্বিতীয়। তাই বাবুরামবাবু তাকে ডেকে পাঠায়। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখক নিজেই স্পষ্ট ধারনা দিয়েছেন। লেখকের ভাষায়-

> মোকাজান আদালতের কর্মে বড়ো পটু! অনেক জমিদার নীলকর প্রভৃতি সর্বদা তাহার সহিত পরামর্শ করিত। জাল করিতে-সাক্ষী সাজাইয়া দিতে-দারোগা ও আমলাদিগকে বশ করিতে- গাঁতের মাল লইয়া হজম করিতে-দাঙ্গা হাঙ্গামের জোটপাট ও নয়কে হয় করিতে, নয়কে হয় করিতে তাহার তুল্য আর একজন পাওয়া ভার।[৭]

আদালতের মামলা চালানো এবং তাতে জিতে আসার জন্য প্রয়োজন অনেক ধূর্ত ধরনের লোক। সহজ-সরলতা, নিষ্ঠাবান এবং শিক্ষিত মানুষ হলেই যে মামলা জেতা যাবে এ ধরনের কোনো নিয়ম কোথাও নেই। সুতরাং বাবুরামবাবু নিজেই মামলা লড়বেন সে বিশ্বাস তিনি নিজেও করেন না। সে জন্যই মোকাজানকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। অপর দিকে, বেণীবাবু মিথ্যা সাক্ষ্য বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে তিনি অধর্ম করিবেন না। তার মতে ভালো সম্পর্কের কারণে তিনি সব করতে পারেন কিন্তু পরকাল খোয়াতে পারবেন না। তার মতে কোনো অপরাধ থাকলে অপরাধ স্বীকার করা ভালো কিন্তু মিথ্যা বলা ঠিক নয়। মিথ্যা বললে বিপদ আরো বেড়ে যেতে পারে। তাকে এক প্রকার ব্যঙ্গ করেই ঠকচাচা বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

হা-হা-হা-হা- মকদ্দমা করা কেতাবী লোকের কাম নয়-তেনারা একটা ধাব্কাতেই পেলিয়ে যায়। এনার বাত মাফিক কাম করলে মোদের মেটির ভিতর জল্ দি যেতে হবে-কেয়া খুব![৮]

ঠকচাচা তৎকালীন ছদ্মবেশী মুসলিম ধূর্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি। তিনি ধর্মীয় লেবাসকে ব্যবহার করে সকল অপকর্ম সংঘটিত করেছেন। তাকে দেখে হঠাৎ করে কারো সন্দেহ কিংবা অবিশ্বাস যেন না হয় সেজন্য তার এই ছদ্মবেশ। আজকের যুগের আধুনিক সভ্য সময়ে এসেও আমরা এ ধরনের ছদ্মবেশীদের দেখতে পাই। সুতরাং তৎকালীন সমাজ এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরনের মানুষের কখনো অভাব ছিল না, এখনো নেই। ঠকচাচার ছদ্মবেশ-এর ধরন নিম্নরূপ-

ঠকচাচার মাথায় মেস্তাই পাগড়ি, গায়ে পিরহান, পায়ে নাগোরা জুতা, হাতে ফটিকের মালা-বুজর্গ ও নবীর নাম নিয়া এক একবার দাড়ি নেড়ে তসবি পড়িতেছেন কিন্তু সে কেবল ভেক। ঠকচাচার মতো চালাক লোক পাওয়া ভার।[৯]

ঔপন্যাসিকের ভাষ্যমতে ঠকচাচার মিথ্যা সাক্ষ্য তৈরিতে জুড়ি নেই। কিন্তু উপন্যাসে দেখা যায়, মিথ্যা সাক্ষ্য তৈরি করেও যখন পার পাওয়া যাচ্ছিল না; তখন তিনি নিজেই সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এটা তার অভিজ্ঞতালব্ধ। কারণ তিনি জানেন সাক্ষ্য কেমন হলে রায় কেমন হতে পারে। তাই যখন দেখলো মতিলালের জন্য তৈরি করা সাক্ষ্য সন্তোষজনক নয় এবং ফলাফল নেতিবাচক হতে পারে, তখন তিনি নিজেই সরাসরি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেন। এটা যে শুধু মামলা হারবার কারণে তা নয়, বরং এটা স্বভাবজাত। কারণ জয়ের নেশা মারাত্মক। ঠকচাচাও তার ব্যতিক্রম নয়। শুধু আর্থিক লাভ তার উদ্দেশ্য নয়, এটা তার সুখ্যাতির বিষয়। ইংরেজিতে যাকে reputation (কারো বা কোনো কিছু সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে ধারনা প্রচলিত) বলা হয়। সুতরাং ঠকচাচাও তার reputation হারাতে চান নি। এজন্য তিনি যা করেছেন, তা হলো-

ঠকচাচা দেখিলেন গতিক বড়ো ভালো নয়- পা পিছলে যাইতে পারে- মকদ্দমা করিতে গেলে প্রায় লোকের দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান থাকে না-সত্ত্বেও সহিত ফরখতাখতি করিয়া আদালতে ঢুকতে হয়-কি প্রকারে জয়ী হইব তাহাতেই কেবল একিদা থাকে এই কারণে তিনি সম্মুখে আসিয়া স্বয়ং সাক্ষী দিলেন অমুক দিবস অমুক তারিখে অমুক সময় তিনি মতিলালকে বৈদ্যবাটীর বাটীতে ফার্সী পড়াইতেছিলেন। ম্যাজিস্টেস অনেক সওয়াল করিলেন কিন্তু ঠকচাচা হেলবার দোলবার পাত্র নয়- মামলায় বড়ো টঙ্ক, আপনার আসল কথায় কোনো রকমেই কমপোক্ত হইল না।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

ঠকচাচার মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে মতিলালকে আদালত বেকসুর খালাস প্রদান করে। ফেরার পথে সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশ কালো হয়ে মেঘ ছুটে আসে। নৌকা ডুবডুব অবস্থা হয়ে যায়। বাবুরামবাবুর মনে হয় এ যেন সত্যকে মিথ্যা বানানোর শাস্তি। বাবুরামবাবুর মনে হয় বেণীবাবুর কথা। সত্যকে স্বীকার করার কথা, অপরাধকে স্বীকার করার কথা। তার ভয় জন্মে সৃষ্টিকর্তা বুঝি মিথ্যার শাপ এখনই তাদের উপর বর্ষণ করবেন। কিন্তু এটাও সত্য পাপ করতে হলেও সাহসের প্রয়োজন, যা বাবুরামবাবুদের মতো মানুষদের থাকে না, থাকে ঠকচাচার মতো মানুষদের। তাই ঠকচাচা তাদের সবাইকে অভয় প্রদান করেন। ভরসা জোগান। সাহস দেন। প্রয়োজন হলে সে সবাইকে সাঁতরিয়ে পার করবে। কিন্তু পাপী যত সাহসী-ই হোক না কেন, মনের কোণে অপরাধ কখনো কখনো উঁকি দেয়। ঠকচাচার মনেও উঁকি দেয়- বহুল প্রচলিত বাংলা প্রবাদ- চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

> ঠকচাচারও ভয় হইয়াছে কিন্তু তিনি পুরানো পাপী- মুখে বড়ো দড়- বলিলেন- ডর কেন কর বাবু? লা ডুবি হইলে মুই তোমাকে কাঁধে করে সেঁতরে লিয়ে যাব- আফদ তো মরদের হয়। রাত ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিল– নৌকা টলমল করিয়া ডুবডুব হইল, সকলেই আঁকু পাঁকু ও ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল, ঠকচাচা মনে মনে কহেন, "চাচা আপনা বাঁচা।"[১১]

ঠকচাচা কেবল সমাজের ভয়ংকর ছদ্মবেশী চতুর ব্যক্তি তাই নয়, অনেক বাক্‌পটু। আপন ঢোল আপনি পেটাতে তার জুড়ি নেই। কোনো নেতিবাচক কাজকে ইতিবাচক করতে হলে প্রয়োজন ইতিবাচক কথাবার্তা। প্রয়োজন মানুষের হৃদয়ভঞ্জন করা। প্রয়োজন কথার জালে আটকানো। ঠকচাচা সেক্ষেত্রে সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে তিনি যে সব সময় কথায় মজিয়েছেন এমনটি নয়, দায়িত্বের সঙ্গে কাজও করেছেন। তবে যতটুকু কাজ করেন তার চেয়ে অনেক বেশি তার কথা প্রাচুর্য। তিনি নিজেকে সব সময় চেয়েছেন তুলে ধরতে। তার কথায় সেটা প্রমাণিত হয়-

> যদি এনাদের কেরদানিতে সব আপদ দফা হল তবে কি মোর মেহনত ফেলতো, মুই তো তসবি পড়েছি? অমনি ব্রাহ্মণেরা নরম হইয়া সামঞ্জস্য করিয়া বলতে লাগিলেন-ওহে যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি ছিলেন, তেমনি তুমি কর্তাবাবুর সারথি-তোমার বুদ্ধিবলেই তো সব হইয়াছে–তুমি অবতার বিশেষ, যেখানে তুমি আছে-সেখানে আমরা আছি-যেখানে দায় দফা ছুটে পালায়।[১২]

ঠকচাচা বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। তিনি সব স্থানেই লাভ খোঁজেন। বিশেষ করে আর্থিক লাভটা তার যেন দেখা চাই চাই। তাই তো বাবুরামবাবুর ছেলে মতিলালবাবুর বিয়ের ব্যাপারে বেণীবাবু বাধা দিতে চেষ্টা করেন তখন ঠকচাচা তার বিপরীতে টাকা পয়সার ও ক্ষমতা তথা দাঙ্গাবাজীদের পক্ষে কথা বলেন। মনিরামপুরের মাধববাবু দাঙ্গাবাজ, উপরন্তু ভদ্রতাবোধে তাদের অভাব আছে শুনেও ঠকচাচা

Dhaka University Institutional Repository

তাদের পক্ষে মত দেন। তার মতে টাকা পয়সাওয়ালা লোক, লাঠির জোর আছে। ফলে বাবুরামবাবু যে শুধু আর্থিকভাবে লাভবান হবেন তা নয়, সামাজিকভাবে শক্তিসম্পন্ন হওয়া যাবে এবং বিপদ-আপদে সহায়তা পাওয়া যাবে বলে ঠকচাচা তাদের পক্ষে মত প্রদান করেন। ঠকচাচার ভাষায়-

> ঠকচাচা চৌকির উপর থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়িয়া বললেন, মোর উপর এতনা টিট্‌কারি দিয়া বাত হচ্ছে কেন? মুই তো এ শাদি করিতে বলি– একটা নামজাদা লোকের বেটি না আন্‌লে আদমির কাছে বহুত শরমের বাত মুই রাতদিন ঠেওরে ঠেওরে দেখছি যে মেণিরামপুরের মাধববাবু আচ্ছা আদমি-তেনার নামে বাঘে গোরুতে জল খায়-দাঙ্গা হাঙ্গামের ওক্তে লেঠেল মেংলে লেটেল মিলবে- আদালতের বেলকুল আদমি তেনার দস্তের বিচ-আপদ, পড়লে হাজারো সুরতে মদত মিলবে। কাঁচড়াপাড়ার রামহরি-বাবু সেকন্ত আদ্‌মি- ঘেসাট ঘোসাট করে প্যাট টাখে-তোমার সাথে খেসি কামে কি ফয়দা?[১৩]

ঠকচাচা সব জায়গায় নিজের অবস্থান জানান দেবার চেষ্টা করেছেন। সব ক্ষেত্রেই নিজে যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেটা বোঝাবার চেষ্টা করে থাকে। নিজেকে এক জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে দেখাতে সদা সচেষ্ট। তাই মতিলালের বিয়ের উপলক্ষে কন্যাপক্ষের পক্ষের সঙ্গে দফা-রফা করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় নিয়েও তিনি কোনো সমাধান করতে পারেন নি। উল্টো কন্যাপক্ষের রোষানলে পড়েন। কন্যা পক্ষের লোকেরা হিন্দুর বিয়েতে মুসলমানের খবরদারি মেনে নেয় নি। ফলে সেখানে তিনি লাঞ্ছিত হন। নিজের দাঁড়ি নাচিয়ে চোখ রাঙিয়ে গালি দিয়ে স্থান ত্যাগ করেন।

> ঠকচাচা দাঁড়াইয়া রফা করিতেছেন- অনেক দম সময় দেন কিন্তু ফলের দফয় নামমাত্র।--- তিনি দাড়ি নেলে চোখ রাঙাইয়া গালি দিতে লাগিলেন।[১৪]

মতিলালের বিয়ে উপলক্ষে কন্যাপক্ষের বাড়িতে নানা পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। তাদের অনেকে নানারকম রসব্যঞ্জক কথা বার্তায় লিপ্ত হয়। অধ্যাপকবৃন্দ বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। কেউ কেউ আবার কবিতার আসর জমিয়ে বসে। সেখানে বরপক্ষের নানা জনকে নিয়ে নানা রসাত্মক কবিতার পঙ্‌ক্তি তৈরি হয়। টকচাচাও সেটা থেকে বঞ্চিত হয় না। তাকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া হয়-

> যায় সরে ধীরে ধীরে মুখে কাপড় মোড়া।
> সবে বলে এই বেটা যত কুয়ের গোড়া।[১৫]

অনেক চরাই-উৎরাই পার হয়ে, অনেক অন্যায় ও ভুল করে অবশেষে মতিলাল বুঝতে পারে তার অধঃগতির একটি অন্যতম কারণ ঠকচাচা। তার দাদা ও ঠকচাচার নানা সময় বিভিন্ন রকম

Dhaka University Institutional Repository

কুমন্ত্রণায় যে তার আজ এইরূপ পরিণতি তা সে উপলব্ধি করতে পারে। সেকারণে সে বিদেশ ভ্রমণে যেতে আগ্রহী হয়। তার ভাষ্য মতে-

> বাটিতে থাকিয়া দাদার কুকথা ও ঠকচাচার কুমন্ত্রণা শুনিয়া শুনিয়া ত্যক্ত হইয়াছি কিন্তু মা-বাপের ও ভগিনীর স্নেহপ্রযুক্ত বাড়ি ছেড়ে যাইতে পা বাধুবাধু করে কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না।[১৬]

আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসটিতে মূল্যবোধের একটি জগত গড়ে তোলার প্রচেষ্টা লেখকের আছে বলে মনে হয়। সেই মূল্যবোধের জায়গায় রয়েছে 'বরদাবাবু' চরিত্রটি। ছোটকাল থেকেই বরদাবাবু সর্বদা ছিলেন ঈশ্বরচিন্তায় বিভোর, এক কথায় ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন। অন্যায়ের সঙ্গে কখনো তিনি আপোস করেন নি। তিনি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও আত্মঅহংবোধ তাঁর ভেতর প্রবেশ করে নি। কল্যাণকামী মানুষ হিসেবেই তার দেখা মেলে উপন্যাসটিতে। নিজের উপার্জিত অর্থ কল্যাণে ব্যয় করতে দেখা যায়। মা, স্ত্রী, চাচার ছেলের পেছনে তিনি তাঁর অর্থ ব্যয় করেছেন। গরীব-দুঃখী আত্মীয়-স্বজনদের সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তাঁকে অতিশয় বড় মাপের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। সব মানুষের সঙ্গে তাঁর মতে মিল না হলেও তিনি কারো প্রতি বিরাগভাজন ছিলেন না। সাধারণত কোনো ছেলে যদি জন্মের পরই দেখে সে অগাধ সম্পদের মালিক কোনো অভাব অনটন নেই, সেই ছেলে বা ছেলেরা পড়ালেখার প্রতি মনোযোগী হয় না, হয়ে ওঠে অহংকারী-সেখানে নম্র, ভদ্র গুণগুলো প্রায়ই থাকে শূন্যের কোঠায় কিন্তু বরদাবাবুর ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। বরং তার চরিত্রে পাওয়া যায় শুদ্ধতা ও নির্জলা নির্মলতা। এ রকম চরিত্রের মানুষের বিরুদ্ধে মামলা হয় গুমখুনের। সেখানে হাত থাকে ঠকচাচার। আদালত প্রাঙ্গনে তাই সকাল সকাল দেখা মেলে ঠকচাচার। সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে সবাই। তাদের ভাষ্যানুসারে-

> আমাদিগের দিকে আড়ে আড়ে চায় আবার চোখের উপর চোখ পড়িলে ঘাড় ফিরিয়া অন্যের সহিত কথা কয়– বোধ হয় ঠকচাচাই সরষের ভিতর ভূত।[১৭]

মামলা হলে ঠকচাচার লাভ। তাই বাবুরামবাবুকে বার বার নানা রকম মামলায় জড়িয়ে দিয়েছে ঠকচাচা। বাবুরামবাবু যখন ঠকচাচাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে একের পর একটা মামলা করে সমস্যায় জড়িয়ে পড়ছেন, তখনও ঠকচাচা তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে যে, মামলা মোকাদ্দমা করা পুরুষের কাজ এবং মামলা জেতাই পুরুষের ধর্ম। তাতে কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই। কোনো সমস্যা হলেও সে তা দেখবে বলে ভরসা দিতেও তার জুড়ি নেই। প্রতিটি পদে পদে সমস্যা সৃষ্টি এবং সেই সমস্যা থেকে উতরানো তার যেন একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। অন্য কথায় এটাই তার পেশা এবং নেশা। তার কথা থেকে বোঝা যায়-

Dhaka University Institutional Repository

মরদের কামই দরবার করা– মকদ্দমা জিত হলে আফদ দফা হবে! তুমি একটুতে ডর করো কেন?[১৮]

ঠকচাচা মামলা-মোকাদ্দমার পেছনেই লেগে থাকেন নি। বাবুরামবাবুকে দ্বিতীয় বিয়ে করতেও প্রলুব্ধ করেছেন। বাবুরামবাবুর বৃদ্ধ, চুল সাদা হয়েছে, দাঁত পড়ে গিয়েছে, ছেলের বিয়ে দিয়েছে, মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। এক মেয়ে গত হয়েছে, অপর মেয়ে প্রায় বিধবা বলতে হয়তো বৃদ্ধ স্বামীকে বোঝানো হয়েছে। তারপরও কুল রক্ষার্থে তার বিবাহ করা চাই, অন্য একটি পরিবারকে রক্ষা করার নামে। বলা বাহুল্য নয় যে, এ বিষয়ে ঠকচাচার প্ররোচনাই ছিল মুখ্য। এ বিবাহে বেচারামবাবু এবং বেণীবাবু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন ঠকচাচা। ঠকচাচা বলেছেন-

১. কেতাবীবাবু সব বাতাতেই ঠোকর মারেন। মালুম হয় এনার দুসরা কোই কাম কাজ নাই। মোর ওমর বহুত হল-নূর বি পেকে গেল মুই ছোকরাদের সাত হর ঘড়ি তকরার কি করব? কেতাবী বাবু কি জানেন এ শাদীতে কেতনা রোনেযা ঘরে ঢুকবে?[১৯]
২. বাতচিত পিচু হবে-মোরা আর সবুর করতে পারিনে। হাবলি যেতে হয় তো তোমরা জলদি যাও।[২০]

মতিলাল সদলবলে মদ্যপ অবস্থায় রাস্তায় পায় বুড়ো মজুমদারকে। মজুমদার গিয়েছিল বাবুরামবাবুর বিয়েতে কনে বাড়িতে। সেখানে থেকে ফেরার সময় মতিলালের সঙ্গে দেখা। মতিলাল সদলবলে তাকে ধরে বিয়ে বাড়ির কাহিনি শোনবার জন্য। মজুমদার না বলতে চাইলেও তারা নাছোড়বান্দা। অবস্থা বিরূপ বুঝে ঘটনার বিবরণ না দিয়ে মজুমদার পার পায় না। বুড়ো মজুমদার ঘটনার আদ্যপান্ত কবিতায় কবিতায় বিবরণ দেন। কবিতাটির শুরুতেই মজুমদার ঠকচাচাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তিনি বলেন-

১. ঠকচাচা মহাশয়, সদা কবি মহাশয়,
বাবুরামে দেন কানে মন্ত্র।
বাবুরাম অঘা অতি, হইয়াছে ভীমরতী,
ঠকবাক্য শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র।[২১]

২. ঠকচাচা এ কি টাঁচা মোকে বাঁচা বলিছে।
লম্ফঝম্ফ ভূমিকম্প ঠক লম্ফ দিতেছে।[২২]

ঠকচাচা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। গিরগিটির ন্যায় রঙ পরিবর্তনে তার জুড়ি নেই। বাবুরামবাবুর মৃত্যুর পর ছেলে মতিলালকে এক প্রকারের গ্রাস করে ফেলেন। আপনি আপনি রাতারাতি মতিলালের অভিভাবক সেজে বসেন। বাবুরামবাবুর শ্রাদ্ধের জন্য সকলের মান রাখার নামে বিপুল ব্যয়ের বাজেট

Dhaka University Institutional Repository

দেন। বেচারাম ও বেণী তারা মতিলালকে বোঝাতে চেষ্টা করে বাবুরামবাবুর দেনা প্রথমে শোধ করা প্রয়োজন। কিন্তু বাঞ্ছারাম ও বটেশ্বর চান শ্রাদ্ধটা ভালোভাবে হোক। বটেশ্বরের মতে, প্রাণ গেলেও যেন মান থাকে অর্থাৎ সে শ্রাদ্ধকে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ করার বিষয়ে তাগিদ দেয়। বাবুরামবাবুর যারা সবময় ভালো চেয়ে এসেছে বেচারাম ও বেণী তারা বাঞ্ছারাম ও বটেশ্বরের সঙ্গে যুক্তিতর্কে পরাজয় স্বীকার করে স্থান ত্যাগ করে। এর পর ঠকচাচা ও বাঞ্ছারাম একযোগে কৌশলে মতিলালের কাছ থেকে শ্রাদ্ধের তহবিলকেও হাতিয়ে তাদের করায়াত্ত করেন।

১. মতিলালের নিকট ঠকচাচা মণিহারা ফণীর ন্যায় বসিয়া আছেন।[২৩]
২. বাবুজি! টাকা তোমার হাতে থাকিলে বেলকুল খরচ হইয়া যাইবে, আমাদিগের হাতে তহবিল থাকলে বোধ হয় টাকা বাঁচিতে পারিবে আর তোমার স্বভাব বড়ো ভালো, চক্ষুলজ্জা অধিক, কেহ চাহিলে মুখ মুড়িতে পারিবে না, আমরা লোক বুঝে টেলে দিতে পারব।[২৪]

ঠকচাচা সব সময় যে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন তা নয়, কখনো কখনো মারামারি, হাতাহাতি থেকে রক্ষা করার চেষ্টাও করেছেন। তিনি নিজে কখনো আক্রমণাত্মক হন নি। কখনো কখনো গালাগালি করেছেন কিন্তু মারামারি বা কোনো কোন্দলের মধ্যে পারতপক্ষে তিনি অংশগ্রহণ করেন নি। বেচারাম ও বেণীবাবু অনেক সময় তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেও তিনি তাতে সায় দেন নি। তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। ঠকচাচা বেশিরভাগ সময় নিজে কিছু না করে অথবা নিজে না জড়িয়ে অন্যদের দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করেছেন। প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব তিনি যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলেছেন। বাবুরামবাবু বেঁচে থাকতে তাকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়েছেন, উদ্দেশ্য হাসিল করেছেন। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে মতিলালকে দিয়ে একই উপায়ে, একই পদ্ধতিতে নিজের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ-

বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচার পরামর্শে মতিলাল রামলালকে বাটী ঢুকিতে বারণ করিয়া দিল।[২৫]

আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসে সুধীসমাজের প্রতিনিধি, ইতিবাচক চরিত্রের অধিকারী এবং যারা বাবুরামবাবুর মঙ্গল ও কল্যাণকামী তারা সবাই উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পদে পদে দেখেছেন এবং জেনেছেন ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম প্রমুখ ব্যক্তিরা যেখানে গিয়েছে অথবা ভিড়েছে সেখানে কোনো কাজই সুন্দর কিংবা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নি। তাদের কথা থেকেই সেটা প্রমাণিত হয়।

বেচারাম বলিলেন- এ তো জানাই আছে যেখানে ঠক ও বাঞ্ছারাম অধ্যক্ষ সেখানে কর্ম সুপ্রতুল হইবে না-দূঁর দূঁর![২৬]

Dhaka University Institutional Repository

বাবুরামবাবুর মৃত্যুর পর পুত্র মতিলালের উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে পরিবারের সবাই একে একে অতীষ্ট হতে থাকে। ধীরে ধীরে তার মা, ভাই, বোন একে একে বাসা ত্যাগ করে। মতিলাল ভাবে এটা নিষ্কণ্টক হওয়া কিন্তু প্রকৃতি জানে এটা সর্বনাশের শেষের শুরু। বাবুগিরির রসদ আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসতে লাগলো। বাবুয়ানার জোগাড়ে তাই বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা পরামর্শ দিলেন সওদাগরি করতে। উপযুক্ত দিন নির্বাচনের জন্য তর্কসিদ্ধান্তের নিকট নানগোবিন্দকে পাঠানো হয়। বাঞ্ছারাম মতিলালকে পরামর্শ দেয় শুধু গদিতে বসার জন্য বাকিটা সে দেখবে। অপরদিকে ঠকচাচা আদালত বিষয়ক সবকিছু দেখবেন। আদালত থেকে সৌদাগরি সব তার জানা। সুতরাং কোনো সমস্যা নেই বলে ভরসা দেন ঠকচাচা।

> মুইবি সাতে সাতে থাকব, মোকে আদালতে, মাল, ফৌজদারি, সৌদাগরি কোনো কামই ছাপা নাই। মোর শেনাবি এ সব ভালো সমজে। বাবু! আপসোস এই যে মোর কারদানি এ নাগাদ নিদ যেতেছে- লেফিয়ে লেফিয়ে জাহের হল না । মুই চুপ করে থাকবার আদমি নয় দোশমন পেলে তেনাকে জেপ্টে, কেমড়ে মেটিতে পেটিয়ে দি- সৌদাগরি কাম পেলে মুই রোস্তম জালের মাফিক চলব।[২৭]

সবকিছুর শেষ আছে। দিনের শেষ আছে, আঁধারের ক্লান্তি আছে। তাই ঠকচাচারও পাপের শেষ হয়ে আসে। কোম্পানির কাগজ জাল করার অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এত দিনের নানা ষড়যন্ত্র, বিভ্রান্তি ছড়ানো, মামলায় ফাঁসানো থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিবাহে প্ররোচনার মত অনেক অপরাধের পরিণণিতে ঠকচাচা পুলিশ দ্বারা ধৃত হলেন। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময়ও তিনি পুলিশদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন, তাদেরকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাদেরকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পুলিশের জানা আছে, ঠকচাচা কোম্পানির কাগজ জাল করার অপরাধে গ্রেফতার হলেও তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। এলাকাবাসী থেকে আদালত প্রাঙ্গন সবারই জানা কিন্তু কোনো প্রমাণ ছাড়া তাকে গ্রেফতার করা যাচ্ছিল না। তাই আজ যখন তাকে গ্রেফতার করা গেছে, তখন তার কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করাকে সমুচিত মনে করে নি পুলিশ। তাই কোনো প্ররোচনা বা প্রলুব্ধকরণে তারা কর্ণপাত না করে ঠকচাচাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেছে।

> ১. এদিকে বৈদ্যবাটীতে পুলিশের সারজন পেয়াদা ও দারোগা ঠকচাচাকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া চল্ রে চল্ হিড়হিড় করিয়া লইয়া আসিতেছে। রাস্তায় লোকারণ্য-কেহ বলে, যেমন কর্ম তেমনি ফল-কেহ বলে, বেটা জাহাজে না উঠলে বিশ্বাস নাই- কেহ বলে, আমার এই ভয় হয়, পাছে ঢোঁড়া হয়।[২৮]
> ২. ঠকচাচা অধোবধনে চলিয়াছে-দাড়ি বাতাসে ফুর ফুর করিয়া উড়িতেছে- দুটি চক্ষু কট্‌মট্ করিতেছে- বাঁধন খুলিবাব জন্য সারজনকে একটা আধুলি আস্তে আস্তে দিতেছে, সারজনের বড়ো পেট, অমনি আদুলি ঠিকুরে ফেলিয়া দিতেছে। ঠকচাচা বলে-মোকে একবার মতিবাবুর নজদিগে লিয়ে চলো-তেনার জামিন লিয়ে মোকে এজ খালাস দেও- মুই কেল হাজির হব। সারজন বলছে-তোম বহুত বক্তা-ফের বাত কহেগা তো এক থাপ্পড় দেগা।[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

আদালতে নানা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ঠকচাচাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তৎকালীন আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি স্বরূপ তাকে আজীবন নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়।

> তোমাদের দোষ বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল- যে সকল লোক এমন দোষ করে তাহারের গুরুতর দণ্ড হওয়া উচিত, এ কারণ তোমরা পুলিপালমে গিয়া যাবজ্জীবন থাক।[৩০]

বঙ্কিমচন্দ্রঃ *বিষবৃক্ষ* : হীরা

'উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমচন্দ্র দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধের ঋত্বিক। বাংলা ভাষায় শিল্পসম্মত উপন্যাস রচনার প্রথম কৃতিত্ব তাঁর।'[৩১] বাংলা উপন্যাস নিজস্ব স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে বেরিয়ে এসেছে তাঁর হাত হতে। এর পর বাংলা উপন্যাসকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি। বঙ্কিমপ্রতিভা স্বর্ণলতার মতো দ্রুত বেড়ে পুরাতন ও জরাজীর্ণতাকে গ্রাস করে ধোঁয়াশা কাটিয়ে উপন্যাসের নব সূর্যোদয়ের দ্বারকে উন্মোচন করেছেন। 'বঙ্কিমের হাতে বাংলা উপন্যাস পূর্ণ যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে যে ক্ষীণতা, কল্পনা, দৈন্য ও ভাবগভীরতার অভাবের পরিচয় পাই, বঙ্কিমের উপন্যাস সেই সমস্ত ত্রুটি হইতে মুক্ত।'[৩২] তাঁর সব কয়টি উপন্যাসের মধ্যেই একটা সতেজ ও সমৃদ্ধ ভাব খেলা করতে দেখা যায়। জীবনের গভীর রস ও রহস্য প্রস্ফূটিত তাঁরই উপন্যাসে। এবং জীবনের মর্মস্থলে যে নিগূঢ় ভাব আছে, তার ওপর আলাকপাত তাঁর উপন্যাসের অনন্য বৈশিষ্ট্য। বলা যেতে পারে সার্থক উপন্যাসের ছাঁচ তিনিই প্রথম গড়েছেন। অর্থাৎ সার্থক উপন্যাস হতে হলে যে যে বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি থাকা প্রয়োজন যেমনঃ স্থান, কাল ও পাত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য, সংলাপ, কাহিনি তার প্রায় সবই পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে। এজন্য বলা যায়, 'বাংলা উপন্যাস মুক্তি পেল বঙ্কিমচন্দ্রে।'[৩৩] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার উপন্যাসে বাংলা ভাষারও প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন। অনেক সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষাকে তার মতই বঙ্কিম বলে থাকেন, কিন্তু তৎকালীন অন্যান্য সাহিত্য বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায়, সমকালীন গতানুগতিক সংস্কৃতানুসারী কিংবা সংস্কৃতমিশ্রিত ভাষা পরিত্যাগ করে বঙ্কিমচন্দ্র সুললিত সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন। 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতানুসারী ভাষা ও টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালী কথ্য বাক্যভঙ্গি নতুনভাবে বিন্যস্ত করে বাংলা গদ্যকে প্রাণস্পর্শী ও সুষমামণ্ডিত ভাষায় রূপান্তরিত করার কৃতিত্ব তাঁর।'[৩৪]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন স্বয়ংসিদ্ধ ঔপন্যাসিক। সমসাময়িক কোনো ঔপন্যাসিককে পাওয়া যায় না যাকে তিনি অনুকরণ কিংবা অনুসরণ করতে পারতেন । তাঁর সামনে ছিলেন কেবল প্যারীচাঁদ

Dhaka University Institutional Repository

মিত্র। কিন্তু তাঁর *আলালের ঘরের দুলাল*'কে সার্থক উপন্যাস বলা যায় না। বরং সেটাকে বড়জোর উপন্যাস লিখার প্রয়াস বলা যেতে পারে। সুতরাং বলা যায়- 'বঙ্কিমচন্দ্র সামনে কোন মডেল রেখে কাজ করেন নি।'[৩৫] কোন কিছু সুন্দর ও সার্থক করে সৃষ্টি করতে হলে সামনে কোনো মডেলকে দাঁড় করাতে হয়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সে সুযোগ ছিল না। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ংসিদ্ধ এবং নিজেই নিজের গুরু। তারপরও 'চরিত্র চিত্রণের কলাকুশলতায়, কাহিনী বিন্যাসের চাতুর্যে ও ভাষার ঐশ্বর্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলো এক অভূতপূর্ব সৃষ্টি।'[৩৬] শুধু তাই নয় গভীর জীবনবোধ বাস্তবতা ও ইতিহাসের আলোকে তাঁর উপন্যাসে কল্পলোক বা কল্পনাবোধ ছিল না এমনটি নয়, তবে তিনি কল্পনায় বিভোর ছিলেন না কিংবা কল্পনার দ্রবণে দ্রবীভূত হন নি; তাঁর কল্পনা ছিল বাস্তব সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত। 'তিনি জীবনকে বিচিত্র রসে পূর্ণ ও কল্পনার ইন্দ্রজালে বেষ্টন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সত্যের সূর্যালোকের পথ অবরুদ্ধ করেন নাই। ইহাই তাঁহার চরম কৃতিত্ব; তিনি সত্যকে রসহীনতা ও নির্জীবতার উপর প্রতিষ্ঠিত করেন নাই।'[৩৭] বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে কোনো মডেল ছিল না এটা সত্য, তবে উপন্যাস বিষয়টির কাঠামো সম্পর্কে ধারণা তিনি বিদেশী সাহিত্য থেকে নিয়েছিলেন বলে অনেক সাহিত্যিক ও সমালোচকগণ মনে করেন। কারণ সে সময়ে ইংরেজি সাহিত্যে শেক্সপিয়র, স্কট, ডিকেন্স প্রমুখ অত্যন্ত জনপ্রিয় নাম। অপর দিকে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সুশিক্ষিত ও ইংরেজিতে পারঙ্গম ব্যক্তি। অতএব তিনি ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করে থাকবেন সেটাই স্বাভাবিক। এ কারণে বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও বিশ্লেষকরা মনে করেন- 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের দেহগঠনের আদর্শ এসেছে ইংরেজি নাটক, বিশেষ করে শেক্সপিয়র থেকে।'[৩৮] নাটক ও উপন্যাস এক জিনিস নয়; এদের মধ্যে ঢের পার্থক্য আছে। তবে নাটক ও উপন্যাসের বিষয় ও বৈশিষ্ট্যে মিলও কম নয়। বিশেষ করে শেক্সপিয়র-এর নাটকই তাঁর একমাত্র আইডিয়া বা আশ্রয়স্থল ছিল এমনটি মনে হয় না। সমালোচক ক্ষেত্রগুপ্ত মনে করেন- 'সেকালের ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্কট এবং ডিকেন্সের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ছিল।'[৩৯] স্কট এবং ডিকেন্সের সরাসরি কোনো প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লক্ষ করা যায় না; বড়জোর তাদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেতে পারেন বা নিয়ে থাকতে পারেন। এজন্য বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র নিজবোধ ও আত্মসচেতনতা হতেই উপন্যাস রচনা করেছেন। এবং তিনিই সার্থক উপন্যাস সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে নবধারা বর্ষার জলপ্রপাত এনেছেন। উপন্যাস সৃষ্টিতে তার যে ত্যাগ-তিতিক্ষা-শ্রম তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। তাই সবকিছু মিলিয়েই স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি "সাহিত্যের রসবোদ্ধাদের কাছ থেকে 'সাহিত্যসম্রাট' ও হিন্দু ধর্মনুরাগীদের কাছ থেকে 'ঋষি' আখ্যা লাভ করেন।"[৪০]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক। তার সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে *রাজমোহন্স ওয়াইফ*-এর সুখির মা, *দুর্গেশনন্দিনী*'র বিমলা, *মৃণালিনী*'র গিরিজায়া, *রাজসিংহ*'-এর জেব-উন্নিসা, দরিয়াবিবি; *বিষবৃক্ষ*-এর হীরা; *দেবী চৌধুরাণী*'র ফুলমণি উল্লেখযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

খল-নারী চরিত্র। এখানে কেবল *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসের 'হীরা' চরিত্র আলোচনার প্রয়াস পাব। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের উপযুক্ত চরিত্রসমূহের মধ্যে একদিকে যেমন সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল চরিত্র 'হীরা'; তেমনি এই চরিত্রের বিকাশ ও বিস্তার ব্যাপক। কেবল 'হীরা' চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'টাইপ চরিত্র' সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। 'টাইপ চরিত্র' বলতে বোঝায় কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তি; যাদের সবার আচার-আচরণ প্রায় এক ও অভিন্ন। তাদের পারিবারিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থান সমশ্রেণির।

বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্থ উপন্যাস, দ্বিতীয় ট্রাজেডি এবং প্রথম সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসটি পঞ্চাশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। খণ্ডভাগের পরিকল্পনা না থাকায় তাতে অবিরাম গতির ভাব প্রকাশ পেয়েছে। *বিষবৃক্ষ* উপন্যাস সম্পর্কে মণি বাগচি বলেছেন-'এইবার তাঁর দৃষ্টি রোমান্সের জগৎ থেকে বাঙালী-সমাজের বৃহত্তর জগতের উপর নিপতিত হল, কবি হৃদয়ের নিগূঢ় বেদনা এইবার যেন সমাজ-জীবনের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে চাইল, জীবন সমস্যা বোধকে অঙ্গীকার করেই তিনি ঔপন্যাসিকের স্বধর্মে ও স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হলেন।'[৪১] 'পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাসে আমরা ভাব-বিকাশের একটি সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ, একটি প্রকৃতিমূলক ব্যাখ্যা আশা করিয়া থাকি, এবং বঙ্কিমচন্দ্রও বর্তমান উপন্যাসের তিলোত্তমার ক্ষেত্রেও তাঁহার পরবর্তী দুই-একখানি উপন্যাসে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ'-এ এইরূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।'[৪২] সামাজিক এই উপন্যাসে কেন্দ্রীয় সমস্যা অবশ্য প্রণয়-ত্রিভুজের। নগেন্দ্র সূর্যমুখীর নিরূপদ্রব এবং গাঢ় প্রীতিপূর্ণ দাম্পত্য জীবনে কুন্দের প্রবেশের ফলে এই ত্রিভুজের সূত্রপাত।'[৪৩] *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে ত্রিভুজ প্রেমের মূলে রয়েছে সামাজিক জটিলতা। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে শৃঙ্খলায়িত অবস্থায় মানুষের বসবাস। কিন্তু মানুষ স্বাধীনতা প্রিয়। তাদের রয়েছে চরম স্বাধীনতাস্পৃহা, মৌলিক চাওয়া-পাওয়া এবং নানাবিধ তাড়না। সাম্‌নার (W.G Sumner) এবং কেলার (A.G. keller) এর মতে 'সামাজিক জীবনের মৌলিক তাড়না হল চারটি-ক্ষুধা, যৌনকামনা, অহংকার এবং ভীতি।'[৪৪] এ সমস্ত বিষয় নির্ভর করে সামাজিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর। অন্যদিকে সমাজে একসঙ্গে থাকতে হয় বলেই কখনো কখনো পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপোড়েন কিংবা অভ্যন্তরীণ জটিলতা দেখা দেয়। এই জটিলতা কখনো রূপ নেয় স্বার্থে, দ্বন্দ্বে, ক্ষোভে, স্বার্থপরতায় কিংবা শেষ পর্যন্ত ক্লেদাক্ততায়। এ সম্পর্কে স্যামুয়েল কোনিগ তাঁর Sociology-an Introduction to the Science of Society গ্রন্থে বলেন-'মানুষের ভালো এবং মন্দ হওয়া ঘটনার পরিবেশ এবং উদ্দীপকের উপর নির্ভর করে।'[৪৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসটি সামাজিক জটিলতার প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট। সমাজে যেহেতু সবাইকে একসঙ্গে বসবাস করতে হয়, সুতরাং কোনো একটি বিষয় নিয়ে সমাজভুক্ত মানুষের পারস্পরিক

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ জটিলতা দেখা দিতে পারে। এবং সেই জটিলতা কখনো কখনো রূপ নিতে পারে স্বার্থ, দ্বন্দ্ব ও ক্ষোভের ভেতর দিয়ে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে শেষাবধি ক্লেদাক্ততার শীর্ষে নিয়ে গেছে। তবে এই ক্রমবিবর্তনের কারণ হিসেবে তিনি সামাজিক সাম্যহীনতাকেই দায়ী করেছেন।

'হীরা' চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হীরা সদ্বংশজ, সুশ্রী ও নিষ্কলুষ। কিন্তু অল্প বয়সে মাতা-পিতাকে হারিয়ে এবং পরবর্তী সময়ে (জমিদার নগেন্দ্রের বাড়িতে আশ্রয় প্রাপ্তির পর) আত্মঅহমিকা থেকেই তার পতনমুখী বিবর্তনের সূত্রপাত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাঙালি নারীসুলভ চাওয়া-পাওয়া যা স্বেচ্ছাচারী আবহাওয়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। তার হৃদয়মধ্যে জেগে ওঠা সকল দুর্দমনীয় অপ্রাপ্তিবোধ পুরণাকাঙ্ক্ষার মূলে ছিল ভয়ংকর জৈবিক তাড়না। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'সূর্যমুখী" -কে হীরা নিজ সৌন্দর্য ও দেহসৌষ্ঠবের সঙ্গে তুলনায় হীন মনে করে। এই অহংবোধ হতে সে 'সূর্যমুখী'র মত নিজেকে সুখী দেখতে চায়। এই চাওয়াই তাকে দেবেন্দ্র উন্মুখ ও বিত্তমুখী করেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হীরা সম্বন্ধে বলেছেন-'তাহার চরিত্রের প্রথম লক্ষণীয় বস্তু হইতেছে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের যে একটা গূঢ় অভিমান ও অকারণ বিদ্বেষ থাকে তাহাই। হীরা সূর্যমুখী অপেক্ষা আপনাকে কোনো অংশে হীন মনে করে না।'[৪৬] এ কারণে তার চরিত্রে ফুটে উঠেছে খলতার নৈকষ্য শ্রী। এছাড়া সামাজিক বিধি-রীতি অথবা প্রভাবজনিত কারণে মানুষ যখন স্বীয় স্বাধীনতায় বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন সমাজে দেখা দেয় অভ্যন্তরীণ কোন্দল কিংবা স্বার্থের টানাপোড়ন। সেখান থেকেই মূলত মানবমন বিকৃত হয়ে নানা প্রকৃতি (shape) গ্রহণ করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে পাওয়া না পাওয়া নিয়ে ভেতরে ভেতরে আত্মদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই আত্মদ্বন্দ্ব সামাজিক জটিলতার এক বিশেষ স্বরূপ হীরাকে ক্রমবিবর্তনের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে এভাবে-

> কিন্তু হীরার অনেক দোষ। ক্রমে তা জানা যাইবে। আপাততঃ বলিয়া রাখি, হীরা আতর গোলাপ দেখিলেই চুরি করে।[৪৭]

সামাজিক জটিলতার একটা বড় কারণ নিজের স্বার্থ হাসিলের পথে অনায়াস মিথ্যাচার, তথ্য গোপন কিংবা ঐচ্ছিক নিরবতা; 'হীরা' চরিত্রে এরূপ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। দত্ত বাড়ির প্রধানা দাসী 'হীরা' সামাজিক বাস্তবতায় নিজ লক্ষ্যে অগ্রসর হতে যা করেছে, তা এরূপ-

> সে রাত্রে হীরা আর দত্তবাড়ি গেল না; আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। পরদিন প্রাতে গিয়া সূর্যমুখীর নিকট দেবেন্দ্রের সংবাদ বলিল। দেবেন্দ্র কুন্দের জন্য বৈষ্ণবী সাজিয়া যাতায়াত করে। কুন্দ যে নির্দোষী

Dhaka University Institutional Repository

> তাহা হীরাও বলিল না, সূর্যমুখীও বুঝিলেন না। হীরা কেন সে কথা লুকাইল-পাঠক তাহা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন।[৪৮]

তীক্ষ্ণ কামনা বিহ্বল প্রেমের প্রতীক হীরা। পুরুষের প্রধান চাওয়া নারী ও অর্থ। নারীরাও যে সুপুরুষ এবং অর্থান্বেষী হতে পারে, তার জলজ্যান্ত উদাহরণ হীরা। স্বপ্ন-পুরুষ দেবেন্দ্র এবং সেইসঙ্গে নগেন্দ্রের, কাছে অর্থ লাভের আশায় কুন্দনন্দিনীকে সে দেবেন্দ্রের আয়ত্তের বাইরে রাখতে চেয়েছে। সেটা সম্ভব কেবল কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের ভবনে বা কাছে থাকলে। কারণ 'জনতার হিংসাত্মক কার্যকলাপের মূলে রয়েছে স্বার্থের তাড়না।'[৪৯] মনে করলে, কুন্দকে যা ইচ্ছা করি, তাই করাতে পারে। আর যদি বাবু কুন্দের পূজা আরম্ভ করেন, তবে তিনি হবেন কুন্দের আজ্ঞাকারী। কুন্দকে করবো আমার আজ্ঞাকারী। সুতরাং পূজার ছোলাটা কলাটা আমিও পাব।[৫০] একের কথা অন্যকে লাগিয়ে মাঝ থেকে নিজের স্বার্থ হাসিল করবার লোকের অভাব সমাজে খুব একটা কম নেই। হীরাকে তার প্রতীকীরূপে রূপায়ন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের চট্টোপাধ্যায়। হীরা নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরির লক্ষে অপর দাসী কৌশল্যা বা কুশি'র সঙ্গে ইচ্ছাকৃত গোলযোগ করে সূর্যমুখীর কাছে বিচার সুষ্ঠু না হওয়ার অজুহাতে নগেন্দ্রের কাছে হাজির হয়েছে এবং সেখানে সে নগেন্দ্রের সঙ্গে ছলনা করেছে-

> হীরা যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা এইবার বলিল, "সেদিন কুন্দঠাকুরাণীকে কি না বলিয়াছিলেন। শুনিয়া কুন্দ ঠাকুরাণী দেশত্যাগী হয়েছেন। আমাদের ভয় পাছে আমাদের সেইরূপ কোন্ দিন কি বলেন,- আমরা তাহলে বাঁচিব না। তাই আগে হইতে সরিতেছি"।[৫১]

'বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসে কয়েকটি চরিত্রে ব্যর্থতাজনিত উন্মত্ততা লক্ষ করা যায়। *দুর্গেশনন্দিনী*-তে বিমলা, *চন্দ্রশেখর*-এ শৈবালিনী, *রাজসিংহ*-তে দরিয়া এ জাতীয় চরিত্র। *বিষবৃক্ষ*-এর হীরাও তাই।'[৫২] আড়ি পাতা কিংবা গোপনে সংবাদ সংগ্রহ এবং তা অন্যের নিকট নিজ স্বার্থে ফাঁস করা সামাজিক অবক্ষয়, কোন্দল অথবা জটিলতার বড় কারণ। বঙ্কিমচন্দ্র 'হীরা' চরিত্রে সেই বিষয়টা যথাযথভাবে রূপায়িত করেছেন। লেখকের ভাষায়-

> হীরা দাসীর চাকরী গেল, কিন্তু দত্তবাড়ীর সম্বন্ধ ঘুচিল না। সে বাড়ীর সংবাদের জন্য হীরা সর্ব্বদা ব্যস্ত। সেখানকার লোক পাইলে ধরিয়া বসাইয়া গল্প ফাঁদে। কথার ছলে সূর্য্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের কি ভাব, তাহা জানিয়া লয়। যে দিন কাহারও সাক্ষাৎ না পায়, সেদিন ছল করিয়া বাবুদের বাড়ীতেই আসিয়া বসে। মহলে পাঁচ রকম কথা পাড়িয়া অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়।[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

পাপিষ্ঠাদের সর্বশেষ পদক্ষেপ কাউকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা। 'মর্মাহত কুন্দকে হীরাই আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল, কৌশলে বিষও যুগিয়েছিল। কারণ তীব্র প্রতিহিংসা।[৫৪] হীরা তা অক্ষরে অক্ষরে সম্পাদন করেছে। দেবেন্দ্রের প্রেমে প্রতারিত হয়ে তার সর্বনাশা হেতু কুন্দনন্দিনীকে বিষপানে প্ররোচিত করেছে। নিজ অর্থে বিষ কিনে কৌশলে কুন্দের সামনে হাজির করেছে। লেখকের ভাষায়-

> ১. আমার মত যদি তোমাকে সহিতে হইত-তবে এত দিনে তুমি আত্মহত্যা করিতে।[৫৫]
>
> ২. হীরা সেই বাক্সে নিজক্রীত বিষের মোড়ক রাখিয়া ছিল। বাক্স খুলিয়া হীরা কৌটার মধ্যে বিষরে মোড়ক কুন্দকে দেখাইল। আমিষ লোলুপ মার্জ্জারবৎ কুন্দ তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল হীরা তখন যেন অন্যমনবশতঃ বাক্স বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়া, কুন্দকে প্রবোধ দিতে লাগিল।[৫৬]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'হীরা' চরিত্রকে মুখর, চোর, পাপিষ্ঠা ছলকারিনী, মিথ্যাবাদী, ঈর্ষাপরায়ণ প্রভৃতি অভিধায় সংজ্ঞায়িত করেছেন বটে। তবে উক্ত মন্দ গুণাবলির ভিড়ে অভাবনীয় কিছু ভাল গুণাবলিও সংযুক্ত করেছেন। একজন মানুষের চরিত্রে ভালো-মন্দ উভয় গুণ সমানভাবে সন্নিবেশিত থাকে। কিন্তু পরিবেশের বৈরিতায় মন্দ গুণ কখনো অতিমাত্রায় প্রকটিত হতে পারে। 'হীরা' চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সে ভালো ঘরের মেয়ে কিন্তু অল্প বয়সে পিতা-মাতা মারা যাওয়ায় তার জীবনের বিপর্যয়ের সূত্রপাত। এরপর বাঙালি নারীসুলভ চাওয়া-পাওয়া ধীরে ধীরে বৈরী আবহাওয়ায় বাড়তে থাকে এবং সকল অপ্রাপ্তিবোধ পূরণাকাঙ্ক্ষায় দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল তার বর্ষাযৌবনের জৈবিক তাড়না। 'নরনারীর অবদমিত দৈহিক কামনা সমাজে বিশৃঙ্খলা আনে।'[৫৭] আর সেক্ষেত্রে দেবেন্দ্র তার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নপুরুষ এবং দেবেন্দ্রকে পেতে অথবা তার (হীরা) প্রতি অবহেলার সমুচিত প্রত্যুত্তরে কুন্দনন্দিনীর ধ্বংস তার কাছে একমাত্র আরাধনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

> ১. হীরা বাল্যবিধবা বলিয়া গোবিন্দ্রপুরে পরিচিতা। কেহ কখন তাহার স্বামীর কোন প্রসঙ্গ শুনে নাই। কিন্তু হীরার চরিত্রেও কেহ কোন কলঙ্ক শুনে নাই।[৫৮]
>
> ২. ও হীরে! ছি! ছি! হীরে! মুখখানি ত দেখিতে মন্দ নয়-বয়সও নবীন তবে হৃদয়মধ্যে এত খলকপট কেন? কেন? বিধাতা তাকে ফাঁকি দিল কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে, সেও সকলকে ফাঁকি দিতে চায়।[৫৯]
>
> ৩. প্রভু, আমি আপনার রূপগুণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। কিন্তু আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি আপনাকে দেখিলেই সুখী হই। এজন্য আপনি আমার ঘরে বসিতে চাহিলে বারণ করিতে পারি নাই-কিন্তু অবলা স্ত্রী জাতি আমি বারণ করিতে পারি নাই বলিয়া কি আপনার বসা উচিত হইয়াছে? আপনি মহাপাপিষ্ঠ, এই ছলে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার সর্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখনি আপনি এখান হইতে যান।[৬০]

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত তিন উদ্বৃতির প্রথমটি হীরা-র সদ্বংশজ বিষয়ের পরিচায়ক। উপন্যাসের প্রথমাংশে বঙ্কিম নিষ্কলুষ হীরা-কে আমাদের সঙ্গে পরিচিত করেছেন। দ্বিতীয় উদ্বৃতির মাধ্যমে আমরা একটু পরিবর্তিত ও বিকৃত পরিসরে হীরা-কে দেখতে পাই; যার হৃদয়পটে খলতার বীজ ততক্ষণে উপ্ত হয়েছে এবং আশাহীনতা, নৈরাশ্য কিংবা পাওয়া না পাওয়া তার মানসিক বৈকলঙ্গের পথে ক্রিয়াশীল। তৃতীয় উদ্বৃতির মাধ্যমে তার ক্ষণিক পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার একটা প্রবণতা লক্ষণীয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মবিকৃতি রোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং কুন্দনন্দিনী'কে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করায় 'হীরা' পাঠক ও সমালোচকদের দৃষ্টিতে খল-নারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

তারকনাথ: *স্বর্ণলতা*: প্রমদা

স্বর্ণলতা (১৮৭৪) উপন্যাসটি প্রবীণ বৃদ্ধিদীপ্ত লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৩) এক অপূর্ব সৃষ্টিকর্ম। এটা তার প্রথম উদ্যম। 'স্বর্ণলতা (সামাজিক উপন্যাস) ১২৮১ সাল (২৮ এপ্রিল ১৮৭৪)।'[৬১] এই উপন্যাসটি ঠাঁয় বসে লিখতে পারেননি, বলা যায় একরকম রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে লিখা উপন্যাস স্বর্ণলতা। *স্বর্ণলতা* উপন্যাসটির রচনা সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'সরকারী কার্যে তাঁহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পর্যটন করিতে হইত এবং এই সময়ই *স্বর্ণলতা* রচিত হয়। পল্লীগ্রামে ঘোড়ার গাড়ী জোটে না। সুতরাং গোরুর গাড়ীই ভরসা। মধ্যাহ্নে পথিমধ্যে কোন ও বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; কিয়দ্দূরে তাঁহার পাচক ব্রাক্ষণ সদ্য-নির্মিত ইষ্টকের চুল্লীতে হাঁড়ি চাপাইয়াছে। ডাক্তার বাবু গোরুর গাড়ীর তলায় শতরঞ্চ বিছাইয়া বসিয়া স্বর্ণলতা লিখিতেছেন। *স্বর্ণলতা*'র অধিকাংশ এইরূপে গরুর গাড়ীর তলায় রাজপথে উপর রচিত হইয়াছিল।'[৬২]

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই *স্বর্ণলতা* রচনা শেষ হয়। তিনি নিজেই লিখে গেছেন-

'Finished my tale in the evening at about 8p.m. It was melancholy pleasure to see it completed as I was to part company with my friends for ever Monday. 7th July. 1873'[৬৩] স্বর্ণলতা উপন্যাসটির অধিকাংশ চরিত্রই বাস্তব ভিত্তির উপর গঠিত; সেখানে কল্পনাকে আশ্রয় তিনি করেন নি বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ তারকনাথের ডায়েরি বা দৈনন্দিন-লিপিতে তার উল্লেখ আছে; তিনি লিখে গেছেন-

'Some characters of my novel are from the real life....my friend suresh and paresh two figures under the name of Ramesh and Debesh. 11th July 1873.'[৬৪] 'Ficta Voluptatis causa sint proxima veris. HORCE. 'Fictions to please should wear the face of Truth.'[৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস সার্থক সৃষ্টি হলেও সেখানে কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। যেমন-তাঁর উপন্যাসে একদম গ্রামীণ জীবনের পটভূমি পাওয়া যায় না। *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩) কিংবা *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮)-কে সামাজিক উপন্যাস বলা হলেও সেখানে গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবির যথার্থ পরিচয় মেলে না। সাধারণ মানুষ, ব্রাত্যসমাজের দৈনন্দিন জীবনাচরণের চিত্র তার উপন্যাসে অপ্রতুল। তাই অনেক ঔপন্যাসিক, সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ব্যাতিরেকে তারকনাথের *স্বর্ণলতা* উপন্যাসকেই যথার্থ উপন্যাস এবং সামাজিক উপন্যাস বলে মত প্রকাশ করেছেন। তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমের দুর্লভ প্রতিভার বিমিশ্র জটিলতা ও বিচিত্র উপাদানে গঠিত অপূর্ব শিল্পসুষমা থেকে একটি মাত্র উপাদান-সামাজিকতাকে পৃথক করে সেটাকে বাঙালিসুলভ সহজ জীবনপ্রীতিময় করেছেন এবং কোমল ভাব রমণীয়তায় অভিসিক্ত করে পরবর্তী-যুগের ঔপন্যাসিক গোষ্ঠীর হাতে সমর্পণ করেছেন। আর সেই ধারা দীর্ঘদিন ধরে বাংলা উপন্যাস-ক্ষেত্রে তার প্রবাহকে অক্ষুন্ন রেখে আসছে। তৎকালীন 'ক্যালকাটা রিভিউ' তে তা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে উপন্যাস কিংবা সামাজিক উপন্যাস কোনটিই বলা হয়নি।" 'ক্যালকাটা রিভিউ' ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়া ছিলেন-স্বর্ণলতাই বাংলায় একমাত্র খাঁটি উপন্যাস; বঙ্কিমের বইগুলি উপন্যাস নহে, কাব্য।"[৬৬] *স্বর্ণলতা* উপন্যাসটি প্রকাশের পর সেই সময়ের সাহিত্যসমাজে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। এবং চারিদিক হতে সমালোচকরা তাঁকে *স্বর্ণলতা*'র মতো উপন্যাস লিখার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লিখেন। যেমন-"ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তারকনাথকে একটি পত্রে লিখেছিলেন বাস্তবিক *স্বর্ণলতা* স্বর্ণলতাই বটে।"[৬৭] *স্বর্ণলতা* উপন্যাসটি পর্যাপ্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করা যায় যে, 'গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় *স্বর্ণলতা*'র সাতটি সংস্করণ হইয়াছিল। ৭ম সংস্করণের প্রকাশকাল-১২ অক্টোবর ১৮৮৯।'[৬৮] একটা উপন্যাস তখনই অন্য ভাষায় অনূদিত হয় যখন তা জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছায়। বলা যেতে পারে *স্বর্ণলতা* উপন্যাসটি সে সময় তেমনই অবস্থানে ছিল। সেকারণে দেখা যায়, "১৮৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দে মিসেস জে.বি নাইট *Journal of the National Indian Association*- এ *স্বর্ণলতা*'র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে দক্ষিণারঞ্জন রায়-কৃত ইহার ইংরেজি অনুবাদ ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।[৬৯]

অতীতের কোন্ উপন্যাসটা কতটা জনপ্রিয় ছিল তা বোঝা যায় তৎসময়ে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে। অনেক সময় মানুষের মুখে মুখে, আচার-আচরণে, অভিনীত নাটক কিংবা সিনেমায় পুরনো কোনো নামকরা উপন্যাসের ছায়া বা প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন দেখা যায়, "তারকনাথের জীবিতকালে কলিকাতার সাধারণ-রঙ্গালয়ে *স্বর্ণলতা*'র নাট্যরূপ 'সরলা' প্রদর্শিত হয়। '*স্বর্ণলতা*'র প্রথমাংশ অবলম্বন করিয়া রসরাজ অমৃতলাল বসু এই নাট্যরূপ রচনা করেন।"[৭০] বঙ্কিমচন্দ্রের ১৮৬৫ এবং ১৮৬৬ সালে যথাক্রমে প্রকাশিত *দুর্গেশনন্দিনী* ও *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসদ্বয়ের

Dhaka University Institutional Repository

ভাব রোমান্টিক। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের আরেকটি উপন্যাস *বিষবৃক্ষ*। *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসটি সামাজিক বলেই অধিকাংশ সমালোচক মত প্রকাশ করেছেন। সামাজিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বিচারে *বিষবৃক্ষ*-কে নিঃসন্দেহে সামাজিক উপন্যাস বলা যায় কিন্তু 'স্বদেশ ও স্বসমাজ হইতে উপকরণ লইয়া প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের; প্রকৃতপক্ষে তাহার *স্বর্ণলতা*'ই বাংলাদেশের প্রথম সামাজিক উপন্যাস।'[৭১] লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি তাঁর 'মোনালিসা', পল গোঁগা (Paul Gaugin) তাঁর 'Where do we come from? What are we? Where we going?' মাইকেল অ্যাংলো (Michacl Angelo) তাঁর The last Judgment' চিত্রকর্মের জন্য বিখ্যাত; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *সোনারতরী*, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্য বিখ্যাত। আবার "ইংলন্ডীয় কবি গ্রে যেমন তাঁহার বিখ্যাত *এলিজি* কাব্যের সাহায্যে ইংরেজি কাব্য সাহিত্যে চিরদিনের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তারকনাথও তেমনি তাঁহার '*স্বর্ণলতা*'র সাহায্যে বাংলা- সাহিত্যে স্থায়ী আসন হইয়াছে।"[৭২]

আধুনিক উন্নত সমাজ অত্যন্ত জটিল। *স্বর্ণলতা* উপন্যাসের সমাজ ১৮৭২-১৮৭৩ সালের হলেও সেখানে আধুনিক উন্নত সমাজের মতই জটিলতা প্রত্যক্ষ করা যায়। এই উপন্যাসে তিনি সমাজের স্বার্থান্বেষী মানুষদের কুচক্রের জালকে এঁকেছেন দক্ষ চিত্রকরের তুলির ন্যায়। উপন্যাসটিতে রয়েছে সমাজে নিত্য ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর ইঙ্গিতবহ পরিচয়। *স্বর্ণলতা* উপন্যাসে নারী-পুরুষ মিলিয়ে অনেকগুলো চরিত্র রয়েছে, যারা সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম ও কারণে স্বার্থন্বেষী হয়ে উঠেছে। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকেই বলা হচ্ছে খল-নারী। এরা হল প্রমদা, প্রমদা-র মাতা ও দ্বিগম্বরী ঠাকুরণ। 'প্রমদা' চরিত্র বাকি অপর দুই খল-চরিত্রের চালিকাশক্তি তথা প্রধানা হওয়ায় কেবল 'প্রমদা' চরিত্র এ পর্যায়ে আলোচনার প্রয়াস থাকবে।

একজন মানুষের ক্রমান্বয়ে খল হয়ে ওঠার পেছনে প্রভাব থাকে সমাজ ও পরিবার উভয়ের। সাংসারিক দীনতা, নিরক্ষরতা 'প্রমদা' চরিত্রটিকে মূলত পারিবারিকভাবে খল করে তুলেছে। যৌথ পরিবারকে ভেঙ্গে এককে পরিণত করতে তথা আত্ম-স্বার্থ সচেতন নারীর প্রতীক হিসেবে প্রমদা'কে *স্বর্ণলতা* উপন্যাসে পাওয়া যায়। এ উপন্যাসে দেখা যায় যখন প্রমদার শাশুড়ি বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্ত হয়, তখন সংসারের সর্বময় কর্ত্রী হিসেবে সে স্থান দখল করে বসে। তবু তার পরিতৃপ্তি আসে না।

> কিন্তু তাঁহাদিগের মাতার পরলোকগমণের পর শশিভূষণের স্ত্রী স্বামীকে স্পষ্টরুপে বুঝাইয়া দিলেন যে, এক সংসারে আর অধিককাল থাকা আয় ব্যয় সম্বন্ধে সুবিধার বিষয় নহে।[৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন প্রবাদ 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'। প্রমদার অবস্থা অনেকটা সেরূপ। ছোট দেবর উপার্জন না করে খাবে (যদিও সেই উপার্জন উসুল করে নেওয়া হয় সরলাকে চূড়ান্ত খাঁটিয়ে) এটা সে কোনোভাবেই মানতে রাজি না। সর্বকরণে তাই চেষ্টায় থাকতো কীভাবে তাদের পৃথক করে দেওয়া যায়। সে মনোবাসনা পূরণার্থে ঘৃণার্থভাবে ব্যবহার করেছে নিজের ছোট ছেলেকে।

> প্রমদা, সরলা ও তদীয় পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার পুত্র কন্যাকে বলিলেন, "যা না বিপিন এখানে কি করিস্, যা গোপালকে তোর কেমন বাঁশী হয়েছে দেখাগে। যা কামিনী, তুইও যা।[৭৪]

প্রমদা ছোট বাচ্চাদের প্রকৃতি জানত। ছোট বাচ্চারা সহজেই যে কোনো জিনিসের ওপর ঝুঁকে পড়ে বা পড়তে পারে। বাচ্চাদের সেই প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়েছে প্রমদা। তাছাড়া প্রমদা জানত সরলার কাছে কোনো টাকা পয়সা থাকে না। হয়েছেও তাই গোপাল বাঁশির জন্য জিদ ধরেছে সরলার কাছে। সরলাকে ধারের জন্য হাত পাততে হয়েছে প্রমদার কাছে, ফলে যা হবার; অনর্থ ঘটেছে। প্রমদার মুখের তিক্তভাষণ হজম করতে হয়েছে। সরলার চোখ থেকে পানি ফেলানো ছাড়া আর কিছু সেই মুহূর্তে ঘটে নি। টাকা ধার সরলা পায় না উপরন্তু টাকা ধার চাওয়ার কারণে তাকে অনেক বড় খেসারত দিতে হয়েছে। রাব ও সেলৎসনিক এর মতো-'মানব-সম্পর্কের সমস্যা যা সমাজ জীবনকেই ভীষণবাবে বিপন্ন করে তোলে অথবা বহু মানুষের 'গুরুত্বপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যবহত করে।'[৭৫] ঔপন্যাসিক তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমদা-র খল-স্বভাবের কিছু ভূমিকা করেছেন। তার মতে, প্রমদার বাবার অবস্থা ভাল ছিল না। বিয়ের পরই কেবল সে টাকার মুখ দেখেছে। এরপর শাশুড়ির মৃত্যুর পর সংসারের সর্বময়কর্ত্রী হওয়ায় সে পৃথিবীকেও বোধহয় তুল্যজ্ঞান করত না। অপরদিকে বিধুভূষণ কোনো কাজ করতো না বলে সরলার কাছ থেকে বিলক্ষণ ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিত। এদিকে ঔপন্যাসিক প্রমদা-র আরেকটি খল-দিক উন্মোচন করে দেখয়েছেন, তা তার শারীরিক পীড়ার ছল।

> প্রমদা যখন এই পীড়ার কথা কহিতেন। পীড়া কি, তাহা বলা দুঃসাধ্য। কারণ সে পীড়াবশত প্রমদাকে এক দিনও উপবাস করিতে দেখা যায় নাই, শরীর কখনও ক্ষীণ হয় নাই, বরঞ্চ উত্তরোত্তর পুষ্টি দেখা যেত। পীড়াটির এই এক লক্ষণমাত্র জানা আছে যে, সকালে সকালে আহার না হইলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত।[৭৬]

সরলার সঙ্গে প্রমদা-র ইচ্ছেকৃত গোলযোগের দ্বিমুখী কারণ ছিল। প্রধানত কারণ নিজ রাজ্যে ঝামেলা বিহীন রাজরাণী, যার কোনো ভাগীদার থাকবে না। সরলারা তার কাছাকাছি থাকলে সে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তার বিলাস বাসনা পুরণে একটা বাধা রয়ে যায়। বাধাটি হল চক্ষুলজ্জা। সে নিত্য নতুন কাপড় পড়বে অথবা গহনা পড়বে কিন্তু সরলা যদি না পড়ে তাহলে নানা জন নানা কথা বলবে। আবার সরলাকে যদি তার মত গহনা পড়া অবস্থা রাখতে চায় তাহলে তার স্বামীর আপন রোজগারের অর্থ ব্যয়

Dhaka University Institutional Repository

করতে হবে। তাই সে যে দু'একটা গহনা নিত তা কৌশলে নিত। তার কোনো শখ পূরণের ইচ্ছা হলে মাঝে মাঝে সে বিভিন্ন অজুহাতে রাগ করত। বলা বাহুল্য যে, এরূপ রাগ তার নতুন কোনো ব্যাপার ছিল না।

> একখান নূতন গহনা কিংবা একখান ভাল কাপড় লইতে হইলেই প্রমদা রাগ করিতেন।[৭৭]

শেষবার প্রমদা-র রাগ ভয়ানক হয়ে উঠেছে। স্বামী শশিভূষণকে ইচ্ছেমতো ভাঙিয়ে সরলাদের পৃথক করে দেবার ব্যবস্থা করেছে। স্বামীর বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে হাত করেছে আরেক খল শ্রেণির নারী 'দিগম্বরী ঠাকরুন'কে। সরলার এই ভয়টাই সবচেয়ে বেশি ছিল। উপরন্তু স্বামী শশিভূষণ যখন বৈঠকঘর নির্মাণ সম্পন্ন করতে চেয়েছে, তখনও তাকে বাধা দিয়েছে। কারণ বৈঠকঘর হলে দুই ভাই সমান অংশের ভাগীদার হবে কিন্তু চন্দ্রহার গড়ালে তা নিজেদের থাকবে কারণ বৌয়ের জিনিসের ভাগ হয় না। এরপর বিধূভূষণ বাড়ি এসে সব কথা জানার পর ভাইয়ের কাছে থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যখন চলে আসে, তখনও প্রমদা টিপ্পুনী কাটতে পিছু পা হয়নি-

> দেখ্‌ছ একবার অহঙ্কারটা? তুমি এক কথা বলেছ, তা নয় দু'টি মিষ্টি করে তোমার অনুনয় বিনয় করুক; তা নয়।[৭৮]

প্রমদার প্রধান উদ্দেশ্য সংসারের একচ্ছত্র কর্মী হওয়ার, সরলাদের তাড়িয়ে সেই স্বপ্ন সে পূরণ করেছে। গহনা প্রাপ্তিও ঘটেছে। তারপরও সে ক্ষান্ত দেয়নি। কথায় আছে, কয়লা ধুলে ময়লা যায় না। সরলাদের প্রায়ই সে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছে এবং করেছেও। কখনও নিজে কখনও মা-ভাইকে দিয়ে, উপরন্তু একবার ধোপাকে টাকার লোভ দেখিয়ে হেয় করতেও ছাড়ে নি। তুই কাপড় হাতে করে রেখে গিয়ে বল, "আজ টাকা না পেলে কাপড় দেবো না"। যদি দেয় ভালই, নইলে বলবি, "যে কাপড় ধোয়ার পয়সা দিতে পারে না, তার এত বাবুয়ানা কেন?"[৭৯]

প্রমদা ব্যঙ্গাত্মক পদক্ষেপ নিয়েছে সরলাদের বিষয়ে। সে জানে সরলাদের হাতে পয়সা নেই। কাপড় ধোয়াবার পয়সা নেই। পড়ার কাপড় একটায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে এত জানে প্রায়ই তাদের উপোস দিতে হয়। প্রমদা একদিন জানতে পেরেছিল যে সরলাদের উনুন জ্বলেনি। সেই জানাটাকে সে কাজে লাগিয়েছে এভাবে-

> ও শ্যামা, তোদের ঘরে অত গোল কিসের? বলি, কারুকে নেমন্তন্ন করেছিস্ না কি?[৮০]

Dhaka University Institutional Repository

প্রমদা বহুরূপী। কখন কোন্ রূপ তার বের হবে বলা প্রায় অসম্ভব। স্বামীর একমাত্র অংশীদার ছোট ভাইয়ের পরিবারকে পৃথক করে অসহায় করেছে প্রমদা। কিন্তু স্বামী শশিভূষণ ধীরে ধীরে আত্মস্থ হয়ে বুঝতে পারে কার জন্য এটা ঘটেছে। প্রমদার বিবিধ আচরণ তার ভুলকে উন্মোচিত করে। ফলে সে ছোটভাই বিধুভূষণের জন্য অনুশোচনা করে। দুষ্টু প্রমদার এখানে আরেকটি ধূর্ত রূপ মূর্তিমান হয়-

> কেন তুমি পৃথক্ করিয়া দিলে, তুমিই তার কারণ জান। আমি পৃথক্ করেও দেই নি, তার কারণ ও জানি নে।[৮১]

খল প্রমদার বড় বৈশিষ্ট্য ছল, যা করেছে সবার সঙ্গে। তবে বেশি প্রাপ্তি ঘটেছে হতভাগা স্বামীর ভাগ্যে। ছোট ভাইদের সংসারকে পৃথক করতে ছল করেছে যার সঙ্গে, সে স্বামী। অসুখের বাহানা দিয়ে বিছানায় পড়ে থাকা ছিল তার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। অপরদিকে রান্নার ভার ছিল যৌথবস্থায় সরলা ও শ্যামার হাতে। পরে অবশ্য বুড়ো মাকেও ছাড় দেয় নি। মাকে ডেকে এনেছে রান্নার দায়িত্ব দেবার জন্য। সেই সঙ্গে তার খলকাজে সহযোগী বাড়ানোর প্রত্যাশায়। আর সেজন্য ছোট ভাই গদাধরকে নিজ বাড়িতে স্থান দিয়েছে। এক কথায় শ্বশুর বাড়িকে বাপের বাড়িতে রূপান্তর মাত্র।

প্রমদার বিভিন্নমুখী নেতিবাচক গুণাবলির কথা উল্লেখ করেছেন। ইতঃপূর্বে তার অনেকটাই প্রকাশ পেয়েছে। আরকটি গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক দিকের কথা ঔপন্যাসিক না বলে হয়তো পারেন নি; সেটা হল তার চৌর্যবৃত্তি। যে সংসারে ঠিকমতন উনুন জ্বলে না, যার ছেলের স্কুলের মাইনে দিতে পারা যায় না। যে সংসার ঝি-এর উপার্জিত টাকায় ও অন্যের বাড়িতে প্রাপ্ত কাজের টাকার কষ্টে-সৃষ্টে দিন চলে, সেই ঝিয়ের সামান্য গচ্ছিত টাকাও প্রমাদার চোখ কিংবা হাত হতে রক্ষা পায় নি। নিজের হাতে চুরি না করেও, ছোট ভাই গদাধরচন্দ্রকে দিয়ে করিয়েছে। এখানেও তার খলতার পরিচয় মেলে। দূরদর্শিতার গুণে নিজে না করে রাজনৈতিক চাল চেলে ভাইকে দিয়ে টাকা চুরি করিয়েছে। সবার সামনে চেঁচিয়ে জানিয়ে ভাইকে বাড়ি যাবার তাগিদ দিয়ে পুনারায় গোপনে রাতে ফিরিয়ে এনে শ্যামার টাকা চুরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং কাজ হাসিল করেছে ভাই গদাধরকে দিয়ে।

> পরে প্রমদা উচ্চৈঃ স্বরে কহিলেন, "গদাধরচন্দ্র, আজ না তুমি বাড়ি যেতে চেয়েছিলে যাও না কেন?"[৮২]

প্রমদার চূড়ান্ত খলতার পরিচয় পাওয়া যায় যখন জমিদারের কাজে দুর্নীতির দায়ে শশিভূষণকে দায়ী করা হয়। নগদ চার-হাজার টাকা ঘুষ দিলে তা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। শশিভূষণ ভেবেছিল প্রমদার কাছ থেকে অনায়াসে সে টাকা পাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পায়নি। কারণ প্রমদা হিসেব করে দেখল কোনটা ভাল, স্বামীকে টাকা দেওয়া, নাকি সেই অর্থ নিয়ে স্বামীকে জলাঞ্জলি দিয়ে রাতের আঁধারে ভেগে

যাওয়া। দ্বিতীয় ভাবনাটা তার কাছে ভালো মনে হল। কারণ স্বামীকে সহায়তা করতে গেলে জীবনের পরবর্তী সময়টা কষ্টে অতিবাহিত করতে হতে পারে। কোম্পানীর কাগজ, নগদ টাকা ও গয়না সব কিছুই তাকে হারাতে হবে। গহনার লোভ স্ত্রীলোকের বড় লোভ এ আর নতুন কি! কিন্তু তাই বলে স্বামীর চেয়ে বড়, একথা সেযুগে কল্পনারও অতীত ছিল; এযুগে যা এখনও দুর্লভ। টাকার ব্যাপারে প্রমাদার বক্তব্য-

> টাকা দিলে কেমন করে বেঁচে যাবে, আমি বুঝতে পারি না। আমার মনে নিচ্ছে, টাকা দিলে টাকাও যাবে, তুমিও যাবে।[৮৩]

প্রমদার এতসব লোভী আচরণ ও স্বার্থান্বেষিতার মূল কারণ সামাজিক অসাম্যতা। সামাজিক অসাম্যতা হল ব্যক্তিভেদে সমাজিক আচরণ, রীতি-নীতির ভেতর পার্থক্য করণ। সামাজিক নানা রকম সুযোগ সুবিধার মধ্যে বিভেদীকরণ। প্রমদার শৈশব ও কৈশোর অর্থাৎ পিতৃগৃহের সময় কেটেছে দারিদ্র্যের মাঝে। মানুষের যে পাঁচটি মৌলিক চাহিদা রয়েছে, তার অধিকাংশ পিতৃগৃহে প্রমদা পায় নি। তাই স্বামীগৃহে যখন সেই চাহিদা পূরণের সুযোগ এসেছে তখন সে হাত ছাড়া করতে চায়নি। এবং সেই স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে সে তার দেবর-জাকে পরিবার থেকে ক্রমান্বয়ে কৌশল প্রয়োগ করে পৃথক করেছে। এমনকি তার স্বামী যখন জমিদারের কাজে দুর্নীতির জন্য জেলে যাচ্ছে, তখনও সে তার স্বামীকে উদ্ধারে গচ্ছিত অর্থ ব্যয় করেনি; করণ সেই অর্থ ব্যয়ে যদি জমিদার তাকে ক্ষমা বা মুক্তি না দেয় তাহলে তাকে তার ছেলে নিয়ে অনিবার্য বিপদে পড়তে হবে। তাদেরকে সাহায্য করার মত কোথাও কেউ নেই। তাছাড়া তার পিতৃগৃহের করুণ জীবন যাপনের কথা তখনও সে বিস্মৃত হয়নি। তাই মা, ছেলে, ছোট ভাই এবং সর্বোপরি নিজের বভিষ্যতের কথা চিন্তা করে সে স্বামীর প্রতি তার মায়া-মমতাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। এটা তার বুদ্ধিমত্তা ও দুরদর্শিতার ফল।

বঙ্কিমচন্দ্রঃ *রাজসিংহঃ* জেব-উন্নিসা

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির নবজাগরণে রামমোহন একটি যে প্রচণ্ড বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, বঙ্কিম প্রতিভার প্রাণস্পর্শে সেই বহ্নিশিখা পরে পরিব্যাপ্ত হয় বাঙালি সমাজে, সাহিত্যে ও ধর্মে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরাতন হয়ে আজো আমাদের কাছে নবীন এবং ক্লাসিক হয়েও তিনি আধুনিক। ল্যানডোরের মতো তিনিও দাবি করতে পারেন-

> I have since writtten what no tide
> Shall ever wash way, what men
> Unborn shall read o'er ocean wide.[৮৪]

Dhaka University Institutional Repository

মিলটন সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছেন-

> In his hands
> The things became trumped, whence he blew
> Soul-animating strains-alas, too few![৮৫]

মিলটনের গুণাবলির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় উপর্যুক্ত একই মন্তব্য প্রয়োগ করা যায়।

ইতিহাস মানব জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইতিহাস আছে বলে আমরা অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছি। ইতিহাসের উপর ভয় করে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলি, রাঙিয়ে তুলি কিংবা সাজিয়ে তুলি। ইতিহাস আমাদের সামনে চলার পথেয়। তাছাড়া ইতিহাসই তো সকল অনুপ্রেরণা ও সৃষ্টির রহস্য। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণার মূলে রয়েছে ইতিহাস। বঙ্কিমচন্দ্রের *রাজসিংহ* (১৮৮২) উপন্যাসটি ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস হিসাবে সর্বজন বিদিত এবং গৃহীত। 'বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মতে *রাজসিংহ*'ই তাঁহার একমাত্র প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস।'[৮৬] *দুর্গেশনন্দিনী*, *দেবীচৌধুরাণী*, *চন্দ্রশেখর*, *রাজসিংহ*, *সীতারাম* প্রভৃতি প্রত্যেকটি উপন্যাস ইতিহাসকে আশ্রয় করে রচিত। তবে কোন্ উপন্যাসে কতটুকু ঐতিহাসিক উপাদান রয়েছে সেটাই আসল বিবেচনার বিষয়। ডক্টর সুকুমার সেন একমাত্র '*রাজসিংহ*-কেই খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। কেননা তাতে স্পেস, টাইম, কনটেক্সট ঠিক আছে।'[৮৭] বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস শিরোনামের গবেষণা গ্রন্থে বিজিতকুমার দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এবং সেখানে তিনি যা বলেছেন তা হল 'বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আটখানি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের একমাত্র *রাজসিংহ* ছাড়া বাকি সাতখানিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি।'[৮৮] ১৮৭৮ সালে *রাজসিংহ* 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ছয় মাস বেরুবার পর তা বন্ধ হয়ে যায়, গল্পের সমাপ্তি হয় না। তিন বছর পরে ১৮৮২ সালে পুস্তকাকারে এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর নাম দিয়েছিলেন 'ক্ষুদ্রকথা'। ১৮৯৩ সালে পুস্তকটির চতুর্থ সংস্করণ বের হয় যা পূর্বের আয়তন অপেক্ষা সাড়ে পাঁচগুণ। এটিই তার সবচেয়ে বড় উপন্যাস, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৮২।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনেক চরিত্রকে তাঁর উপন্যাসে কেন্দ্রিয় চরিত্র হিসেবেই তুলে ধরেছেন। *ইন্দিরা*, *চন্দ্রশেখর*, *রাজসিংহ*, *সীতারাম* প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: শিল্পরীতি গ্রন্থে সমালোচক ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন- 'ইতিহাসের বহুখ্যাত পাত্রদের কেন্দ্রে রেখে এই উপন্যাস লেখা হয়েছে।'[৮৯] কেবল ঐতিহাসিক কাহিনি কিংবা চরিত্রকে থরে থরে সাজিয়ে উপন্যাস সৃজন করা যায় না। ইতিহাস হল অতীত বাস্তবতা এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস হল অতীতের সেই বাস্তব কাহিনীকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে ও যুগোপযোগী করে তোলা। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থে বলেছেন-'ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি অবিকৃত রাখিয়াছেন, তবে ইহাদিগকে কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যে ফেলিয়া ইহাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য স্ফূটতর করিয়াছে।'[৯০] ইতিহাস যখন মানুষের জীবনের অঙ্গ হয়ে যায় কিংবা দৈনন্দিন জীবনাচরণের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় বা তার সত্যতা মিলে; তখন সেটা হয় ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'ইতিহাস এখানে পারিবারিক জীবনের সহিত নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত, অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত হইয়াছে; মানুষের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনের উপরে বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় একটা বজ্র-গর্ভ সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়া একান্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।'[৯১]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাজসিংহ উপন্যাসে 'জেব-উন্নিসা' চরিত্রের উত্থান-পতনের আদ্যপান্তচিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এঁকেছেন। 'জেব-উন্নিসা' চরিত্রটি সাধারণ বাঙালি গ্রামীণ নারীদের মত নয়। তাকে তিনি politician এবং বাদশাহজাদী হিসেবে দেখিয়েছেন। তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হল ক্ষমতার দম্ভ। ক্ষমতার উচ্চাসন আঁকড়ে থেকেও সে নিজেকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। 'উপন্যাসমধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণতম বিকাশ হইয়াছে জেব-উন্নিসা চরিত্রে।'[৯২] বাদশাহী দস্তরের বিচিত্র চিত্র জেব-উন্নিসার চরিত্রের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। একমাত্র প্রেমের দ্বন্দ্বেই তাকে সাধারণ স্তরে নেমে আসতে দেখা যায়। তার আচরণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ন্যায় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। এ লক্ষণ পাওয়া যায়, যখন দেখা যায় কনিষ্ঠ দুই বোনের বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও সে নিজে অনূঢ়া থাকে। উপরন্তু পরবর্তী সময়ে রাজ্যস্থিত অনেকের সঙ্গে তার গোপন প্রণয় প্রকাশ পেতে থাকে। লেখকের ভাষায়-

> ১. জ্যেষ্ঠা জেব-উন্নিসা বিবাহ করিলেন না। পিতৃস্বসাদিগের ন্যায় বসন্তের ভ্রমরের মত পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।[৯৩]
>
> ২. আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষ আগুনে পুড়িয়া মরিব?[৯৪]

জেব-উন্নিসা মোগল হারেমের সর্বময় কর্ত্রী। বাদশাহের উপর তার প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু তার ক্ষমতার একাধিপত্য ছিল না। উদিপুরী তার অসামান্য সৌন্দর্যরাশি দিয়ে বাদশাহকে আবিষ্ট করেছিল। জেব-উন্নিসার বিচক্ষণতা দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও উদিপুরীই তার বাধা। সেই কারণে জেব-উন্নিসা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চেয়েছিল। চঞ্চলকুমারীর রূপ অসামান্য। উদিপুরী অপেক্ষাও সে সুন্দরী। সুতরাং চঞ্চলকুমারী এলে উদিপুরীর গর্ব শেষ হয়। আবার চঞ্চলকুমারীকে সে বশে রেখে আওরঙ্গজেবের উপর প্রভুত্ব করতে পারেবে-এটাও সে আশা করেছিল। সেজন্য সে মবারককে বারবার বলেছিল যে চঞ্চলকুমারী উদিপুরী অপেক্ষা সুন্দরী হলে তবেই যেন মবারক তাকে হারেমে আনে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলতে আমরা বুঝি নিজ স্বার্থ, সেই সঙ্গে ক্ষমতালিপ্সা বা মোটের ওপর প্রভুত্ব। 'রাজসিংহ'

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে জেব-উন্নিসা প্রভুত্ব বিস্তারে তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী পিসীকে কৌশলে পিতার মাধ্যমে হত্যা করে স্থলাভিষিক্ত হয়।

প্রত্যেকটি মানুষের মাঝে দুটো দিক লক্ষণীয়; এক হয় সে মানবিক অথবা সামাজিক। কেউ কেবল মানবিক, কেউ কেবল সামাজিক। আবার কারো কারো মধ্যে উভয় দিকই অল্পবিস্তর থাকতে পারে। এখন মানবিকতা ও সামাজিকতা বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। মানুষের মাঝে ভালো ও মন্দ উভয় বিষয়ই থাকে এবং এই দুটো বিষয় নিয়েই মানুষের মানবিকতা গঠিত। মানুষের মাঝে যদি কেবল মন্দ বা ভালো দিক থাকত তাহলে তাদেরকে যথাক্রমে দানব এবং অতিমানব বলা হত। সুতরাং মানবিকতা বলতে বোঝায় মানুষের আচার-আচরণের সামষ্টিক রূপ; যেখানে থাকবে লোভ, লাভ, স্বার্থ, প্রেম, মায়া-মমতা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা কিংবা অনুরূপ কোনো দোষ বা গুণ। 'জেব-উন্নিসা কাহিনী সম্পূর্ণই মানবিক।'[৯৫] অপর দিকে সামাজিকতা বলতে সমাজের প্রচলিত আইন-কানুন বা নিয়ম-রীতির সমষ্টিকে বোঝায়, যা সমাজভুক্ত মানুষ মেনে চলে। এবং সামাজিক মানুষের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক সাংসারিক হওয়াটা। সাংসারিক হতে হলে তাকে সংসারের কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একটি পত্রে লিখেছিলেন 'বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকারা অনেক সময়েই সাংসারিক জীব হয়ে উঠতে পারে নি।'[৯৬] জেব-উন্নিসা তার একাধিপত্য বিস্তারে প্রথমবার বাধা মনে করেছিল পিসী রৌশনারা'কে। তাই তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় বাধা মনে করে উদিপুরী বেগমকে (পূর্বে দারা প্রধানা খ্রিস্টান মহিষী ছিলেন; পরে দারা'কে হত্যা করে ঔরঙ্গজেব যখন দিল্লীর মসনদে স্থলাভিষিক্ত হন, তখন উদিপুরী তার হস্তগত হয়। এখন সে তার প্রধানা মহিষী)। উদিপুরীর রূপ অতুল্য হওয়ায় সে সহজেই বাদশাহের ওপর প্রভুত্ব করতে পারত। জেব-উন্নিসা তার এই রূপের বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে রূপনগরের সুন্দরী রাজপুতকন্যা চঞ্চলকুমারীকে আনার ব্যবস্থা করতে কৌশলী হয়। উদিপুরীকে বলে-

> এই মহিষের মত বাঁদীগুলো হজরতের তামাকু সাজে, আমি তাহা দেখিতে পারি না। রূপনগরের সেই সুন্দরী রাজকুমারী আসিয়া হজরতের তামাকে সাজিয়ে বাদশাহের কাছে এই ভিক্ষা চাহিও।[৯৭]

মাকড়শা যেমন নিজ তৈরি জালে ধরা পড়া পতঙ্গের সঙ্গে ইচ্ছানুরূপ আচরণ করে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রধান সেনাপতি মবারক খাঁ-কে প্রশ্রয় দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে, সেরূপ আচরণ করেছে জেব-উন্নিসা:

> জেব-উন্নিসা তখন মবারককে পালঙ্কের উপর বসাইয়া স্বহস্তে আতর মাখাইতে লাগিল। তারপর বলিল, "এখন সেই রূপনগরের কথাটা বলিব। জানি না, রূপনগরীর পিতা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে কি না। ছাড়িয়া না দেয়, তবে কাড়িয়া লইয়া আসিবে।[৯৮]

Dhaka University Institutional Repository

লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'জেব-উন্নিসা' চরিত্রটিকে স্পষ্টরূপে রূপায়িত করেছেন। জেব-উন্নিসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সরাসরি তার মুখের ভাষায় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। তার প্রভুত্ব ও একাধিপত্য চিন্তা, কৌশলগত চেতনা অবলীলা ব্যক্ত করেছেন। কেউ যদি একজনকে তার অবাবের সময় কোনো কাজ জুটিয়ে দেয় তাহলে স্বভাবতই সে উক্ত ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে, বাধ্য অথবা বশীভূত হয়। জেব-উন্নিসা এই মানবীয় সূত্রটি প্রয়োগ করেছে চঞ্চলকুমারীর ওপর। 'চঞ্চলসংগ্রহ অভিযানে শুধু বাদশাহের ইচ্ছাই নয়, তার পিছনে মোগল হারেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিজীগিষা, বক্র চক্রান্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে জেব-উন্নিসার মধ্য দিয়ে।'[৯৯]

> মতলব এই যে, উদিপুরীর রূপের বড়াই আর সহ্য হয় না। শুনিলাম রূপনগরওয়ালী আরও খুবসুরৎ। যদি হয়, তবে উদিপুরীর বদলে সেই বাদশাহের উপর প্রভুত্ব করিবে। আমি তাহাকে আনিতেছি, ইহা জানিলে, রূপনগরওয়ালী আমার বশীভূত থাকিবে। তা হ'লেই আমার একাধিপত্যের যে কণ্টক আছে তাহা দূর হইবে।[১০০]

যারা খল প্রকৃতির মানুষ, তারা নিজেদের উন্নয়নে অথবা প্রভুত্ব বিস্তারে সামনে কোন বাধাকে যেকোনো কপটতার মাধ্যমে বিনাশ করে থাকে। সেক্ষেত্রে তারা অনেক সময় সহজ-সরল শ্রেণির মানুষের ছলে আবদ্ধ করে তাদের দিয়ে কার্যোদ্ধার করে থাকে। যতদিন তাদের দিয়ে প্রয়োজন মিটবে ততদিন তারা সুস্থ দেহে বিরাজ করবে। অন্যথা হলে কিংবা ব্যর্থ হলে তাদের বেঁচে থাকার পথ বন্ধ হয়ে যায়। মবারকের অবস্থাও ঠিক তেমনই হয়েছে। যখন জেব-উন্নিসা শুনতে পারল চঞ্চলকুমারীকে সে ছিনিয়ে আনতে পারে নি, উপরন্তু দরিয়াবিবিকে নিয়ে সংসার পেতেছে এবং তার পুনঃপুন ডাক অবহেলা করছে, তখন সে মবারক ও দরিয়াবিবি'র চরম ক্ষতিসাধনে সংকল্প গ্রহণ করেছে-

> উত্তর শুনিয়া জেব-উন্নিসা রাগে ফুলিয়া আটখানা হইল এর মবারকের ও দরিয়ার নিপাতসাধন জন্য কৃত সঙ্কল্প হইল।[১০১]

নিপাত সাধনার্থে সর্বোচ্চ দণ্ড মৃত্যু এবং এই দণ্ড কার্যকর করতে পারে কেবল দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেব। তাই জেব-উন্নিসা পিতা ঔরঙ্গজেবকে 'মবারক বিশ্বাসঘাতক' জানিয়ে সেই দণ্ড আদায় করে নিয়েছে। তখনকার দিনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অনেক পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম ছিল বিষধর সাপ দিয়ে দংশন করানো। কমপক্ষে দুটো সাপ ব্যবহার করা হত সেক্ষেত্রে। মবারককে সেইভাবে সাপ দিয়ে দংশিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

> সাহেব; যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, মবারক কেন মরিল, তখন মেহেরবানি করিয়া বলিবেন, শাহজাদী আলম, জেব-উন্নিসা বেগম সাহেবের ইচ্ছা।[১০২]

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম-ভালোবাসা মানব মনের চিরঞ্জীব সত্তা। তবে কখনো কখনো পরিবেশ পেয়ে মেঘের ন্যায় সূর্যকে ঢেকে ফেলে, জেব-উন্নিসা চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সেই বিষয়টার পরিস্ফূটন ঘটিয়েছেন। বাংলার চিরন্তন প্রবাদ- 'দাঁত থাকতে কেউ দাতের মর্ম বুঝে না'; জেব-উন্নিসাও সেরূপ মবারকের প্রেম কিংবা মবারকের প্রতি তার প্রেম বুঝতে পারে নি। তাই যখন তার চক্রান্তে সাপের দংশনে মবারকের আপাত মৃত্যু হয়, তখন সে স্বভাবসুলভ মুঘলকন্যার আভরণ ত্যাগ করে সাধারণ চাষার মেয়ের মতো মাথা কুটে কেঁদেছে।

> ১. জেব-উন্নিসা প্রত্যাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি এই সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইবেন। সহসা দেখিলেন যে, ঠিক বিপরীত ঘটিল। সংবাদ আসিবামাত্র সহসা তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল-এ শুকনা মাটিতে কখনও জল উঠে নাই।[১০৩]
> ২. আপনি পিপীলিকাদংশন সহ্য করিতে পারিতেছি না, আর অবলীলাক্রমে আমি, যে আমার প্রাণধিক প্রিয়, তাহাকে ভুজঙ্গমদংশনে প্রেরণ করিলাম। এমন কেহ, নাই কি যে, আমাকে তেমনি বিষধর সাপ আনিয়া দেয়। হয় সাপ, নয় মবারক।[১০৪]

পরবর্তী সময়ে মবারক যখন যুদ্ধে মারা গেল তখন জেব-উন্নিসার শোকাবস্থার বর্ণনা দিতে যে ঔপন্যাসিক তাকে ধূলোমাটির মানুষে পরিণত করেছেন।

বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা।[১০৫]

সম্রাটতনয়াকে একদম সাধারণ খেটে খাওয়া নারীদের অনুরূপ করে তুলেছেন; সাম্যতার বলিরেখা আঁকতে চেয়েছেন পুরো মানবজাতির ভেতর দিয়ে। সকল মানুষের হাসি, কান্নার স্বরূপ যদি এক হয়, তাহলে অন্যান্য সকল বিষয়েও ভেদরেখা ভেঙে সাম্যতা আনয়ন করা সম্ভব বলে ঔপন্যাসিক বঙ্কিম মনে করেন।

জেব-উন্নিসা মবারকের প্রেমকে প্রথমে মূল্যায়ন করে নি। উল্টো তার মৃত্যুর দ্বারকে উন্মোচন করেছে। পিতার সাহায্যে তাকে সাপ দিয়ে হত্যা করেছে। এবং তার পরই বুঝতে পেরেছে মবারক তার কি ছিল। যুগ যুগ ধরে বাংলা সাহিত্যে একটা প্রবাদ প্রবাহিত 'মানুষ দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না'। জেব-উন্নিসার ক্ষেত্রেও সেই ঘটনাটি ঘটেছে। প্রথমের দিকে জেব-উন্নিসার প্রেম ছিল রাজ্যের প্রতি, ক্ষমতার প্রতি; পরে তা পরিণত হয়েছে মবারকের প্রতি। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, জেব-উন্নিসা চরিত্রটি মানবিক, সাংসারিক নয়। এবং মানবীয় ও গুণাবলির অন্যতম দুটি দিক হল ক্ষমতালিপ্সা ও প্রেম; যা জেব-উন্নিসার প্রথম ও শেষ জীবনে যথাক্রমে এসেছে। মানুষ ভুল করবে এবং সেটা মানবীয় গুণাবলির মধ্যে অন্যতম একটা বিষয়। তবে মানুষ যখন তার ভুল বুঝতে পারে তখনই সে যথার্থ বা প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠে। জেব-উন্নিসা চরিত্রের মধ্যে এই বিশেষ উত্থান ও পতনের দিকটি লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

মীর মশাররফ: *বিষাদ-সিন্ধু* : জায়েদা ও মায়মুনা

মীর মশাররফ হোসেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন যজমান গদ্যশিল্পী। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রেক্ষাপটে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে দু'একজন মনীষী জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেনই অগ্রগণ্য। জাতির সংকটময় মুহূর্তে তিনিই একমাত্র বাঙালি মুসলমান, যিনি আধুনিক বাংলাসাহিত্য চর্চার পথিকৃৎ হিসেবে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। সাহিত্য সমাজ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি; সাহিত্যিক সমাজেরই একজন। তাই তাঁর সৃষ্টিতে সমাজের ছায়া প্রতিফলিত হতে বাধ্য। কবি-সাহিত্যিক সমাজের পরিবেশ এবং প্রভাবকে কখনো অস্বীকার করতে পারেন না। মীর মশাররফ হোসেন উনিশ শতকের হিন্দু-মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি। 'বরং বলা যায় তাঁর হাত ধরে আমাদের গৃহে প্রবেশ হলো। এতদিন বটতলায় ছিলাম এবার ঘরের মধ্যে বৈঠকখানায়।'[১০৬] তাঁর রচনায় বিশেষ করে উপন্যাসে তৎকালীন হিন্দু-মুসলিম সমাজের পঙ্কিলতাপূর্ণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়। কারণ-'poets and writers are the conscious being of the society of all the ages.'[১০৭] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম দিকপাল। তবে তিনি সাম্প্রদায়িক কি অসাম্প্রদায়িক তা নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা রয়েছে। *আনন্দমঠ* উপন্যাসে তাঁর জিঘাংসাবোধ লক্ষণীয়। সমাজের শ্রেয় ব্যক্তিটি কোনো অপরাধ করলে তা সহজে মানা যায় না। মুঘলদের তিনি শত্রু বলে প্রতিপন্ন করেছেন। অপরদিকে তিনি হিন্দু-সংস্কৃতির কথা বললেও হিন্দু-ধর্ম সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেন নি। আনন্দমঠে তিনি কলকাতার গর্ভনর হিসেবে ওয়ারেন হেস্টিংসকে ভগবানের নিয়োগ বলে মনে করেছেন। কোনো ধর্ম সম্পর্কে কটূক্তি করা তা দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা, বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন। ইসলাম ও ব্রাহ্ম ধর্ম সম্পর্কে বিদ্দিষ্ট মনোভাবের প্রকাশ করেছেন। ব্রাহ্ম ধর্মের 'একেশ্বরবাদ'কে অবহেলা করেছেন। এতসব বিবেচনায় 'মশাররফ হোসেনই বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রথম সার্থক সাহিত্যশিল্পী। মোটামুটি ১৮৬৫ থেকে ১৯১০ সালে, প্রায় ৪৫ বছর মশাররফের শিল্পসৃষ্টির সময়কাল। এই দীর্ঘ-সময়ে তাঁর সাহিত্যসাধনার ফসল স্বল্প নয়। এ-পর্যন্ত তাঁর পঁচিশখানা প্রকাশিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ-ছাড়া আছে বেশকিছু অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত রচনা।'[১০৮]

কুষ্টিয়া জেলার লাহিনী পাড়ায় ১৮৪৭ সালে জন্ম মশাররফ হোসেনের। পারিবারিক পটভূমি লক্ষ করলে দেখা যায়, তিনি তৎকালীন আদর্শ ও সম্ভ্রান্ত পীর পরিবারের ছেলে। আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কিত গবেষণা গ্রন্থে জানিয়েছেন-'তিনি ছিলেন বর্ণাঢ্য চরিত্রের অধিকারী এক বিরল শিল্পী ব্যক্তিত্ব। তাঁর অন্তর্গত বোধ-বিশ্বাস উপলব্ধি তাঁর জীবনাচরণের ভেতর দিয়ে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত। সামাজিক ভূমিকা সাংস্কৃতিক চেতনা, পারিবারিক প্রতিফলিত করে, অপরদিকে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

স্বভাবেরও প্রতিনিধিত্ব করে।'[১০৯] বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) তার শ্রেষ্ঠ রচনাকর্ম 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-১৮৯১)।

শিল্পবোধ, জীবনানুভূতি ও ভাষাসৌকর্যে *বিষাদ-সিন্ধু* মশাররফ হোসেনের এক স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। মীরের অসামান্য লোকপ্রিয়তা ও ব্যাপক পরিচিতির মূলে আছে এই গ্রন্থটি। '------ বিষাদ-সিন্ধু যদি শাস্ত্র-বিরোধী রচনা বলে শুদ্ধতাসন্ধানী ধর্মবুভুক্ষু পাঠকের বিরক্তির কারণ হয়ে থাকে, তাহলে আমার ধারণা, অবিকল ঐ একটি কারণেই *বিষাদ-সিন্ধু* সরাসরি জনগণের কাছে চলে গিয়েছে।'[১১০] কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই উপাখ্যানের কাহিনী। '*বিষাদসিন্ধু* বাংলা সাহিত্যের একটি ধ্রুপদী গ্রন্থ।'[১১১] 'মহরম পর্ব্ব' 'উদ্ধার পর্ব্ব,' 'এজিদবধ পর্ব্ব' *বিষাদ-সিন্ধু*'র এই তিনটি পর্ব স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৮৫, ১৮৮৭ ও ১৮৯১ সালে। ১৮৯১ সালে এর একত্রিত অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশিত হয়। "তিনপর্ব্বে বিভক্ত 'বিষাদ-সিন্ধু'র 'মহরম পর্ব্বে'র পরিচ্ছেদ সংখ্যা ছাব্বিশ, 'উদ্ধার পর্বের ত্রিশ ও 'এজিদবধ পর্ব্বে' পাঁচ। অবশ্য 'মহরমপর্ব্বে'র 'উপক্রমণিকা' ও উদ্ধার পর্বের 'উপসংহার'কে ধরলে আরো দুটি অধ্যায় বৃদ্ধি পাবে।"[১১২] বিষাদ-সিন্ধু বাংলা সাহিত্যে এবং বিশেষ করে মুসলমান সমাজের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি উপন্যাস। কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রিক ট্রাজেডির ছাঁচে গড়া এরূপ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নেই। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে'র বার্ষিক প্রতিবেদনে (১৮৮৭) *বিষাদ-সিন্ধু*'র 'উদ্ধার পর্ব্ব' সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান-

Mir Mosharraf Hossain's Bishad Sindhu, based on the events before and after the great battle of karbala, is one of the best works in the Bengali language, the earnestness and pathos of the work, its elevated moral tone and dignified diction, raise it to a high level, and mark a distinet deprture, both in mater and in manner, form the current examples of imaginative writing in Bengali.[১১৩]

বিষাদ-সিন্ধু'র প্রকৃতি বিচারে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। *বিষাদ-সিন্ধু* গ্রন্থটি উপন্যাস নাকি গদ্যকাব্য, এ নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা রয়েছে। আবার এটা ট্রাজিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস না মহাকাব্য তা নিয়েও মতভেদ আছে। যদি ট্রাজিক উপন্যাস হয় তাহলে তা কি ধরনের ট্রাজিডি; গ্রিক না শেক্সপিরিয়ান সেটা নিয়েও সমালোচনার অন্ত নেই। আব্দুল লতিফ চৌধুরী এবং মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালের মতে এটি একটি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। ক্ষেত্রগুপ্ত এ প্রসঙ্গে বলেছেন- 'বাংলায় মহাকাব্যিক উপন্যাস কিছু অবশ্যই আছে। কিন্তু খাঁটি মহাকাব্যের কাছাকাছির উপন্যাস *বিষাদ-সিন্ধু*।

Dhaka University Institutional Repository

বিষাদ-সিন্ধু গদ্যে লেখা মহাকাব্য এবং *বিষাদ-সিন্ধু* একটি ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স।'[১১৪] বেশিরভাগ সমালোচক *বিষাদ-সিন্ধু*'কে উপন্যাস বলেছেন। তবে কেউ কেউ একে উপন্যাস, নাটক, জীবনেতিবৃত্ত ও ইতিহাসের সমন্বিত রূপ বলে মনে করেছেন। তাদের একজন মুহম্মদ আব্দুল হাই। তিনি *বিষাদ-সিন্ধু*'র আঙ্গিক-বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: "*বিষাদসিন্ধু* খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, জীবনচরিত ও নয়, তেমনি আটখাট বাঁধা বিধিবদ্ধ 'Organic plot' এর উপন্যাসও নয়। এ ইতিহাস, উপন্যাস, সৃষ্টিধর্মীয় রচনা ও নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের সর্ববিধ সংমিশ্রণে রোমান্টিক আবেগমাখানো এক সংস্কার সৃষ্টি।"[১১৫]

বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাসের প্রকৃতি নিয়ে যেমন সমালোচনা হয়েছে তেমনি তার প্রকরণ বা উপাদান নিয়েও সমালোচনা হয়েছে। উপন্যাসটির অভ্যন্তরীণ বিষয় রূপজ মোহ, সপত্নীবাদ, প্রণয় নানিক সাম্রাজ্য লাভ তা বারবার আলোচনায় এসেছে। '*বিষাদ-সিন্ধু*'র সমস্ত আয়োজন নারী সৌন্দর্যের প্রতি দুর্বার ও আপসহীন আকর্ষণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।'[১১৬] সেলিম জাহাঙ্গীর তাঁর মীর মশাররফ: জীবন ও সাহিত্য নামক গ্রন্থে বলেছেন-"রূপজ মোহের পরেই '*বিষাদ-সিন্ধু*'র অন্যতম উপাদান সপত্নীবাদ।"[১১৭] 'ইতিহাসের এক মর্মন্তুদ মানবিক ট্রাজেডিকে তিনি রূপ দিয়েছেন *বিষাদ-সিন্ধু*'তে (১৮৮৫-১৯৯১)। সেইসঙ্গে গভীর শৈল্পিক মমতায় উদ্‌ঘাটন করেছেন অচরিতার্থ প্রণয়ের বেদনায় জর্জরিত এক অসহায় ও নিয়তি-লাঞ্ছিত মানবের হৃদয়গত উপলব্ধিকে । মূলত ইতিহাসের তিরস্কৃত ও ধর্মপ্রাণ মানুষে কাছে ঘৃণিত এক চরিত্রের বিফল কামনা-বাসনার প্রকৃতি ও পরিণাম চিত্রণই এই উপাখ্যানের মূল লক্ষ্য বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। কিন্তু তা নয় বরং '--- সুদুর অতীত ইতিহাসের নর-নারীদের এ যুগের দোষে-গুণে অথবা বিচক্ষণ সাংসারিক মানুষরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন।'[১১৮]

বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাসে তিনটি খল-চরিত্র পাওয়া যায়। মাবিয়ার স্ত্রী, মায়মুনা এবং জায়েদা। তার মধ্যে মায়মুনা ও জায়েদা চরিত্রে খলতার পরিমাণ বেশি। মোহাম্মদের দৌহিত্র ইমাম হাসানের তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে জয়নাবকে গ্রহণের পর থেকে 'জায়েদা' চরিত্রকে ধীরে ধীরে খল হতে দেখা যায়। এর পেছনে অবশ্য হাত আছে আরেক খল-নারী মায়মুনা'র। একজন কার্যোদ্দীপক আরেকজন কার্যোসংঘটক। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় মশাররফ হোসেন মায়মুনা ও জায়েদা চরিত্রদ্বয়কে দুটি দৃষ্টিকোণ হতে বিশ্লেষণ করেছেন। একই উপন্যাসে উভয় চরিত্রের অবস্থান এবং রূপায়ন ভিন্ন ভিন্ন। মায়মুনা সমাজ কেন্দ্রিক, জায়েদা পরিবার কেন্দ্রিক। এছাড়া আরও একটি বিষয় লক্ষ করবার মত, উপন্যাসটিতে স্ত্রী-পুরুষ মিলে অনেকগুলো খল-চরিত্র এবং সেগুলো একে অপরের প্রভাবে প্রভাবিত

Dhaka University Institutional Repository

এবং নির্ভরশীল। মাবিয়ার স্ত্রী হতে শুরু। এরপর মাবিয়াস্ত্রী হতে এজিদ, এজিদ হতে মারওয়ান, মারওয়ান হতে মায়মুনা, মায়মুনা হতে চূড়ান্তরূপে জায়েদা।

জায়েদা *বিষাদ-সিন্ধু* উপাখ্যানের সর্বাপেক্ষা "জীবন্ত মানবী"।[১১৯] 'জীবন্ত মানবী' বলতে বোঝানো হয়েছে যে চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা বেশি বিকশিত হয়েছে। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জায়েদা চরিত্রটির সরব উপস্থিতি না থাকলেও, যতটুকু অংশ জুড়ে রয়েছে তাতে একটি চরিত্র বিচারে যতটুকু বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তার পুরোটাই রয়েছে। জায়েদার চরিত্রটির প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, সে এজিদের সমানধর্মা। সে এজিদের মতোই প্রেমের দাবি পূরণ করতে গিয়ে নির্মম-নিষ্ঠুর অমানবিক হয়ে পড়েছে। সামান্যতম হলেও, এজিদের অনুশোচনাবোধ আছে। কিন্তু হাসানকে হত্যার পর জাএদা চরিত্রে তার লেশটুকুও মেলে নি। জায়েদা চরিত্রে "প্রেমিক নারীর ঈর্ষা এবং সপত্নীদ্বেষের তীব্র রূপ" প্রকাশিত হয়েছে এবং তা "একটি অসাধারণ নারীচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের ছবি।[১২০] বাঙালি নারীর জীবনেতিবৃত্ত লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তারা সমস্ত বিষয় ভাগাভাগি করতে প্রস্তুত; কিন্তু তার পতিকে বা পতি সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে বিন্দু পরিমাণ ছাড় দিতে নারাজ। তকে এটা যে কেবল বাঙালি নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা কিন্তু নয়। বরং বলা যেতে পারে সারা বিশ্বের সমস্ত নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিষাদ-সিন্ধু তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে বিদেশি নারীরা যতটুকু ছাড় দেয় বা দিতে পারে বাঙালি নারীরা তা দিতে পারে না। 'জায়েদা' চরিত্রটিও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতীয় উপমহাদেশে একাধিক পত্নীর সংসার অনেক দেখা যায়। এবং এ ধরনের সব পরিবারেই দেখা যায় চরম অশান্তি। পত্নীগণ পারস্পরিক নানাবিধ জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য একটাই তা হল পতিকে একান্ত নিজের করে পাওয়া। আর এটা করতে গিয়ে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ে। একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী, পথের কাঁটা মনে করে এবং যোকোনো মূল্যে সেই কাঁটা দূর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। প্রথমের দিকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে নারীসুলভ কমনীয়তা, নমনীয়তা কিংবা দুর্বলতা প্রকাশ পেলেও ধীরে ধীরে নানা অনুকূল পরিবেশের ভেতর দিয়ে তা বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়ায়। 'জাএদা বাঁচিয়া থাকিতে স্বামী ভাগ করিয়া লইবে না (মহরম পর্ব্ব, ত্রয়োদশ প্রবাহ)। এই উপলব্ধি থেকেই জাএদার মনে প্রতিহিংসা জাগ্রত হয়েছে, জন্ম নিয়েছে ঈর্ষা। মায়মুনার সঙ্গে আলাপচারিতায় তার অন্তরের গভীর বেদনা প্রকাশিত হয়েছে: যে আমার হইল না, আমার মুখের দিকে যে ফিরিয়া তাকাইল না, তাহাকে ঔষধে বশ করিয়া লাভ কি বোন।'[১২১] স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা এক ব্যথিত নারীর করুণ আর্তিই এখানে ফুটে উঠেছে। প্রেম-প্রত্যাখাতা জাএদার এক সময় মনে হয়েছে, "এখন শীঘ্র মরণ হইলেই আমি নিস্তার পাই"[১২২] (মহরম পর্ব্ব, ত্রয়োদশ প্রবাহ)। মায়মুনা যখন তাকে স্বামী হত্যার পরামর্শ দিয়েছে তখন সে এই প্রস্তাব তীব্রভাবে অগ্রাহ্য করেছে। এবং সেখানে ফুটে উঠেছে বাঙালি নারীর আরেকটি অনিন্দ্য গুণ তা হল

Dhaka University Institutional Repository

'প্রতিপ্রাণা'। নিজের জান গেলেও স্বামীর শত অত্যাচার, নিপীড়নেরও তারা স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত এবং তার জন্য কল্যাণপ্রার্থী। বলেছে–

> 'এই দুঃখে যদি মরিয়াও যাই, আরও শত শত প্রকার দুঃখ যদি ভোগ করি, সপত্নী-বিষম বিষে আরও যদি জর্জ্জরিত হই, পরমায়ুর শেষপর্যন্ত যদি এই দুঃখের শেষ না হয় তথাপিও উহা পারিব না; আমার স্বামী আর আমি-আমার প্রাণের প্রাণ-কলিজার টুকরা আর আমি-'[১২৩]

নারীসূলভ উপর্যুক্ত গুণসমূহ প্রথমের দিকে জায়েদার ভেতর ছিল, যদিও পরে তা এজিদ, মারোয়ান এবং মায়মুনার উপর্যুপরি প্ররোচনায় তা বিলুপ্ত হয়েছে। এজিদ জয়নবকে পাবার আশায় মারোয়ানকে কাজে লাগিয়েছে। মারোয়ান নিজ রাজার হুকুম তামিল করতে এবং স্বীয় অস্ড়িত্ব টিকিয়ে রাখতে মায়মুনাকে হাত করেছে। মায়মুনা জায়েদার অনেক দিনের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য দাসী এবং সখি। সেই মায়মুনা ধীরে ধীরে দিনে দিনে সর্বদা জায়েদার কানে মন্ত্রণার বীজ বোপন করেছে। ফলে জায়েদা বিপথগামী হতে বাধ্য হয়েছে। তার ভেতরে যে চাওয়া না পাওয়াগুলো ছিল সেটাকে ভিন্নপথে পাবার রাস্তা বাতলে দেবার নামে জায়েদাকে প্ররোচিত করেছে মায়মুনা। আবুল আহসান চৌধুরী বলেছেন-'একদিকে মায়মুনার প্রলোভন, প্ররোচনা, কূট-পরামর্শ ও সপত্নীবাদের অন্তর্জ্বালা, অপরদিকে স্বামীর প্রতি গভীর অনুরাগ, প্রীতি ও আকর্ষণ এই টানাপোড়নে ক্ষণিকের জন্য হলেও জাএদার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।'[১২৪] চণ্ডীমঙ্গলের দুর্বালা দাসীর সঙ্গে তুলনীয় 'মায়মুনা' চরিত্র। মায়মুনা একটি পাষণ্ড নারী চরিত্র। তিনি হলেন সুযোগ সন্ধানী। প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই চরিত্রের সৃষ্টি। হাসানগৃহে জয়নবের আগমনের পর হতে জায়েদা'র মনে খলতার বীজ রোপিত হয়। স্ত্রীত্রয়ের মধ্যে হাসানের সমান আচরণ বাহ্যিক পরিলক্ষিত হলেও ভেতরে ভেতরে কম বেশির একটি আভাস মনে মনে জায়েদা জয়নাবের ওপর চাপিয়ে দেয়-

> "জায়েদা মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন, এ দোষ আমার নয়, হাসানের নয়, এ দোষ জয়নাবের জয়নাবকে যে এই দোষে দোষী সাব্যস্ত করিলেন আজিও করিলেন, কালিও করিলেন, জীবন শেষ পর্যন্ত করিয়া রাখিলেন। সে দোষ ক্রমেই অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া শত্রুভাব আসিয়া দাঁড়াইল।"[১২৫]

চাপা আগুনে শুকনো খড়কুটো প্রদান মানসে আগমন মায়মুনা-র। মারওয়ান দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এবং নিজ আর্থিক অনটন মুক্তির প্রত্যাশায় অধিকন্তু হাজার মোহরের আতিশয্য লোভে মায়মুনা মারওয়ান-এর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়- হাসানের জীবননাশে।

Dhaka University Institutional Repository

মোহরগুলি রুমালে বাঁধিয়া মায়মুনা বলিল, "দেখুন। যার দুই তিনটি স্ত্রী, তার প্রাণবধ করিতে কতক্ষণ লাগে? সে ত 'আজরাইলকে' (যমদূতকে) সর্বদা নিকটে বসাইয়া রাখিয়াছে। তার প্রাণ রক্ষা হওয়াই আশ্চর্য নয়।[১২৬]

'মায়মুনা' চরিত্রটি আর্থিক দীনতাসহ খলতায় বহুরূপী গুণাবিল সমৃদ্ধ। প্রকৃতিগত ভাবেই সে যেন খল-নারী। মায়মুনা-র কেশপাশ শুভ্র বলে অনেকেই তাকে বৃদ্ধা মনে করে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে বৃদ্ধা নয়। উপরন্তু সে মিষ্টভাষিণী, যে যোদ্ধার অন্তর পাষাণে গঠিত, তার মনও বোধ হয় সে গলিয়ে মোমে পরিণত করতে পারে।

যেখানে অস্ত্রের বল নাই, মহাবীরের বীরত্ব নেই, সাহস নাই, সাধ্য নাই, সেইখানেই এই মায়মুনা।[১২৭]

কুমন্ত্রণায় মায়মুনা সিদ্ধমস্তিষ্ক। সেইসঙ্গে কেঁদে চোখ ফুলাতে তার জুড়ি মেলানো ভার। তাই অনায়াসে কুমন্ত্রণার সঙ্গে কান্না জুড়ে জায়েদা-কে বশে নিয়ে এসে বিপথে চালিত করতে পেরেছে। হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করবে এই মর্মে প্রতিজ্ঞাও করিয়ে নিয়েছে। অবশেষে বিষ তুলে দিয়েছে জায়েদার হাতে।

১. জায়েদা কহিলেন, "তোমার কোন্ কথাটা আমি মনের সহিত শুনি নাই, মায়মুনা? তুমি আমার পরম হিতৈষিণী। যাহা বলিবে, তাহার অন্যথা কিছুতেই করিব না।[১২৮]
২. খুব সাবধান! এই কৌটাটি গোপনে লইয়া যাও, সুযোগমত ব্যবহার করিও। মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, জয়নাবের সুখতরী ডুবিবে, এই কৌটার গুণে তুমি সকলি পাইবে। যাহা মনে করিবে তাহাই হইবে।[১২৯]

পূর্বে বলা হয়েছে একজন উদ্দীপক আরেকজন সংঘটক। মায়মুনা উদ্দীপনা যুগিয়েছে, জায়েদা কাজে পরিণত করেছে। পূর্বে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে জায়েদার মনে প্রথম হতেই বিরাগের অঙ্কুরোদগম হয়েছিল। মায়মুনা তাতে নিয়মিত জল ঢেলেছে, ফলে জায়েদার মনে অঙ্কুরিত বীজকে বৃক্ষে পরিণত করার প্রতিজ্ঞা দৃঢ়মূল হয়েছে। অতঃপর মায়মুনার দেওয়া বিষ হাতে জায়েদা জয়নাব-এর সুখস্বপ্ন তথা হাসানের মৃত্যু অভিলাসে সংকল্পচেতা হয়েছে।

জয়নাবের সুখস্বপ্ন আজ ভাঙ্গিব জয়নাবের অঙ্গের আভরণ আজ অঙ্গ হইতে খসাইব, সেই আশাতেই সকল স্বীকার করিলাম। আমার দশার দিকে ফিরিয়াও চাহিলাম না। জয়নাবের যে দশা ঘটিবে। আমারও সেই দশা। ইহা জানিয়াও কেবল সপত্নীর মনে কষ্ট দিতে স্বামী বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।[১৩০]

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী হত্যায় প্রত্যয়ী জায়েদা সপত্নী জয়নাবকে দেখলে শুধু শত্রুবৎ মনে করে নি, দেখা মাত্র মুখের স্বাভাবিক প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে সেখানে বিদ্বেষানল জ্বলে উঠেছে, প্রতিহিংসা বলবতী হয়েছে, স্বামী-স্নেহ বা স্বামী–ভক্তি একেবারে অন্তর হতে উঠে গিয়েছে, অন্যায় আচরণে প্রবৃত্তি জন্মেছে, কোমলতা ছেড়ে হৃদয় পাষাণ হয়ে উঠেছে, এমনকি হাসানের মুখাবয়ব বিষবৎ হয়েছে। তার তখন ইচ্ছে হয়েছে-

> তখনি- সেই মুহূর্তেই হয় নিজের প্রাণ, নয় জয়নাবের, না হয় যিনি ইহার মূল তাহার।[১৩১]

তপস্বিনীর ধ্যান পরকাল, জায়েদার প্রাপ্তিচ্ছা মর্তের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ধনবিলাস। একারণেই হয়তো জায়েদা প্রাণপতি-ঘাতে একবার নয়, তিন তিনবার চেষ্টা চালিয়েছে। প্রথমবার মধুতে বিষ ঢেলে ও দ্বিতীয়বার খেজুরে বিষ মেখে ব্যর্থ হয়েছে। তবে সব সময় মায়মুনার ইন্ধন ছিল পুরোপুরি। হাসানের ঘরে গিয়ে জলভেজা চোখ সবাইকে দেখিয়ে এসেছে এবং তৃতীয়বার হাসান হত্যা চেষ্টায় উৎসাহ যুগিয়েছে জায়েদাকে।

> চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই, একবার, দুইবার, তিনবার, না হয় চারিবারের কি পাঁচবারের বারে আর কিছুতেই রক্ষা নাই। হতাশ হও কেন?[১৩২]

মায়মুনার পুনঃপুন উৎসাহে এবং নিজের ঐকান্তিক বাসনাকে সিদ্ধ করতে জায়েদা তৃতীয়বারের মত অগ্রসর হয়। তৃতীয়বারে লক্ষ্য ছিল সোরাহীর জল এবং এজিদ প্রেরিত হীরকচূর্ণ। তৃতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। জায়েদার ইচ্ছা অপূরণ থাকে নি। পাষাণহৃদয়া সোরাহীর মুখবস্ত্রে হীরকচূর্ণ ঘষতে একবারও পবিত্র-আত্মা স্বামীর মুখপানে চায় নি। চাইলে হয়ত এ কাজ হতে পারতো না।

> দক্ষিণাহস্তে সোরাহীর মুখবস্ত্রের উপর বিষ ঘষিতে আরম্ভ করিলেন। হাসানের পদতলে যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই বার বার বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। স্বামীর মুখপানে আর চাহিলেন না। [১৩৩]

হাসানের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় জায়েদার আক্রোশের কেন্দ্রবিন্দু হাসান এবং হাসান থেকে জয়নাব। শেষতক জায়েদার সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় জয়নাব সবকিছুর জন্য দায়ী আর সপত্নীকে সবচেয়ে মারাত্মক শাস্তি দেওয়া যায় হাসানকে বধ করে; যাকে বলে সপত্নীসুখহিংসা। কিন্তু হাসানের মৃত্যুর পূর্বে যা ছিল কেবল সপত্নীসুখহিংসা, তা হয়ে যায় বাসনা। হাজার মুদ্রা ও রাজরাণী হবার যে লোভ এজিদ দেখিয়েছিল সেটা নিছক উপহার বলে মনে হলেও হাসান-এর মৃত্যুর পর সেই উপহার হয়েছে তীব্রবাসনা ও সুখ-বিলাসের নগ্ন মূর্তি-

Dhaka University Institutional Repository

আমার আশা আছে, সন্তোষ সখ ভোগের বাসনা আছে।[১৩৪]

বন্যার পানি যদি একবার বাঁধের কোনো সুড়ঙ্গ পথে অপর পাশে পৌঁছাতে পারে তাহলে আর রক্ষে নেই। বাধা না পেলে সুড়ঙ্গ পথ দ্রুত বেড়ে বাঁধটাকেই ধসিয়ে নিয়ে গেলেও যেন তার সাধ মেটে না। জায়েদা-র প্রতিহিংসা পরায়ণতা অনুরূপ হাসান কিংবা জয়নাবের বাঁধাহীনতায় বেড়ে হাসানের জীবন কেড়েছে, শেষে নিজে বাড়ি ছেড়েছে। যাবার সময়ও অপূর্ণতার আক্ষেপ করেছে এবং বাঁধাহীনতাকেই দায়ী করেছে।

১. এই একটি বড় মনে রহিল যে, এখানে থাকিয়া জয়নাবের চির-কান্না শুনিতে পাইলাম না। তাহার বৈধব্যব্রত দেখিয়া চক্ষের সাধ মিটাইতে পারিলাম না।[১৩৫]

২. কেবল তোমারি জন্য জায়েদা আজ স্বামীঘাতিনী বলিয়া চিরপরিচিত হইব। আজ আবার তোমারি জন্য জায়েদা এই স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিল।[১৩৬]

জায়েদা শেষ বাসনা চরিতার্থ করতে মায়মুনা ও মারওয়ানের সহায়তায় দামেস্কে এজিদগৃহে গমন করে। কুচক্রী এজিদ-হস্তে বিশ্বাসঘাতকদ্বয় জায়েদা ও মায়মুনা-র মৃত্যুর পূর্বে তাদের বাসনা ক্ষণকালের জন্য পুরণ হতে দেখা যায়। তারপরই এজিদ-হস্তে তাদের করুণ মৃত্যু এবং জায়েদা ও মায়মুনা খল-অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

জায়েদা মনে মনে ভাবিলেন, বস্ত্র, অলঙ্কার ও মোহর, সকলি ত পাইয়াছি রাজরাণী হওয়াই বাকী ছিল, রাজা যখন নিজেই তাঁহার বামপার্শ্বে বসিতে আদেশ করিতেছেন, তখন সে আশাও পূর্ণ হল।[১৩৭]

অষ্টাদশ প্রবাহের মধ্যেই জায়েদা মায়মুনা কাহিনি সমাপ্ত। বিভিন্ন পরিচয়ে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে জায়েদা এবং মায়মুনা তাদের উভয়কে খল বলে মনে হয়। বিশেষত যখন জায়েদা তার স্বামীকে হত্যা করে এবং মায়মুনা জায়েদাকে সাহায্য করে। তবে এটাও লক্ষণীয় যে জায়েদা এবং মায়মুনার খল হওয়ার পেছনে ভিন্ন ভিন্ন কারণ বিদ্যমান। কারণগুলোর মধ্যে একটা মাত্র বিষয়ে উভয়ের মিল রয়েছে তা হল অতৃপ্তিবোধ। মায়মুনার মূল অতৃপ্তিবোধ আর্থিক। সে দরিদ্র, উপরন্তু নিকট প্রতিবেশী, সখীরূপ জায়েদার সুখে সে হিংসাতুর হয়ে উঠেছে, তার ভেতর সাম্যবোধ জেগে উঠেছে। এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে যখন সে আর্থিক স্বচ্ছলতার আভাস পেয়েছে ও সম্ভাবনা দেখেছে তখন সে নিজেকে সম্বরণ করতে পারে নি। অপর দিকে জায়েদার সবচেয়ে বড় অতৃপ্তি হল স্বামীর অংশীদারিত্বে। তার মনে হয়েছে স্বামী হাসান তার অপেক্ষা জয়নবের প্রতি বেশি যত্নশীল এবং মায়মুনা তাকে সেটাই বার বার বুঝিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে স্বভাবতই সে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তারপরও বড় কথা হল উভয়ের ভেতর স্বল্প সময়ের জন্য হলেও অনুশোচনাবোধ জাগ্রত হয়েছিল। লেখক সেটাকে সরাসরি তুলে না ধরে স্বপ্নের ভেতর দিয়ে জায়েদা ও মায়মুনার সেই অনুশোচনাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। আর যার ভেতর কোনো বিষয়ে অনুশোচনা জন্মায় তাকে মানবীয় গুণে গুণান্বিত সাধারণ মানুষ বলেই মনে হয়।

মীর মশাররফ হোসেনঃ *বিষাদ-সিন্ধু* : এজিদ, মারোয়ান

'সেকালের পীর-বাদ ও সুফিমতবাদ -প্রভাবিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে লেখকের জন্ম।[১৩৮] কিন্তু ঔপন্যাসিক মশাররফ হোসেন পীরবাদ কিংবা সুফিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ তিনি *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসটিতে পীরবাদ ও সুফিবাদ তত্ত্বের ঊর্দ্ধে উঠে মানবীয়বোধে উত্তীর্ণ হয়ে উঠেছেন। বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক আনিসুজ্জামান মনে করেন, 'ধর্মনিরপেক্ষ প্রবল মানবীয় চেতনাই মশাররফ হোসেনকে 'বিষাদ-সিন্ধু' রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।[১৩৯] 'বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাসটিও আগাগোড়া দেখা যায় এবং খালি চোখেই; তার তীব্রতা-প্রচণ্ডতা আপনাআপনিই ধরা দেয় চোখে, সেজন্যে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করার প্রয়োজন করে না এবং সবটুকু দেখা দেয় বলেই *বিষাদ-সিন্ধু*-তে যা আছে তার সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয় অতিক্রমের কোনো চেষ্টা *বিষাদ-সিন্ধু*-র লেখক কখনোই করেছেন বলে আমার মনে হয় না। উপন্যাসটির জনপ্রিয়তা এখানেই।'[১৪০] চরিত্রগুলোর কেউই সমগ্র হিসেবে নয় বরং কয়েকটি স্পষ্ট চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরি। বৈশিষ্ট্যগুলির ধারণা প্রথাগতভাবেই নির্দিষ্ট। কোথাও কোনো দ্বিধা নেই, কোনো রহস্য নেই; সোজা কথায় অনন্য কোনো ব্যক্তি নেই। চরিত্রগুলো যেন সর্বসাধারণের কতকগুলি ধারণা বা প্রত্যাশারই প্রতিনিধিত্ব করছে। যেমন হিংসা হিংসাই, প্রতিপক্ষকে সর্বাংশে নিধন করলে তবে তার নিবৃত্তি ঘটে বা ঘটে না। হিংসার জন্ম বিশেষ নারীর প্রতি আসক্তি থেকে। যেমন ধন জন ও শক্তি থেকে দম্ভ ও দর্প বা দম্ভের আতিশয্য। যেমন প্রেমের অর্থ বাস্তব আকর্ষণ, স্থূলদেহ এবং সেই দেহের ইন্দ্রিয়ভোগ্যতা; বীরত্ব হচ্ছে প্রচণ্ড দাপট ও তলোয়ারের এক আঘাতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে অশ্বসুদ্ধ দ্বিখণ্ডিত করা অর্থাৎ বীরত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া চাই ।

এজিদ চরিত্রটি আধুনিক শিল্পকর্মের অনবদ্য দৃষ্টান্ত। ঔপন্যাসিক তার ব্যক্তিগত সহানুভূতি ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির মিশেলে এই চরিত্রটি এঁকেছেন। পূর্বসূরি কবিদের কাব্য থেকেও মশাররফ হোসন উপন্যাস রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, কিন্তু চরিত্রগুলোর মধ্যে অসাধারণত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর প্রধান প্রধান চরিত্রগুলো ইতিহাস থেকে নেওয়া, তবে প্রধান চরিত্রগুলোর অধিকাংশই ইতিহাস-বহির্ভূত-কবি-কল্পনার অপূর্ব সৃষ্টি। তাই ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও তাতে ঔপন্যাসিক মশাররফ হোসেনের নিজস্ব ভাবকল্পনা ও চিন্তাধারার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুঠে উঠেছে। ফলে কাহিনির মতো ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোকেও ইতিহাসের

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিকোণ থেকে চেনার উপায় নেই। 'ইতিহাস-প্রধান ঘটনা ও কাহিনী যতই পূরণ ও প্রাচীন হবে, তার পটভূমিকায় গ্রন্থ রচিত হলে তা লেখকের কল্পনায় ততই বিচিত্রবর্ণে অনুরঞ্জিত হয়। কাজেই, কারবালা যুদ্ধ সম্পর্কিত এই গ্রন্থ রচনায় লেখকের কল্পনা-প্রবণতার পরিচয় আছে অনেক। সুতরাং যে-দেশে ইমাম হোসেন, এজিদ মোহাম্মদ হানিফা বাস করতেন সেদেশ আরব-পারস্য নয়-কল্পনার অমরাপুরী।'[১৪১]

উপন্যাসের শুরুতে মনে হয়ছে এজিদ মানেই অবাধ্য ও অবোধ্য। কারণ এজিদ সারা জীবন কারো কোনো সদুপদেশ গ্রহণ করে নি সে পিতারও অবাধ্য। বৃদ্ধ মন্ত্রী হামানের জ্ঞানগর্ভ উপদেশকে উপেক্ষা করেছে। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এজিদ কারো আনুগত্য স্বীকার করে নি। যাঁরা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, এজিদ তাদের বন্দি না হয় হত্যা করেছে। এজিদ ছলে-বলে-কৌশলে নবীবংশের উজ্জ্বল প্রদীপগুলোকে একে একে নির্বাপিত করেছে। অন্যায় হত্যা আর নিষ্ঠুর অত্যাচার-উৎপীড়ন এজিদের সারাজীবনের পাপকর্ম ষোলকলায় পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছে। সে দ্বিধাগ্রস্তও হয়েছে। সে নিজে নিজে স্বগোক্তির মাধ্যমে অনুশোচনাও করেছে। তবে এ অনুশোচনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি। 'ব্যর্থ প্রেমিক এজিদ ক্ষমতার জোরে জয়নাবকে বন্দি করে তার দরবারে এনেও অন্তরে লালিত ক্ষোভ-বেদনা সত্ত্বেও কাপুরুষতা ও পৈশাচিকতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে নি। বরং যথার্থ মানবিক অনুভূতি নিয়ে রূপজমোহে দগ্ধ ব্যর্থ প্রেমিক এজিদের ব্যাকুল নিবেদনের স্বরূপই এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।'[১৪২] 'জয়নাবকে লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে এজিদ নবীবংশ নির্মুল করতে তার সমস্ত শৌর্যবীর্য প্রয়োগ করে। জাগতিক লাভে পরজাগতিক সুখ ও সমৃদ্ধিকে পদাঘাত করে। ফলে তার বড় ধরনের শাস্তি প্রাপ্তি ছিল কিন্তু ঔপন্যাসিক মশাররফ হোসেন আধুনিক শৈল্পিক চেতনার দৃষ্টিতে তা হতে দেন নি। বরং তাকে জাগতিক শাস্তির হাত থেকে পরজাগতিক অধীশ্বরের হাতে নিক্ষেপ করেছেন। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী এই দৃষ্টিকে একটু ভিন্নভাবে বলেছেন-'ধর্মসিন্ধুর বিষাদবেদনা অন্তরালে চাপা পড়ে গেছে। শিল্পীর অদৃশ্য মহাশক্তিই যেন নিয়তির রূপ ধারণ করে, হানিফার প্রতিহিংসা চরিতার্থতা লাভ করার প্রাকমুহূর্তে, নিজের বরপুত্র এজিদকে অন্তরীক্ষে টেনে নিয়ে গিয়ে চরম লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করল। মাইকেল-বঙ্কিমের জীবনোপলব্ধির উত্তরাধিকারী মীরের হাতে এমনি করেই পুরাতন নীতিধর্মের পরাভব ও শিল্পের বৈজয়ন্তী লাভ ঘটে।'[১৪৩]

উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় মাবিয়ার উদ্বেগ এবং এজিদের উদ্‌ভ্রান্ততা। পিতা মাবিয়া বার বার এজিদকে জিজ্ঞাসা করেও ভালোভাবে জানতে পারেন না কি হয়েছে এজিদের। একমাত্র পুত্রের রহস্যজনক আচরণ দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন মাবিয়া। বৃদ্ধ বয়সের যখন সন্তান হবার সম্ভাবনাই ছিলো না, তখন একমাত্র সন্তানকে হাতে পেয়ে ভুলে গিয়েছিলেন হযরত মুহম্মদ (স)-এর বাণী। সে সন্তান

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা মুহম্মদের বংশ নির্বংশ হবে। তার কারণ দুটো- এক. বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান, অন্ধের যষ্টি। দুই. এজিদের অপূর্ব সৌন্দর্য। সেই সন্তান যদি কষ্টে থাকে, উদ্‌ভ্রান্ত আচরণ করে তাহলে উদ্বেগ হবার কথা। কিন্তু শত জিজ্ঞাসা শেষে এজিদ শুধু যেটুকু বাবাকে বলে তা হলো:

> যদিও বহু কষ্টে 'জয়' শব্দটি উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু সে শব্দ মাবিয়ার কর্ণগোচর হইল না। কথা যেন নয়নজলেই ভাসিয়া গেল; 'জয়' শব্দটি কেবল জলমাত্রেই সার হইল। গণ্ডস্থল হইতে বক্ষঃস্থল পর্যন্ত বিষাদ-বারিতে সিক্ত হইতে লাগিল।[১৪৪]

এজিদ রাজ্য চায় না, সৈন্যসামন্ত চায় না, রাজমুকুট চায় না বলেছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই এজিদের রাজ্য ও সৈন্যসামন্ত থাকার কারণেই হয়ে উঠেছে ভয়াবহ। নারীর রূপোজ-মোহে অনেক বড় বড় মাপের মানুষও ফেঁসে গিয়েছেন। এজিদের ক্ষেত্রেও তা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এজিদ জয়নাবকে পাবার জন্য যা করেছে, তা ইতিহাসে বিরল। এক জয়নাবকে পাবার জন্য একটা বংশের অধিকাংশ মানুষকে হত্যা, হাজার হাজার সৈন্য হত্যা- ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ট্রয় নগরী ধ্বংসের কাহিনিকে মনে করিয়ে দেয়। যদিও এজিদ বলেছে-

> এজিদ রাজ্যের প্রয়াসী নহেন, সৈন্যসামন্ত এবং রাজমুকুটের প্রত্যাশী নহেন, রাজসিংহাসনের আকাঙ্ক্ষীও নহেন।[১৪৫]

বিষাদ-সিন্ধু কোনো ধর্মীয় আখ্যান নয়, উপন্যাস। উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করলে, মাবিয়াকে ব্যর্থ মনে হয়। এক জন পিতা হিসেবে সন্তানের মনোবেদনাকে উপশম করার জন্য তিনি তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। করলে এজিদকে এই ধ্বংসযজ্ঞে মাত্‌তে হতো না। এজিদ আকার-ইঙ্গিতে বার বার বোঝানো সত্ত্বেও মাবিয়া এজিদের মনোঃকষ্টের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি। এবং কোনো প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করতে পারেন নি। তিনি ইচ্ছে করলে কোনো একটা পদক্ষেপ নিতে পারতেন। বিশেষত, আবদুল জাব্বার যখন জয়নাবকে ত্যাগ করে তখনও তিনি একটি পদক্ষেপ নিতে পারতেন কিন্তু এক জন সেনানায়ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেই খবর রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং এজিদের অপরাধকর্মের জন্য তিনিও অনেকাংশে দায়ী। যখন এজিদ বলেছে-

> আমি অবোধ নই; কিন্তু আমার অন্তর যে মোহিনী-মূর্তির সুতীক্ষ্ণ নয়ন-বাণে বিদ্ধ হইতেছে, সে বেদনার উপশম নাই।[১৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃত্বে অন্ধ হয়ে অনেক মাতা তার ছেলেমেয়ের বিশেষ করে ছেলের নানা অপরাধ ও অপকর্মকে মেনে নেন, ধামাচাপা দেন অথবা তাদের সাহায্য করেন। এর ফলে কিন্তু সমাজে অনেক অপরাধ সংঘটিত হয় এবং তার শুভ সূচনা হয় মাতৃহাত কিংবা গৃহ হতে। অর্থাৎ অপরাধ প্রবণতার একটা বড় অংশ সূচিত হয় পরিবার থেকে। সবসময় মাতার হাতে হয় তা নয়, পিতার হাতেও হতে পারে। তবে মাতার হাত থাকার সম্ভাবনা কিছুটা বেশি। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসটি। মাবিয়া মহিষী প্রথম দিকে এজিদের পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। ছেলের পাগলামীকে তিনি প্রতিরোধ না করে তাকে সাহায্য করেছেন, মাতৃত্বে অন্ধ হয়ে।

> দেখুন মহারাজ! এজিদ যে ফাঁদে পড়িয়াছে, সে ফাঁদে জগতের অনেক ভালো ভালো লোক বাঁধা পড়িয়াছেন। শত শত মুনি-ঋষি, ঈশ্বরভক্ত, কত শত মহাতেজস্বী জিতেন্দ্রিয় মহাশক্তিবিশিষ্ট মহাপুরুষ এই ফাঁদে পড়িয়া তত্ত্বজ্ঞান হারাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই।[১৪৭]

আমাদের দেশে সাধারণত দুই ধরনের পরিবার প্রথা লক্ষ করা যায়। মাতৃতান্ত্রিক এবং পিতৃতান্ত্রিক। মাতৃতান্ত্রিকে মাতা প্রধান এবং পিতৃতান্ত্রিকে পিতা প্রধান। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সংখ্যা ৯৯.৯৯ ভাগ। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও এখানে পারিবারিক ব্যবস্থায় উগ্রবাদিতার পরিমাণ কম। বেশিরভাগ পরিবারের সহনশীল পারিবারিক ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং পরিবারের কর্তা পিতা হলেও অনেকক্ষেত্রে মাতাও অনেক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কিংবা দিতে পারেন। ঐতিহাসিক সত্য বলে, তুলনামূলক ইসলাম ধর্ম নারীর অধিক মূল্যায়ন করে। *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসের সময়কে বলা হয়ে থাকে সত্যের যুগ কিংবা ইসলামের যুগ। তাই সেখানে অধিপতিরা পত্নীদের যথার্থ সম্মানের সঙ্গে কথা বলা এবং তাদের অনুরোধকে উপেক্ষা না করে মূল্যায়ন করার একটা রীতি তখন প্রচলিত ছিল। ফলে, এজিদমাতা পিতা মাবিয়াকে এজিদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার অনুরোধ করলে তিনি সেটা পালন করেছেন। এজিদের দায়িত্ব মহিষীর হাতে ন্যস্ত করেছেন। মহিষী মাবিয়াকে বুঝিয়েছেন এই বলে-

> মহিষী বলিলেন, "আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না, কিছু বলিতেও হইবে না, কিন্তু কোনো কার্যে বাধা দিতেও পারিবেন না। মারওয়ানের সঙ্গে মরামর্শ করিয়াই আমি সকল কার্য করিব।[১৪৮]

বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাসের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র 'মারওয়ান'। মারওয়ান-এর ওপর নির্ভর করে *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসের কাহিনি বহুমাত্রিকতা পেয়েছে। কেবল এজিদ চরিত্র থাকলে কাহিনি একঘেয়ে হবার একটা সম্ভাবনা ছিল। সেই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতেই যেন ঔপন্যাসিক মারোয়ানকে উপস্থিত করেছেন। মারওয়ানের উপস্থিতি কাহিনিকে করেছে গতিশীল ও প্রাণচাঞ্চল্যপূর্ণ। মারওয়ান

Dhaka University Institutional Repository

এজিদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। কিন্তু এজিদের অনেকটা ডানহাত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজাদের আমলে দেখা যায়, সেখানে এক জন ভাঁড় থাকতেন। তাদের কাজ ছিল হাসির ছলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা। তারা রাজমহলে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হতেন। পরামর্শক হিসেবে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা ছিলেন, যাদেরকে উপদেষ্টা বলা হয়ে থাকে। *বিষাদ-সিন্ধুতে* সেরূপ ভাঁড় কেউ ছিলেন না। আবার পরামর্শক হিসেবে প্রধানমন্ত্রী থাকলেও এজিদ তার পরামর্শ গ্রহণ করেন নি। মারওয়ানের উপস্থিতি একই সঙ্গে ভাঁড় এবং মরামর্শকের ভূমিকায়। ঔপন্যাসিক তার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে-

> মারওয়ান যদিও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, কিন্তু এজিদের বুদ্ধি, বল, সহায়, সাহস যত কিছু কার্য সকলই মারওয়ান। প্রধানমন্ত্রী হামান কেবল রাজকার্য ব্যতীত সাংসারিক অন্য কোনো কার্যে মারওয়ানের মতে বাধা দিতে পারিতেন না; কারণ তিনি এজিদের প্রিয়পাত্র। সকল সময়েই সকল বিষয়েই মারওয়ানের সহিত এজিদের পরামর্শ হইত। সে পরামর্শের সময় অসময় ছিল না। কি পরামর্শ তাহা তাঁহারাই জানিতেন।[১৪৯]

সকল কাজের কাজি মারওয়ান। বলা চলে, এজিদের একমাত্র পরামর্শদাতা মারওয়ান। কারণ এজিদ বৃদ্ধ পিতা, বয়স্ক প্রধানমন্ত্রী হামান- কারো পরামর্শ গ্রহণ করে নি। জয়নাবকে পাওয়ার জন্য এজিদের যে কূটকৌশল তা থেকে শুরু করে যুদ্ধের কূটকৌশল পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে মারওয়ানের হাতে। জাব্বারকে রাজপ্রাসাদে তলব, তাকে অর্থ ও মাবিয়া তনয়া গ্রহণের লোভ দেখানো এবং বিনিময়ে জয়নাবকে তালাক প্রদানের মরামর্শ দান সবক্ষেত্রেই মারওয়ানের হাত রয়েছে। যদিও উপন্যাসে সে বিষয়টি প্রকাশিত সত্য নয় কিন্তু মারওয়ান যে জড়িত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা, জাব্বারকে প্রলুব্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে, তিন জন ব্যক্তিকে ঘিরে এজিদ, এজিদমাতা ও মারওয়ান। বাইরের কেউ সে বিষয়ে অবগত ছিল না, এমনকি রাজ্যপ্রধান এজিদপিতা মাবিয়াও না। উপরন্তু জাব্বারের কাছে রাজপ্রাসাদে আগমনের জন্য প্রেরিত পত্রও ছিল মারওয়ানের নাম ও পদবি স্বাক্ষরিত।

> সম্ভ্রান্ত আবদুল জাব্বার!
>
> তোমাকে জানান যাইতেছে যে, দামেস্কাধিপতি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে স্মরণ করিয়াছেন। অবিলম্বে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজপ্রসাদলাভে সৌভাগ্য জ্ঞান কর।
>
> প্রধান উজির
>
> মারওয়ান।[১৫০]

প্রতিটি পরিবারেই দেখা যায় মা-বাবা ছেলে সন্তান প্রার্থনা করেন। তারা মনে করেন বৃদ্ধ বয়সে তারাই হবে তাদের পথের লাঠি। বিপদ-আপদে তারাই হবে তাদের ভরসাস্থল। বৃদ্ধ মা-বাবাকে

Dhaka University Institutional Repository

সেবাযত্ন করে আদায় করে নেবে স্বর্গের চাবি। কিন্তু খুব বেশিক্ষেত্রেই সে সুপ্তবাসনা সফলতার মুখ দেখতে পারে না। তাও মা-বাবা পুত্র সন্তান চান। মাবিয়ার ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়, তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয় না। তার বাসনা ছিল এজিদ হবে তাঁর যথার্থ উত্তরাধিকারী। যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক। কিন্তু বাস্তবতা দাঁড়ায় অন্যরকম। দেখা যায়, মাবিয়া ঘোরতর অসুস্থ। তাঁর বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। এমন মুহূর্তেও বাবার জন্য এজিদের মনে কোনো ভাবনার উদ্রেগ হয় নি। বাবার জন্য কোনোরকম দুঃশ্চিন্তা করতে দেখা যায় নি। ছেলে হিসেবে বাবার প্রতি কোনোরকম দায়িত্ব কিংবা কর্তব্যবোধ তার মধ্যে লক্ষ করা যায় না। বাবা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখনও তার দিবাস্বপ্ন বাবাকে ঘিরে নয়, জয়নাবকে ঘিরে, জয়নাবের সৌন্দর্যকে ঘিরে।

> মাবিয়া পীড়িত। তাঁহার ব্যাধি সাংঘাতিক, বাঁচিবার আশা অতি কম। এজিদের সে দিকে দৃক্‌পাত নাই, পিতার সেবা-শুশ্রূষাতেও মন নাই; প্রস্ফুটিত গোলাপদলবিনিন্দিত জয়নাবের সুকোমল বদনমণ্ডলের আভা, সে আয়তলোচনার নয়নভঙ্গির সুদৃশ্য, -দিবারাত্রি তাঁহার অন্তরপটে আঁকা। ভ্রূযুগলের অগ্রভাগ, যাহা সুতীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় অন্তর ভেদ করিয়া অন্তরে রহিয়াছে, দিবারাত্রি সেই বিষেই বিষম কাতর। সেই নাসিকার সরলভাবে সর্বদাই আকুল। ঈষৎলোহিত অধরোষ্ঠ পুনঃ পুনঃ দেখিবার আশা সততই বলবতী। আজ পর্যন্ত চিকুরগুচ্ছের লহরীশোভা ভুলিতে পারেন নাই।[১৫১]

মারওয়ান মাবিয়ার প্রধান উজির হলেও এজিদের মদদ্‌পুষ্ট। এক্ষেত্রে মারওয়ানের দূরদৃষ্টির পরিচয় মেলে। কারণ মাবিয়া অসুস্থ, বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ক্ষীণ। সে জানে মাবিয়া মারা গেলে রাজ্যপ্রধান হবে এজিদ। তাই সে মাবিয়ার নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও কাজ করেছে এজিদের হয়ে, প্রধানমন্ত্রী হামানকে উপেক্ষা করে। আবদুল জাব্বারকে পত্র লিখা শুধু নয়, পুরো বিষয়টির তদারকি করেছে মারওয়ান। এজিদ নয় বরং স্বয়ং বাদশাহ মাবিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে আবদুল জাব্বারকে প্রতারিত করেছে। তার বরাত দিয়ে তাকে জানিয়েছে, বাদশাহের ইচ্ছা তাকে প্রয়োজনীয় সম্পত্তি প্রদান করা হবে এবং 'অদ্বিতীয় রূপযৌবনসম্পন্না' রাজকুমারী সালেহার সঙ্গে তাকে বিবাহ দিয়ে তাকে রাজ্যের অর্থাৎ দামেস্কনগরীর মধ্যে সম্মানের সঙ্গে স্থায়ীভাবে আশ্রয় দেওয়া হবে।

> মন্ত্রী মারওয়ান বাদশাহের প্রতিনিধিস্বরূপ বলিতে লাগিলেন, "মাননীয় আবদুল জাব্বার সাহেব! আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, রাজসংসার হইতে রাজোচিত আপনার নিত্য নিয়মিত ব্যয়োপযোগী সম্পত্তি প্রদানপূর্বক অদ্বিতীয় রূপযৌবনসম্পন্না বহুগুণবতী নিষ্কলঙ্কচন্দ্রাননা মহামাননীয়া- রাজকুমারী সালেহার সহিত শাস্ত্রসহ পরিণসূত্রে আবদ্ধ করিয়া এই দামেস্কনগরে আপনাকে স্থায়ী করি।[১৫২]

Dhaka University Institutional Repository

'সেখানে আছে এজিদের মতো প্রবল পুরুষ, প্রেমভিক্ষুক করুণ যুবক-প্রচণ্ড প্রতাপে, নিষ্ঠুর নির্যাতন, ঈর্ষা, হিংসা, কূট ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনা প্রবণতায় যে মনে করিয়ে দেয় মহাভারতের দুর্যোধন ও রামায়ণের রাবণ চরিত্রের কথা, যে আবার মুহূর্তেই নেমে আসে মাটির সাধারণ মানুষের করুণ নিঃসহায়তায়, ব্যর্থ প্রেমে-নিদারুণ হৃদয়যন্ত্রণায় যেন জনতার যে-কোনো একজন।'[১৫৩] উদ্ধরণচিহ্ন সংশ্লিষ্ট বক্তব্যে দুটো চরিত্রের কথা প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে। এক. এজিদ এবং অপরটি সঙ্গত কারণেই মারওয়ান। উপন্যাস *বিষাদ-সিন্ধু*-তে সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র এজিদ। যার ভেতর নায়কের বৈশিষ্ট্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা সার্থকতা লাভে ব্যর্থ হয়েছে। প্রেমের যে করুণ আরতি সেখানে প্রকাশিত হয়েছে তা বিরল। প্রেম নিবেদন বা পাওয়ার ইচ্ছা এই বৈশিষ্ট্যটি নায়কোচিত কিন্তু পাওয়ার ও চাওয়ার পদ্ধতির কারণে তা অনেক সময় খলনায়কে পরিণত হয়ে থাকে। অন্যদিকে প্রেমের আকুতি প্রবল না হওয়া সত্ত্বেও চাওয়ার পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হওয়ায় তা নায়কের মর্যাদা পেয়ে থাকে। উপরন্তু প্রচলিত রীতি-নীতিতে অনেক সময় নায়ক ও খলনায়ক হওয়া নির্ভর করে নায়িকার চাওয়ার ওপর। তাই জিদ, নিষ্ঠুরতা, হিংসা এই শব্দগুলো নায়ক কিংবা খলনায়কের ক্ষেত্রে একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। এজিদের ক্ষেত্রে শব্দগুলো বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

> যদি আমি মাবিয়ার পুত্র হই, তবে হাসান-হোসেনের বংশ একেবারে নিপাত না করিয়া জগৎ পরিত্যাগ করিব না। শুধু হাসানের মৃতদেহ দেখিয়াই যে, সে মহাগ্নি নির্বাপিত হইবে তাহাও নহে। মোহাম্মদের বংশের একটি প্রাণী বাঁচিয়া থাকিতে এজিদ ক্ষান্ত হইবে না; তাহার মনোবেদনাও মন হইতে বিদূরিত হবে না।[১৫৪]

মাবিয়া জীবিত থাকা পর্যন্ত মারওয়ান ছিলেন প্রধান উজির। কিন্তু তার মৃত্যুর পর মারওয়ানকে ঔপন্যাসিক নিজেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ প্রধানমন্ত্রী হামান নামমাত্রই প্রধানমন্ত্রী, প্রকৃত মন্ত্রীর ন্যায় দায়িত্ব পালন করেছে মারওয়ান। যথার্থ কূটনীতিক ও তোষামদকারী হিসেবে মারওয়ানকে বার বার পাওয়া যায়। মাবিয়া জীবিত থাকতে যে এজিদের প্রিয়ভাজন ছিল, তার মৃত্যুর পর সে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। রাজ্যের সবাই সেটা পূর্ব থেকেই জানতো বলে কাউকে তার প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না। এক জন তোষামদকারী ব্যক্তি হিসেবে মারওয়ান এজিদের মসনদে আসন গ্রহণ করার পর তার বক্তব্য মতে, উপযুক্ত পাত্রে রাজসিংহাসন যথার্থ সুশোভিত হয়েছে। এবং সেটা তাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের দিন। উল্লেখ্য যে, মাবিয়া জীবিত থাকা অবস্থায় মারওয়ানকে মাবিয়ার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে দেখা না গেলেও পারিবারিকভাবে তার একটা বিশেষ কদর ছিল। যা পূর্বে দেখা গেছে, মাবিয়াস্ত্রীর বক্তব্যে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর মারওয়ানই হয়ে উঠেছে রাজ্যের অন্যতম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

> প্রধানমন্ত্রী মারওয়ান দরবারস্থ সম্ভ্রান্ত-মহোদয়গণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আজ আমাদের কী সুখের দিন, আজ আমরা এই দামেস্কের সিংহাসনে নবীনরাজের অধিবেশন দেখিলাম। উপযুক্ত পাত্রেই আজ রাজসিংহাসন সুশোভিত হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ! আজ হইতে আপনাদের দুঃখ ঘুচিল। দামেস্করাজ্যে আজ হইতে যে সুখ-সূর্যের উদয় হইল, তাহা আর অস্তমিত হইবে না। আপনারা এই নবোদিত সূর্যকে কায়মনে পুনরায় অভিবাদন করুন![১৫৫]

এজিদ পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহন করার পরপরই কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। প্রথমত, তার মনে হয় কাসেদ মোস্‌লেম তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কারণ কাসেদ তার প্রস্তাব জয়নাবকে না দিয়ে হাসানের প্রস্তাব জয়নাবকে দিয়েছে। যদিও বিষয়টি তেমন ছিল না। তিন জন প্রার্থীর এজিদ, আক্কাস ও হযরত হাসান (রা)-এর প্রস্তাবনা নিয়ে সে গিয়েছিল। এখানে দুটো ভুল দুই দিক থেকে সংঘটিত হয়েছে। এক. মোস্‌লেম বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়েছে। তার বোঝা উচিত ছিল সে এজিদের পয়গাম নিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে তিনটি পয়গাম নিয়ে যাওয়া তার উচিত হয় নি। কারণ সে এজিদের বেতনভুক্ত কর্মচারী। সে কেন অন্যের পয়গাম নিয়ে যাবে। যদিও দামেস্ক নগরী হযরত হাসান (রা)-এর শাসনাধীন রাজ্য ছিল কিন্তু যেহেতু এজিদ তা স্বীকার করে না, সুতরাং তার রাজ্যের প্রজা হয়ে অন্যের পয়গাম নিয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে পড়ে। সেদিক বিবেচনা করলে মোসলেম অপরাধী। দুই.এজিদ আত্মস্বার্থ চরিতার্থে এতটাই মগ্ন ছিলো যে, সত্য-মিথ্যা প্রভেদ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং সে চেষ্টাও তাকে করতে দেখা যায় নি। এক জন রাজ্যশাসক হয়ে তার দূরদৃষ্টির অভাব মেনে নেয়া কষ্টসাধ্য। তাছাড়া সে ব্যর্থ প্রেমের দাহনে এতটাই দগ্ধ যে, সত্যমিথ্যা বিচারের কথাটা তার মাথায় না এসে জিঘাংসাটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। তাই সে বলেছে, "আমার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। যে ইহার বিরোধী হইবে, তাহারও ঐ শাস্তি।"[১৫৬] জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে এজিদ মোস্‌লেমের যে প্রাণদণ্ড কার্যকর করলো এবং তা রাজদরবারে সেটা সত্যিই লজ্জাজনক।

> এজিদ পুনর্বার বলিতে লাগিলেন, এই মিথ্যাবাদী বিশ্বাসঘাতক, আমার বিবহ পয়গাম লইয়া জয়নাবের নিকট গিয়াছিল। আমার পয়গাম গোপন করিয়া আমার চিরশত্রু হাসান, যাহার নাম শুনিলে আমার দিগবিদিক জ্ঞান থাকে না, সেই হাসানের পয়গাম জয়নাবের নিকট বলিয়া, জয়নাবের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছে।[১৫৭]

এজিদের সিংহাসনে আরোহন করার পর, দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল- হাসান ও হোসেনের কাছে কর চেয়ে পত্র প্রেরণ। মাবিয়া বেঁচে থাকতে নিজেকে হাসান-হোসেনের প্রজা ভাবতেন এবং পুত্র এজিদকেও তা তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু এজিদ তা আমলে নেয় নি। পিতা বেঁচে থাকতেই যে হাসান-

Dhaka University Institutional Repository

হোসেনের বশ্যতা স্বীকার করে নি, পিতার মৃত্যুর পর তো বশ্যতা স্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে এর পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে-

এক. হাসান-হোসেন অত্যন্ত গরীব- চালচুলোহীন।

দুই. হাসান-হোসেনের রাজার মতো রাজকীয় কোনো বিষয় নেই- আর্থিক কিংবা পোষাক-পরিচ্ছদে।

তিন. রাজ্যসরকারের মতো কোনো গঠনতন্ত্রও নেই- উজির, নাজির, কতোয়াল কিংবা কোনো সৈন্যবাহিনী।

চার. এজিদের স্বপ্নজালকে ছিন্ন করে জয়নাবকে হাসানের বিবাহ।

উপর্যুক্ত চারটি কারণের মধ্যে প্রথম তিনটি মূল কারণ ছিল হাসান-হোসেনের কাছে বশ্যতা স্বীকার না করার। চতুর্থ কারণটি ছিল তাদের প্রতি এজিদের হিংসা ও রাগের কারণ। তার রাগের উপযুক্ত কারণ বটে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সত্য হলো এই কারণটি হাসানের অজানা ছিল। আবার, এজিদেরও অজ্ঞতা এটাই যে, যার বিরুদ্ধে এজিদ সারাক্ষণ মানসিকভাবে লড়ছে, সেই ব্যক্তিটিও সেটা জানছে না। কিন্তু এজিদ এককভাবে তার প্রতিহিংসার অনলে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হয়ে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছে।

১. '... আমি যার জন্য এতদিন এত কষ্ট সহ্য করিলাম, সেই জয়নাবকে হাসান বিবাহ করিবে? এজিদের চক্ষে তাহা কখনোই সহ্য হইবে ন। এজিদের প্রাণ কখনোই তাহা সহ্য করিতে পারিবে না।[১৫৮]
২. ছলে হউক, বলে হউক, কৌশলে হউক, কিংবা অর্থেই হউক, প্রথমে হাসানের জীবন-প্রদীপ তোমার হস্তে নির্বাণ হওয়ার শুভ সংবাদ আমি শুনিতে চাই। হাসানের প্রাণবিয়োগজনিত জয়নাবের পুনর্বৈধব্যব্রত আমি সানন্দচিত্তে শুনিতে চাই।[১৫৯]

সিংহাসনে আরোহন করার পর, এজিদের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল কর চেয়ে হাসানের কাছে পত্র প্রেরণ। এজিদ মদিনার শাসনব্যবস্থা না জেনে হাসানের কাছে কর দাবি করে যে পত্র প্রেরণ করে, তাকে অনেকটা হটকারী সিদ্ধান্তই বলা চলে। কারণ গঠনতন্ত্র ছাড়া যে রাজ্য চলতে পারে, রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা হতে পারে তা তার অজানা ছিল। বিশেষ করে, ইসলামী শাসনব্যবস্থা যে এমনই যেখানে রাজা আছে কিন্তু রাজা সম্পত্তির অধিকারী নয়, রাজার লোকবল সাধারণ জনগণ। এই অজ্ঞতার ফলাফল দেখা যায়, এজিদের প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা, সৈন্যবাহিনী প্রেরণ এবং যুদ্ধে পরাজয়। মারওয়ানও তা উপলব্ধি করতে পারে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে। সে মন্তব্য করে মদিনার লোকের এত শক্তি সেটা তার জানা ছিলো না বলে। রাজ্যের মসনদে বসার পর এজিদ অনেকটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে। যার বাবা হাসান-হোসেনকে পূজা করতো, মান্য করতো, প্রভু বলে স্বীকার করতো তাকে সে এক মুহূর্তেই ভুলে গিয়ে প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে ওঠে। মক্কা, মদিনা, দামেস্কসহ কয়েকটি অঞ্চলের যে রাজা তাকে হঠাৎ করেই সে অস্বীকার করে আত্মগর্বে বলীয়ান হয়ে সে দুঃসাহসিক পত্র প্রেরণ করে ভূত ও

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যৎ না ভেবে। এবং পূর্বের পত্রের ন্যায় এই পত্রটিও লিখে মারওয়ান এজিদের পক্ষ থেকে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পত্রে স্বাক্ষরিত হয় মারওয়ানের নাম। পরতে পরতে ধৃষ্টতার ছাপ।

> হাসান! হোসেন!
> তোমরা কি এ পর্যন্ত শুন নাই যে, মহারাজাধিরাজ এজিদ নামদার মধ্যাহ্নকালীন সূর্যসম দামেস্কসিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। অধীনস্থ রাজা প্রজা মাত্রেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া কেহ বা উপঢৌকন প্রেরণ, কেকহ বা স্বয়ং আসিয়া অবনতশিরে চির-অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন; আপন আপন রাজ্যের নির্ধারিত দেয় করে দামেস্ক রাজভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। তোমাদের মক্কা-মদিনার খাজনা আজ পর্যন্ত না আসিবার কারণ কি? স্বয়ং মহারাজাধিরাজ দামেস্কাধিরাজের দরবারে উপস্থিত হইয়া, নতশিরে ন্যূনতা, স্বীকারে রাজসিংহাসন চুম্বন কর। আর এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া এজিদ নামদারের নামে খোৎবা পাঠ করিবে, ইহার অন্যথাচরণ হইলেই রাজদ্রোহীর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।
> মারওয়ান
> প্রধানমন্ত্রী[১৬০]

আনুগত্য বা ভক্তি বলতে যা বোঝায় তার যেমন অন্ত নেই, নিষ্ঠুরতা এবং পৈশাচিকতারও তেমনি অন্ত নেই। বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং স্বার্থত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্তের পাশাপাশি প্রতিহিংসা এবং বিশ্বাসঘাতকতার চরম উদাহরণ। ভূমিকা এজিদ প্রথম বার মদিনায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে পরাজিত হবার পর আশ্রয় নেয় ছলতার। সে জন্য সে পুনরায় দায়িত্ব দেয় মারওয়ানকে। মারওয়ান এজিদ মদদ্‌পুষ্ঠ কেবল নয়, সে পদে পদে দায়িত্বশীলতা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছে। সে বেশ কয়েকবার ছদ্মবেশ ধারণ করে চাতুর্য ও ছলনার আশ্রয় নিলেও এজিদের সঙ্গে তা করে নি, করেছে প্রতিপক্ষ হাসান, হোসেন ও মহাবীর হানিফার সঙ্গে। প্রভু এজিদের সঙ্গে সে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। বরং প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে সে এজিদের অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালনে নিজের জান বাজি রাখতেও পিছপা হয় নি।

১. উপাসনা সমাধা হইবামাত্রই মারওয়ান বলিলেন, "হযরত! আমরা কোন বিশেষ গোপনীয় তত্ত্ব জানাইতে এই নিশীথ সময়ে আপনার নিকট আসিয়াছি।"[১৬১]
২. একা যাইব না, অলীদকে সঙ্গে করিয়া ছদ্মবেশে-পথিক সাজে-সামান্য পথিক-সাজে বাহির হইব! [১৬২]

মারওয়ান এজিদের বিশ্বস্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপালন করেছে। কিন্তু সে কখনো সেনাপ্রধান হয়ে দায়িত্বপালন করে নি। মাবিয়ার সময়েও সে সেনাপ্রধান হয় নি কখনো। কিন্তু এজিদ হাসান বধে তাকেই সেনাপতি হিসেবে নির্বাচিত করে। এর কারণ মারওয়ান এজিদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর, পরামর্শদাতা এবং সে তার বাল্যসহচর এবং তাকেই এজিদ সবচেয়ে ভরসা করেছে। ইতঃপূর্বে

Dhaka University Institutional Repository

মারওয়ানই এজিদকে জয়নাব পাবার আশা জাগ্রত করেছিল, সুতরাং তাকে সেনাপতি হিসেবে প্রেরণ করাই এজিদ যথোপযুক্ত মনে করেছে। এজিদ কিংবা মারওয়ান জানতো মদিনায় হাসান-হোসেন অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা কিন্তু কতটা জনপ্রিয়, তাদের জন্য মদিনার সাধারণ জনগণ কতটা করতে পারে সে সম্পর্কে তাদের জানা ছিল না। তাইতো মারওয়ানের নেতৃত্বে প্রেরিত বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়েও এক দিনের মধ্যে পরাজিত হয় সাধারণ জনগণের হাতে। বীরযোদ্ধা হিসেবে ছিলেন কেবল হাসান, হোসেন ও আবদুর রহমান। তারা তাদের পুরো সক্ষমতা প্রদর্শনের পূর্বেই সাধারণ জনগণের হাতে এজিদ সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়। পৃষ্ঠ রক্ষা করেই কেবল হাসান, হোসেন ও আবদুর রহমানকে ক্ষান্ত থাকতে হয়। মারওয়ান ভয়াবহ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অবাক হয়ে পড়ে, মুখে বলে-

> কেবল মারওয়ান বলিলেন, ভাই অলীদ! মদিনাবাসীর অস্ত্রে এত তেজ, হোসেনের এত পরাক্রম, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।[১৬৩]

সম্যক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারওয়ান স্বধর্মে ফিরে আসে। স্বধর্ম বলতে প্রবঞ্চনা, প্রতারতা, ছল ও চাতুর্যকে বোঝানো হয়েছে। মারওয়ান প্রভুর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেছে। পরাজিত মুখে ফিরে যায় নি দামেস্কে। পাহাড়ের পাদদেশে লুকিয়ে থেকে পরিকল্পনা করেছে কীভাবে হাসানকে বধ করা যায়। পাঠকদৃষ্টিতে তার অবলম্বিত পথ অগ্রহণযোগ্য কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তার দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠাই সেখানে ফুটে উঠেছে। যেহেতু সম্যক যুদ্ধে লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হয়েছে এবং মদিনাবাসীর পরাক্রম নিজ চোখে অবলোকন করেছে তাই সে বুঝতে পেরেছে সামনাসামনি যুদ্ধে হাসান-হোসেনকে পরাজিত করা যাবে না। বিশেষ করে মদিনায় তো অবশ্যই না। ফলে, সে আশ্রয় খুঁজেছে শঠতার, গোপন হত্যার। কারণ সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রভু এজিদের কাছে। হাসানের মুণ্ডপাত না করে সে দামেস্কে ফিরবে না। তাই সে খোঁজ করেছে এক জন আততায়ীর। যাকে ব্যবহার করে সে তার গোপন উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে। একটা পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত লোকের সন্ধানও মেলে। সেই ব্যক্তি মায়মুনা। দেখতে বৃদ্ধ মনে হলেও সে প্রকৃত অর্থে বৃদ্ধ নয় কিন্তু দারিদ্র্য তার নিত্যসঙ্গী এবং অভিভাবকশূন্য। তার যোগাযোগ আছে হাসানের বাড়ির সঙ্গে এবং যাতায়াতও হয় প্রায়ই সেখানে। বিশেষ করে, জায়েদার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও রয়েছে। স্বর্ণমুদ্রার লোভ ও খাওয়াপড়ার নিশ্চয়তার চক্রে সে রাজি হয় মারওয়ানের উদ্দেশ্য হাসিল করার পথে কাজ করতে। *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসে মারওয়ানের এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য। মারওয়ান কর্তৃক সংঘটিত ঘটনাটি নির্মম হলেও এজিদের জন্য তা সততা, বিশ্বস্ততা, দায়িত্বশীলতা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা, কৌশলতা এবং প্রভুভক্তির নিদর্শন।

> কথার ভাব বুঝিয়া কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা মায়মুনার হস্তে দিয়া মারওয়ান বলিলেন,"যদি কৃতকার্য হইতে পার, সহস্র সুবর্ণ মোহর তোমার জন্য ধরা রহিল।[১৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

এজিদের পরাজয় অনেক আগেই নিশ্চিত হতে পারতো, কেবল যদি মারওয়ান তার সুহৃদ বন্ধুবর না হতো। তার মন্ত্রণা, তার কৌশল, চাতুর্য এবং দূরদর্শিতার কারণে তা কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। সুতরাং কোনো কোনো স্থলে মারওয়ানকে এজিদ অপেক্ষা উজ্জ্বল মনে হয়। তার বিচারিক যে দক্ষতা ছিল তা থাকা প্রয়োজন ছিল এজিদের। মারওয়ান সম্যকযুদ্ধে সেভাবে কখনো অংশ গ্রহণ না করলেও সে কাছে অথবা দূরে থেকে যে নির্দেশনা দিয়েছে তা অনেকাংশে সার্থকতা লাভ করেছে। তাই এ ক্ষেত্রে মারওয়ান চরিত্রটি সার্থক ও যথার্থ।

১. হানিফার মদিনা আগমনের পূর্বেই সৈন্যগণ মদিনা-প্রবেশপথে অবস্থিতি করিয়া, হানিফার গমনে বাধা দিবে, ইহাই মারওয়ানের মন্ত্রণা।[১৬৫]
২. এজিদ মারওয়ানের কথায় ক্ষান্ত হইল। সে দিন আর যুদ্ধ করিল না। সে দিনের মত শেষ বাজনা বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া মারওয়ানসহ শিবিরে আসিল।[১৬৬]

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, Everything is fair Love and War. কিন্তু জয়নাবকে পাওয়ার যে প্রবল আকর্ষণ তা সত্যিকারের প্রেম কিনা সে বিষয়ে সমালোচকদের সমালোচনা রয়েছে। যদি ' Love at first-sight' হয় তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু যদি তা কেবল সৌন্দর্যের পিপাসা কিংবা কামরস হয়, তাহলে তা আরো বেশি সমালোচনার তোপে পড়বে। এবং সেখানে *বিষাদ-সিন্ধু*'র অঢেল রক্তপাত কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না, হতে পারে না। যদি Love at first-sight' হয় তাহলে তা সমালোচকদের কিছুটা হলে সমবেদনার আশ্রয় পেতে পারে। তারপরেও কথা থেকে যায়, প্রেমের জন্য এতগুলো প্রাণের বলি, এত রক্তপাত, এত ধ্বংসযজ্ঞ মেনে নেওয়া যায় না।

> বিধবা হইয়াও হোসেনের বলে এজিদকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন, এখন সে হোসেন কোথা? আর হাসানই-বা কোথা? আজি পর্যন্তও কি আপনার অন্তরের গরিমা চক্ষের ঘৃণা অপরিসীমভাবেই রহিয়াছে? আজ কার হাতে পড়িলেন, ভাবিয়াছেন কি? দেখুন দেখি চেষ্টায় কি না হয়? ধন, রাজ্য, রূপ তুচ্ছ করিয়াছিলেন; একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, রাজ্যে কি না হইল? বিবি জয়নাব![১৬৭]

উপর্যুক্ত বক্তব্য জয়নাবের সঙ্গে এজিদের একমাত্র বক্তব্য। যখন জয়নাব এজিদের করায়াত্ত হয়। কিন্তু এই বক্তব্যের মধ্যে কোনো প্রেমনিবেদনের চিহ্ন পাওয়া যায় না। তবে এটা বোঝা যায় যে, সকল ঘটনার সূত্রপাত জয়নাবকে ঘিরে, তাকে পাবার জন্য। কাছে পেয়েও প্রেম নিবেদনের পরিবর্তে, তাকে ঘিরে এজিদের কণ্ঠে যুদ্ধজয়ের বিজয়োল্লাসই প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, প্রেম থাকলেও তা যুদ্ধের মত প্রেমহৃদয়ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রেমবাণীর পরিবর্তে তার বাচনভঙ্গিতে অহংবোধ জেগে উঠেছে । এই অহংবোধ কেবল জয়নাবকে ঘিরে নয়, বরং তার

Dhaka University Institutional Repository

সৈন্যবাহিনীকে ঘিরে, মোহাম্মদ হানিফা, ওমর আলী ও কিশোর হোসেন তনয় জয়নালের প্রতিও বর্ষিত হয়েছে।

১. এজিদ বলিলেন, "মারওয়ান! মোহাম্মদ হানিফা একাদিক্রমে শত বর্ষ যুদ্ধ করিলেও আমার সৈন্যবল, অর্থবল ক্ষয় করিতে পারিবে না।[১৬৮]
২. জয়নাল বধে শত শত বাধা দিলেও এজিদ আজ ক্ষান্ত হবে না।[১৬৯]
৩. এজিদ আজ্ঞা করিল, "আগামী কল্য যুদ্ধ বন্ধ থাকিবে, কারণ ওমর আলীর প্রাণবধ। শত্রুকে যখন হাতে পাইয়াছি, তখন ছাড়িব না, নিশ্চয় প্রাণদণ্ড করিব।[১৭০]

বাংলায় একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে- 'অহংকার পতনের মূল'। এজিদ তার অহংকারের সীমাকে অতিক্রম করেছে। এক জয়নাবকে পাবার জন্য শাস্তি দিতে চেয়েছে পুরো একটি বংশের উপর। তার উদ্দেশ্য ছিল জয়নাবকে পাওয়া। সেটার জন্য এতগুলো প্রাণনাশের প্রয়োজন ছিল না। অন্যভাবে দেখলে, সে কেবল হাসানের প্রাণনাশ করেই ক্ষান্ত হতে পারতো। হোসেন কিংবা অন্যদের প্রাণনাশ কতটা যৌক্তিক তা এজিদ বিবেচনা করে নি। জয়নাবকে পাবার জন্য ভিন্ন কোনো উপায় সে গ্রহণ করতে পারতো কিন্তু সে বীরদর্পে যুদ্ধ করে জয়নাবকে পেতে চেয়েছে। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে সে নিজের বীরত্বকে নিজেই অবমাননা করেছে। সরাসরি যুদ্ধ না করে কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। ফোরাত নদীকূলকে আশ্রয় করে হোসেনবাহিনীকে বিপর্যয় করেছে। জয়নাবকে পাবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে যুদ্ধে শহিদ হলে সেটা নায়কোচিত হতো কিন্তু বিনা কারণ প্রদর্শনে গোপন হত্যা ও খাদ্য-জল আটকিয়ে হোসেনবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে জয় লাভ করার মধ্যে এজিদের বীরত্বের চেয়ে কাপুরুষোচিত দিকটিই বেশি করে দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

> "মহারাজ এজিদের আজ্ঞায় ফোরাত নদীকূল রক্ষিত হইতেছে, এই রক্ষক বীরগণের একটি প্রাণ বাঁচিয়া থাকিতে এক বিন্দু জল কেহ লইতে পারিবে না। আমাদের মস্তকের শোণিত ভূতলে প্রবাহিত না হইলে ফোরাত প্রবাহে কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিব না।[১৭১]

'এজিদ প্রসন্নমুখে, জড়িত রসনায়, আরক্তিম লোচনে বলিল, "পরকে-উঃ-পরকে ঠকাইতে গিয়াছিলেন, নিজেই ঠকিয়াছেন। আপনিও তো সেনাপতি। বলুন তো, ছলচাতুরী করিয়া কে কয়দিন বাঁচিয়াছে? সেনাপতি মহাশয়! একথা নিশ্চয় যে, তেজশূন্য শরীর, বলশূন্য হস্ত, সাহসশূন্য বক্ষ, বুদ্ধিশূন্য মজ্জা, ইহারাই সম্মুখ সমরে ভীত হইয়া ছদ্মবেশে চোরের ন্যায় শত্রুগৃহে প্রবেশ করে এবং শৃগালের ন্যায় শঠতা করিয়া কার্যোদ্ধারের পথ দেখে।'[১৭২] 'ওমর! ভয় কি? কোনো চিন্তা করিয়ো না। নিশাও শেষ, যুদ্ধের শেষ-আমারও শেষ। আর যাহার যাহার শেষ তাহাও বুঝিতে পার। তাই বলিয়া দামেস্করাজ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন না। বিন্দুপরিমাণ শোণিত থাকিতে দামেস্করাজ নিরাশ হইবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

মারওয়ান গিয়াছে-ক্ষতি কি? তুমিই সেনাপতি; যদি মারওয়ান যমপুরী না গিয়া থাকে ভালই, উভয়েই সেনাপতি-উভয়ই মন্ত্রী। যুদ্ধনিশান উড়াইয়া দাও, রণবাদ্য বাজিতে থাকুক। মারওয়ান-অলীদ শিবিরে আসিলেও যুদ্ধ, না আসিলেও যুদ্ধ। দেখ ওমর! তুমি নামমাত্র সেনাপতি, আজ মহারাজ স্বয়ং যুদ্ধে যাত্রা করিবেন! চিন্তা কী?'[১৭৩] সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতি দুটোতে এজিদের বীরদর্প প্রকাশিত হয়েছে। এজিদ পূর্বে কখনো নিজে যুদ্ধে যোগদান করে নি। কিন্তু মারওয়ান, অলীদ প্রমুখ সেনাপতিরা হানিফা শিবিরে আটকের আশঙ্কায় এজিদ নিজে যুদ্ধে যোগদানের ঘোষণা দেয়। যুদ্ধেও শেষপর্যন্ত সে অংশগ্রহণও করে কিন্তু যুদ্ধে সে নিজ বীরত্ব প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। মোহাম্মদ হানিফার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে হানিফার কনিষ্ঠ সহোদর ওমর আলীর সঙ্গে সম্যকযুদ্ধে পরাজিত হয়। ভাতৃ-আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে ওমর আলী এজিদকে আঘাত করতে পারে না। কেননা, হানিফার নির্দেশ ছিল এজিদকে প্রাণে বধ না করা। জীবন্ত তাকে গ্রেফতার করা। সেকারণে ওমর আলী সুযোগ পেয়েও এজিদকে আঘাত করে নি। কিন্তু এজিদের সব ধরনের আঘাতকে সে খুব অনায়াসে প্রতিহত করেছে। এজিদ ক্রমে তরবারি, তীর, বর্শা, যাহা কিছু তাহার আয়ত্ত ছিল আঘাত করিল। কিন্তু ওমর আলী সেই অচল পাষাণ প্রতিমাবৎ দণ্ডায়মান-এজিদ মহালজ্জিত।

> এজিদ বলিল, "আমার সন্দেহ ঘুচিল, তুমিই মোহাম্মদ হানিফা। হানিফা! গতকল্য তোমার যুদ্ধ দেখিয়াছি, আজিও দেখিলাম। ধন্য তোমার বাহুবল! এত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম, কিছুই করিতে পারিলাম না। তোমার সহ্যগুণ-"[১৭৪]

এ থেকে বোঝা যায়, নায়কোচিত বাহুবল এজিদের ছিল না। বরং সে ওমর আলীর বাহুবলে অন্তরে মুগ্ধ হয় এবং ধারনা করে সে নিশ্চয় মোহাম্মদ হানিফ। কিন্তু উপন্যাস মতে জানা যায়, মোহাম্মদ হানিফ ওমর আলীর চেয়েও অনেক বড় যোদ্ধা। এবং উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে দেখা যায় এজিদ প্রাণপণে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে কেবল হানিফার হাত থেকে পালাতে কিংবা বাঁচতে। তার এ পলায়নপর দৃশ্যে তার স্বভাব বিরোধী কাপুরুষোচিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং এর পরে আর সামনে এগুনোর প্রয়োজন পড়ে না, কারণ এজিদের পরাজয় মূলত সেখানেই ঘটে গেছে। উপন্যাসের উদ্ধারপর্ব ত্রয়োবিংশ প্রবাহেই উপন্যাসের মূল যবনিপাত ঘটেছে। এজিদবধ পর্ব কেবল উপন্যাস সম্পন্নকরণে। ঔপন্যাসিক মশাররফ হোসেন যে মমতা দিয়ে, যে সুদৃষ্টি দিয়ে এজিদকে সৃষ্টি করেছিলেন উপন্যাসের শেষাংশে সেটা রক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত উপন্যাসে 'খল' নর ও নারী চরিত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ *চোখের বালি*ঃ বিনোদিনী

চোখের বালি উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৯ সালে। *চোখের বালি* সেই উপন্যাস যার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) আধুনিক কালে প্রবেশ করেছেন। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাস *চোখের বালি*। *চোখের বালি* উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকদের সমালোচনায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। সেগুলো হলো-"বিশ্লেষণপ্রাবল্য মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণধর্মী উপন্যাসকে বর্ণনাসর্বস্ব ফলত ক্লান্তিকর করে তুলতে পারে। কিন্তু 'বিশ্লেষণাত্বক পদ্ধতির সঙ্গে দৃশ্যানুগ সংলাপধর্মী ও চিত্রাত্মক পদ্ধতির সূক্ষ্ম শৈল্পিক মিশ্রণে চোখের বালি অত্যুজ্জ্বল ও প্রগাঢ়। দ্বিতীয়, লেখকের সিদ্ধান্ত *চোখের বালি*-র শেষ তিনটি পরিচ্ছেদ উপন্যাসের শিল্পকুশলতার ক্ষতি সাধন করেছে। তৃতীয়ত, ঔপন্যাসিকের কিছু অসংগতি বা বিশৃঙ্খলার চিহ্ন তিনি আবিষ্কার করেছেন, যা নিশ্চিতভাবেই উপন্যাসটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। চতুর্থ, লেখক যথার্থই চিহ্নিত করেছেন, *চোখের বালি* আসলে 'সমাজ সমস্যামূলক উপন্যাস নয়, ব্যক্তিত্বের সংকটধর্মী উপন্যাস।"[১৭৫]

'রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে 'নারীর মন'কে প্রধান করলেন আর সব কিছুকে অতিক্রম করে। কাজটি করা তো কঠিনই-চিন্তা করাই কঠিন ছিল। রবীন্দ্রনাথ তা করলেন। উপন্যাসের মুখ্য নারীচরিত্রের নাম দিলেন 'বিনোদিনী'। কী প্রতীকী নাম! যেন 'বিনোদ' প্রদানই তার ধর্ম! নারী তার মনোকথন অব্যক্ত রাখলেই ভালো; ব্যক্ত করলেই নানা অপবাদ দেবে পুরুষশাসিত সমাজ। আগেও ছিল, এখনো এটা চলছে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদী হলেন এই ধারার। আর তাই উপন্যাসের মুখ্য নারীচরিত্রের নামেই তিনি আনলেন শ্লেষ।'[১৭৬]

'একেবারে বাঙালির ঘরের ছবি তুলে ধরা হয়েছে *চোখের বালি* উপন্যাসে। কিন্তু মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্যজীবন ঈর্ষান্বিত করে তোলে বিধবা ও বঞ্চিত বিনোদিনীকে। এই ঈর্ষা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু অতুলনীয় হলো এর প্রকাশটি। ... বিনোদিনী আর মহেন্দ্রের পরকীয় প্রেম *চোখের বালি* উপন্যাসের কাহিনির বহু বাঁক তৈরি করেছে। জীবন উপভোগের বাসনায় বিনোদিনী যখন কাতর, তখন উড়োখই হয়ে অন্যের বাসনাগ্নিতে জীবন সমর্পণ করে বিবাহিত মহেন্দ্র। অন্য দিকে বিহারীর প্রতিও বিনোদিনীর আগ্রহ ছিল; অর্ন্তলোকের অনুভবে সে তাকে লাভও করেছিল। কিন্তু বিনোদিনী-বিহারীর বিচ্ছেদও

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে অনিবার্য হয়ে যায়। ... সব মিলিয়ে *চোখের বালি* বাংলা উপন্যাস ধারায় দাম্পত্য-প্রেম-পরকীয় অনুভবের অনন্য কথাশিল্প।'[১৭৭]

বিনোদিনী সুন্দরী, রূপসী এবং সুশিক্ষিত ও মার্জিত বলেই উপন্যাসে বিভিন্ন স্থানে, বার বার উল্লিখিত হয়েছে। এজন্য মহেন্দ্রের মাতা বিনোদিনীকে নিজ ছেলের যোগ্য বলে মনে করেছে। তার ধারণা ছেলে মহেন্দ্রও শিক্ষিত ও মার্জিত বলে তার সঙ্গে বিনোদিনীর ভালো মিল হবে। কেননা, তিনি তার ছেলে মহেন্দ্রকে যতটুকু জানেন তাতে মনে হয়েছে মহেন্দ্র কখনোই অশিক্ষিত মেয়েকে কোনোভাবেই বিয়ে করতে রাজি হবে না। এমনিতেই সে বিয়ে করতে রাজি নয়। তার পরে অশিক্ষিত হলে তো কথাই নেই। মহেন্দ্রের মাতার ইচ্ছা ছিল এমন এক মেয়েকে ঘরে নিয়ে আসা, যাতে তার সংসার তারই থাকে অর্থাৎ সংসারের কর্তৃত্ব যেন ছেলের বৌয়ের হাতে না যায়। রাজলক্ষ্মী স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেকে নিয়েই আশায় বুক বেঁধেছিলেন। ছেলেও তার মাতার আঁচল তলে আশ্রয় লাভ করেছিল। সেখান থেকে তাকে কেউ এসে দখল করে তার কাছ থেকে টেনে নিয়ে যাবে সেটা রাজলক্ষ্মী কোনোভাবেই সহ্য করতে পারবেন না। সেজন্য বয়স হওয়া সত্ত্বেও রাজলক্ষ্মী খুব একটা জোর করেন নি ছেলের বিয়ের জন্য। মহেন্দ্রের এ মাতৃপ্রীতি সর্বজন বিদিত এবং সেজন্য লোকের অনেক কথা সহ্য করতে হতো। তা না হলে রাজলক্ষ্মী ছেলের বিয়ে বিষয়ে তেমন মাথা ঘামাতেন বলে মনে হয় না। মূলত লোকচক্ষুর হাত থেকে রক্ষা পেতে রাজলক্ষ্মী ছেলের বিয়ের ব্যাপারে কিছুটা রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু মনে মনে পোষণ করেছিলেন এমন এক জন পাত্রীর যে কিনা তার বাধ্যগত হবে এবং তার কথানুসারে চলবে। তাই বিনোদিনীর মাতা হরিমতি যখন বাল্যসখী রাজলক্ষ্মীকে প্রস্তাব দিলেন, তখন রাজলক্ষ্মী ভাবলেন প্রথমত- বাল্যসখী, দ্বিতীয়ত-গরীব ঘরের অসহায় মেয়ে, তৃতীয়ত-মহিনের উপযুক্ত শিক্ষিত। উপরন্তু সুন্দরী। এভাবেই আগমন বিনোদিনীর। রাজলক্ষ্মীর ভাষায়-

> শুনিয়াছি মেয়েটি বড়ো সুন্দরী, আবার মেরে কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে- তোদের আজকালকার পছন্দর সঙ্গে মিলিবে।[১৭৮]

বিনোদিনীর উপর্যুক্ত আগমন ছিল পরোক্ষ। সরাসরি তার দেখা মেলে, যখন তার বিয়ে হয় বিপিনের সঙ্গে এবং অনতিকাল পরে যখন সে বিধবা হয়। ইতোমধ্যে মহেন্দ্রেরও বিয়ে হয় নানা নাটকীয়তার ভেতর দিয়ে তার কাকির বোনের মেয়ে আশালতার সঙ্গে। যদিও তার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল বিহারীর। কিন্তু বিহারীর পরিবর্তে বিয়ে করে মহেন্দ্র এবং মূলত সেখানে থেকেই বিনোদিনীর প্রকাশ্য হবার বীপ বোপিত হয়। আশালতাকে ঘিরে তৈরি হয় এবং ভেঙে যায় সম্পর্কের জাল। বহুদিনের লালিত স্বপ্নভগ্নের দরুণ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে রাজলক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মী ছেলের নব্য

Dhaka University Institutional Repository

বধূর সঙ্গে মধুর প্রেমের সম্পর্কে হীনতায় ভোগে এবং শেষপর্যন্ত অস্থির হয়ে গৃহত্যাগ করে। বিনোদিনীর আগমন ঘটে সেখানেই। বিনোদিনী সদ্য বিধবা হয়ে একাকী সাধামাঠা অসহায় জীবন যাপন করছিলো। রাজলক্ষ্মীর মায়ের বাড়ির পাশেই বিনোদিনীর বাড়ি। রাজলক্ষ্মীর মায়ের বাড়িও সেখানে। রাজলক্ষ্মীর আগমন খবর পেয়ে বিনোদিনী প্রথমবারের মতো আত্মপ্রকাশ করে রাজলক্ষ্মীর জীবনে তথা মহেন্দ্রের জীবনে। রাজলক্ষ্মী একা, বিনোদিনী একা। দুই একাকিত্বের মিলন হলো সেখানে। একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠলো। কেউ কাউকে ছাড়া দিন অতিবাহিত করবার স্বপ্ন দেখতেও বোধহয় ভুলে গেল। রাজলক্ষ্মী ভাবলেন এই গৃহকর্মনিপুণা, সেবাপরায়ণা মেয়েটি যদি তার পুত্রবধূ হতো, তাহলে তাকে তো এই বৃদ্ধ বয়সে নির্বাসনে আসতে হতো না। তার বহুদিনলালিত স্বপ্নও অকালে স্তব্ধ হয়ে যেত না। নানা ঘটনার পরে যখন রাজলক্ষ্মী পুনরায় মহেন্দ্রের কাছে ফিরে এলো, তখন বিনোদিনীকেও না নিয়ে এসে পারলেন না। কারণ যে সেবা তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন তা পুত্রবধূ আশালতার কাছ থেকে নয়, বিনোদিনীর কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব।

বিনোদিনীর আগমন ঘটলো মহেন্দ্রের বাড়িতে, তথা মহেন্দ্রের জীবনে। মহেন্দ্রবধূ আশালতাও একঘেয়ে প্রেমে অস্তির হয়ে উঠেছিল। তাই বিনোদিনীর আগমনে যেন অনেকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো আশালতা। কথা বলার এবং কাজের সহযোগিতার জন্য এক জন লোক পাওয়া গেল মনে করে আশালতা যেন তৃপ্তি পেল। কিন্তু আশালতা যখন বিনোদিনীকে প্রথম দেখলো, তখন সে অবাক হলো। বিনোদিনীর তুলনায় সে যেন কিছুই নয়। তার সৌন্দর্য, তার যৌবন, তার দৃষ্টি দেখে নিজেকে যেন নিতান্ত শিশু মনে হলো তার কাছে। তার মনের ভাবনাটা ছিলো এমন-

> বিনোদিনী যখন তাহার জোড়া ভুরু ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাহার নিখুঁত মুখ ও নিটোল যৌবন লইয়া উপস্থিত হইল, তখন আশা অগ্রসর হইয়া তাহার পরিচয় লইতে সাহস করিল না।[১৭৯]

একঘেয়েমি কোনো কিছুই কারো সবসময় ভালো লাগে না। প্রয়োজন মাঝে মাঝে বিরতি। নব্যদম্পতির অবিরত প্রেমালাপ, প্রেমোচ্ছ্বাসও তাই বেশি দিন ভালো লাগে না আশালতার। তাই বিনোদিনীর আগমনে সে যেন একটু স্তস্তি পায় তার একঘেয়েমি দূর করতে এক জন বন্ধুসমকে পেয়ে। ভালো কিছু করতে যেমন কড়ি লাগাতে হয়, তেমনি সম্পর্ক তৈরিতে বন্ধত্বের প্রয়োজন হয়। আশালতা বিনোদিনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। কিন্তু কি বলে ডাকবে তা খুঁজে পায় না। গঙ্গাজল, বকুলফুল প্রভৃতি নাম প্রস্তাব করে আশা। কিন্তু বিনোদিনীর তা পছন্দ হয় না। তারপর আশা-ই জানতে চায় তার কোনটা নামটা পছন্দ। তাদের প্রশ্নোত্তর পর্বটি এমন-

Dhaka University Institutional Repository

আশা কহিল, "তোমার কোনটা পছন্দ।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "চোখের বালি।"[১৮০]

বিনোদিনী বাল্যবিধবা নারী। তার রূপ ও গুণ দুটোই আছে। উপরন্তু আছে দুর্দান্ত যৌবন। ধনী মহেন্দ্রের সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা ছিল, কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তা হয় নি। এ নিয়ে তার আফসোস ছিল, দুঃখ ছিল, কষ্ট ছিল, সঙ্গে খেদও ছিল। যে সংসারে সে রাজরানি হবার কথা ছিল, সেখানে সে প্রায় হয়েছে দাসী। মহেন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে হলে মহেন্দ্রের সব কিছু তার হতো। সব কিছুর ওপর তারই অধিকার রচিত হতো। অথচ সে কিনা হয়েছে পরসেবার্থে দাসী। এক দিকে সে অতিথি, ক্ষণিকের তরে তার আগমন মহেন্দ্রের গৃহে অপরদিকে সে দাসী, তার মায়ের সেবা করার জন্য। সেটা সে কোনোভাবেই যেন মেনে নিতে পারে না।

তা তো হইতই। না হইল কেন। আশার এই বিছানা, এই খাট তো একদিন তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল। বিনোদিনী এই সুসজ্জিত শয়নঘরের দিকে চায়, আর সে কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। এ ঘরে আজ সে অতিথিমাত্র-আজ স্থান পাইয়াছে, কাল আবার উঠিয়া যাইতে হইবে।[১৮১]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম খ্যাতনামা সামাজিক উপন্যাস *বিষবৃক্ষ*। সেখানে হীরাকে 'বিষবৃক্ষ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারই রেশ ধরে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *চোখের বালি* উপন্যাসের শুরুতেই বিহারীর মুখে বিনোদিনীকে বলেছেন 'দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ'। তাই বলা যায়, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ খুব সচেতনভাবেই উপন্যাসের নামকরণ করেছেন *চোখের বালি*। এবং 'দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ' বলে সেই কথাটাকেই তিনি পাকাপোক্ত করেছেন।

বিহারী কহিল, "বল কী। দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ।"[১৮২]

বিহারী এক পলকেই বুঝে নেয় বিনোদিনী যে প্রায় জঙ্গলে বৈধব্য জীবন যাপন করছিলো সেটা তার জন্য মোটেও মানানসই স্থান নয়। কারণ তার মতো শিক্ষিত, মার্জিত, বুদ্ধিমতি ও সুন্দরী রমণীর জন্য উপযুক্ত জায়গা হওয়া উচিত ছিল কোনো বিত্তশালী ঘরের সান্ধ্যপ্রদীপ হিসেবে। কিন্তু প্রদীপশিখার বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম দুটি ব্যবহার হলো তা ঘরকে আলোকিত করে এবং দ্বিতীয়ত, সামান্য অন্যথা হলে তা কোনো ঘরকে সমূলে ভস্মীভূত করে দিতে পারে। প্রথম সাক্ষাতেই বিহারীর মনে হয়, বিনোদিনী অবস্থান যদি মহেন্দ্রের ঘরে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় তাহলে, আলোকিত করার চেয়ে ধ্বংস করার সম্ভাবনাই বেশি। পুরো উপন্যাস জুড়ে তাই আলোকিত অংশ কম, ধ্বংস লীলাই

Dhaka University Institutional Repository

বেশি দৃষ্টিগোচর হয়। শুধু মহেন্দ্রের জীবন নয়, বিহারী নিজেও সেই লেলিহান শিখায় অর্ধদগ্ধ হয়ে পড়ে।

> মহেন্দ্রের সম্মুখে এ পর্যন্ত বিনোদিনী বাহির হয় নাই, কিন্তু বিহারী তাহাকে দেখিয়াছে। বিহারী এটুকু বুঝিয়াছে, এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিবার নহে। কিন্তু শিখা এক ভাবে ঘরের প্রদীপরূপে জ্বলে, আর-এক ভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়-সে আশঙ্কা বিহারীর মনে ছিল।[১৮৩]

শুধু বিহারী নয়, মহেন্দ্রেরও না দেখে, কেবল শুনে সেই আশঙ্কা জেগে ওঠে। তার পরও মহেন্দ্র নিজেকে সেই অনলের দিকে ঠেলে দেয়। এমনকি বিহারীর পুনঃপুন স্মরণ করে দেওয়ার পরও। সৌন্দর্যমাত্রই সেখানে পুরুষের স্বভাবসুলভ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। পতঙ্গ জানবার পরও যেমন অনলের আঁচে নিজেকে সমর্পণ করে, তেমনি মহেন্দ্রও একটা পর্যায়ে নিজেকে সমর্পণ করে বিনোদিনীর কাছে। তবে মহেন্দ্র বিনোদিনীর ব্যাপারে প্রভাবিত-ই হয়েছে বেশি। জীববিদ্যার ভাষায় কোনো বিক্রিয়ার জন্য প্রভাবক প্রয়োজন। প্রভাবক হিসেবে কাজ করে পানি, বায়ু, উত্তাপ প্রভৃতি। তেমনি মহেন্দ্র যে বিশ্লেষিত হলো সেখানেও প্রভাবক ছিল। প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে, তার মাতা রাজলক্ষ্মী, স্ত্রী আশালতা, বিহারী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

প্রভাবক যখন মাতা : রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "ও আমাদের বিপিনের বউ, উহাকে আমি তো পর মনে করি না।"[১৮৪]

প্রভাবক যখন স্ত্রী: তোমার সখীর যেরকম রূপের বর্ণনা কর, সে তো বড়ো নিরাপদ জায়গা নয়![১৮৫]

প্রভাবক যখন বিহারী: বিহারী আশাকে শ্রদ্ধা করে এবং বিনোদিনীকে হালকা করিতে চায়, ইহা বিনোদিনীকে বিঁধিল।[১৮৬]

উপর্যুক্ত প্রভাবকত্রয়ের মধ্যে অজান্তেই গুরু দায়িত্ব পালন করেছে দুই জন। এক. আশালতা দুই. মাতা রাজলক্ষ্মী। আশালতা ভুল ছিলো বয়সজনিত, মাতার ভুল ছিল সেবাজনিত। আশালতার সাংসারিক বুদ্ধি নিতান্ত অপ্রতুল ছিল। তার পরে, মহেন্দ্র ছাড়াও সংসারে তার এক জন সঙ্গী প্রয়োজন ছিল। 'গৃহকর্ম নিপুণা' বলতে যা বোঝায় তা আশালতা ছিল না। সেকারণে সে শাশুড়ির মনোরাজ্যে স্থান করে নিতে পারে নি। তাছাড়া, শাশুড়ির স্বপ্ন ভগ্ন করে সে মহেন্দ্রের সংসারে প্রবেশ করেছিল। শাশুড়ির বিতৃষ্ণা ভাব তাই পূর্ব থেকেই বদ্ধমূল হয়েছিল। উপরন্তু মহেন্দ্র আশালতাকে দখল করায় 'ঘায়ের উপর বিষফোঁড়া'-র মতো শাশুড়ি রাজলক্ষ্মীর অবস্থা হয়েছিল। সব মিলিয়ে আশালতার উপর একটা বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়। সে না পারে শাশুড়ির মন ভোলাতে, না পারে স্বামীর অবাধ্য হতে। ফলে, সাংসারিক মঙ্গলকর চিন্তা আশালতার মাঝে সৃষ্টি হতে অবকাশ পায় নি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে তৃতীয়

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল। বিনোদিনীর আগমনে আশালতা তাই হাঁফ ছাড়ার অবকাশ পায়। কিন্তু সাংসারিক বোধবুদ্ধির স্বল্পতা হেতু আশালতা নিজের পায়ে নিজেই কখন কুড়াল মারে সেটা সে বুঝতেও পারে না। বিনোদিনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে তাই বিনোদিনীর দেওয়া 'চোখের বালি' নামটাকে সে সাদরে গ্রহণ করে ভবিষ্যৎ না ভেবেই। শুধু তাই নয়, মনের অজান্তে বার বার সে বিনোদিনী উসকিয়ে দেয়। স্বামীর সঙ্গে যে বিনোদিনীর বিয়ের কথা ছিল এবং সেটা যে অল্প একটু দূরে থাকতেই তার অকাল প্রয়াণ ঘটেছে, তাও সে মনে করে দিতে ভুল করে না। তাই সে বলে-

> "একবার মনে করিয়া দেখো দেখি ভাই বালি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়া যাইত। আর একটু হলেই তো হইত।"[১৮৭]

বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্রের বিবাহ হবার কথা ছিল শুধু এটুকু আশালতা বিনোদিনীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাই নয়, মহেন্দ্রে সঙ্গে বিনোদিনীর বন্ধুত্ব করিয়ে দিতে আশালতা মহেন্দ্রকে বেশ পীড়াপীড়ি করেছে। সেজন্য সে নানাবিধ ঘটনা ঘটিয়েছে দুজনকে মিলিয়ে দিতে। দুজনকে সামনাসামনি করতে চেষ্টা করেছে। সেটা তার কাছে বেশ মজাদার খেলা ছিল। কিন্তু সেই খেলায় যে তারই বেশি ক্ষতি হতে পারে সেটা সে বুঝতে পারে নি। অন্য কোনো মেয়ে হলে যেটা সে সহজে বুঝতে পারতো, আশালতা তা বুঝতে পারে নি। সে কখন খেলাচ্ছলে আগুন নিয়ে খেলতে আরম্ভ করেছে এবং সেই আগুনে সে-ই পুড়তে পারে সেটাও সে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে তার বয়সসুলভ দূরদর্শিতার অভাবে। তার সখী বিনোদিনী যে অনেক সুন্দর সেটাই সে বারবার মহেন্দ্রের কাছে পেড়েছে এবং সেটা প্রমাণ করতে নানা রকম ছোটমানুষী বায়না বা আবদার করে মহেন্দ্রকে তাতে শামিল করেছে। মহেন্দ্রও তার সেই ছেলেপনার সঙ্গে যোগ দিয়েছে অনেকটা কৌতুহোলদ্দীপক হয়ে। গোপনে ছবি তোলার ব্যবস্থা ও পরামর্শও দিয়েছে আশালতা। অপর দিকে বিনোদিনীও আশালতার সহজ চাতুর্যে ধরা দিয়েছে জেনে বুঝে।

> প্রথম হইতেই বিনোদিনী সব বুঝিয়াছিল। আশার চাঞ্চল্যে এবং ভাবভঙ্গিতে তাহার নিকট কিছুই গোপন ছিল না। কখন মহেন্দ্র পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও সে বেশ জানিতে পারিয়াছিল। নিতান্ত সরল নিরীহের মতো সে আশার এই অত্যন্ত ক্ষীণ ফাঁদের মধ্যে ধরা দিল।[১৮৮]

বিহারী মহেন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে বিবেচিত। তাই সে মহেন্দ্রের মঙ্গল সব সময়ই কামনা করেছে। মহেন্দ্রের কথাকেই সে সব সময় বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। আশালতাকে বিহারী বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু নানা নাটকীয়তার পর মহেন্দ্রই তাকে বিবাহ করেছে। কিন্তু তাতেও বিহারী সহজভাবেই মেনে নিয়েছে বন্ধুর ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়ে। কিন্তু মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর দিকে ধীরে

Dhaka University Institutional Repository

ধীরে ধাবিত হচ্ছিল তখন সে নানা রকম ইশারায় তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মহেন্দ্র তা বুঝতে পারে নি। বরং হিতে বিপরীত ঘটেছে। কেননা, লেবু অধিক কচলাইলে তেঁতো হয়, সমালোচনা বাড়িলে প্রেম পোক্ত হয়। সমালোচনার ফলে যা দুদিন পরে হতো তা বরং দুদিন পূর্বেই ঘটেছে। বিহারী সাবধান করার লক্ষ্যে বলেছে-

> ক্ষণকালের জন্য বিহারীর মুখ লাল হইল, পরক্ষণেই হাসিয়া কহিল, "আমার বেলাতেই কি পরের উপর বরাত চালাইবে, আর মহিনদার সঙ্গেই নগদ কারবার![১৮৯]

কিন্তু মহাবিষ্ট মহেন্দ্র সেটা বুঝতে পারে নি। বিহারীর বার বার ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় সে না বুঝে উল্টো বিহারীকে তিরষ্কার করেছে। তাকে অপমানিত করেছে। তার মনকে 'হীন' বলে আখ্যায়িত করেছে। তখন বাধ্য হয়ে বিহারী মহেন্দ্রকে স্পষ্ট করে বলেছে যে, মহেন্দ্র ধীরে ধীরে কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিহারী অবিবাহিত হলেও সাংসারিক জ্ঞান তার পর্যাপ্ত বলে বিচক্ষণ দৃষ্টি দিয়ে সে পূর্বেই বুঝতে পেরেছিল মহেন্দ্রের জীবনে দ্বিতীয় বিষবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হতে যাচ্ছে। তাই সে বাধ্য হয়েই শেষপর্যন্ত বলে ফেলেছে-

> বিহারী কহিল, "স্পষ্টই কহিব। বিনোদিনী তোমাকে ইচ্ছা করিয়া অধর্মের দিকে টানিতেছে এবং তুমি না জানিয়া মূঢ়ের মতো অপথে পা বাড়াইতেছ।[১৯০]

বিয়ে এমন একটি সামাজিক আচার যা এক থেকে তিন দিনে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তার পারিবারিক প্রস্তুতির সূচনা হয় ক্ষেত্র বিশেষে বেশ আগে থেকে। তার চেয়ে বড় কথা পাত্র বা পাত্রীর মানসিক প্রস্তুতি। বিবাহযোগ্য হওয়ার চেয়ে বিয়ের জন্য মানসিক প্রস্তুতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রেমে পড়া কিংবা প্রেম করার জন্য যতটা না বেশি মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে তার চেয়ে বেশি প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় বিয়ের ব্যাপারে। যখন থেকে এক জন পাত্র বা পাত্রীর বিয়ে ঠিক হয় তখন থেকে সেই পাত্র বা পাত্রী মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে। মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনীর যখন বিয়ের কথা প্রায় ঠিক হয়ে যায় তখন থেকে নিশ্চয় বিনোদিনীও মানসিকভাবে মহেন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে কীভাবে নিজেকে মহেন্দ্রের পরিবারের সামনে নিজেকে সে উপস্থাপন করবে। কিন্তু আকস্মিকভাবে মহেন্দ্রের বিয়েতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে তার সেই স্বপ্নের জাল ছিড়ে পড়ে এবং মানসিকভাবে সে কিছুটা হলেও অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। তার পরে দ্বিতীয় বার ছিন্ন জালকে সংস্কার করার পূর্বেই, স্বপ্নডালা ঢেলে সাজানোর পূর্বেই তার বিয়ে হয়ে যায় বিপিনের সঙ্গে। সেখানে তার দ্বিতীয় বার স্বপ্নচূড়া ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। যদিও এই বিষয়গুলো ঔপন্যাসিক উপন্যাসের কোথাও উল্লেখমাত্র করেন নি, তারপরও এ

Dhaka University Institutional Repository

সত্য কোনোভাবেই উহ্য থাকে না। কোনো ওঝা যদি কোনো বিষধর সাপের মাজা ভেঙে দেন এবং তিনি নিজেই যদি সেই ক্ষতকে অনেক যত্ন করে সারিয়ে তোলেন, তারপরও সুস্থ হয়ে সাপ হয়তো তাকেই দংশন করে বসবে। কারণ খুব সহজ। দংশন হয়তো সে জন্য নয় যে তাকে আঘাত কেন করেছিল, হয়তো এ জন্য যে, কেন তাকে কয়েকটা দিন না খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতে হলো। বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও এ রকম ঘটতে দেখা যায়। বিনোদিনী মহেন্দ্রের উপর বিষোদ্গার এ জন্য করে নি যে, কেন মহেন্দ্র তাকে বিয়ে করলো না। করেছে এ জন্য যে, তার জন্য তার জীবনটা এমন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিপিন যদি বেঁচে থাকতো তাহলে বিনোদিনীকে পরশ্রীকাতর হতে হতো না, কিন্তু বিপিনের অকালমৃত্যুতে বিপিনের দায়িত্বহীনতা এবং মহেন্দ্রের অস্বীকৃতি দুটোকে এক সঙ্গে করে মহেন্দ্রের উপর পড়েছে। তড়িৎ তারের এক প্রান্ত ছিঁড়ে অবহেলায় পড়ে থাকলে কোনো ক্ষতির কারণ নেই, কিন্তু তাকে কেউ স্পর্শ করলে কিংবা প্রবাহিত হবার কোনো মাধ্যম পেলে সে কাউকে ছাড়ে না। বিনোদিনী অবহেলায় অজগ্রামের এক কোণায় জঙ্গলে পড়ে ছিল। তাকে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু রাজলক্ষ্মী কোনো মাধ্যম সৃষ্টি না করলে এবং মহেন্দ্র তাকে স্পর্শ না করলে কোনো সমস্যাই হতো না। কিন্তু রাজলক্ষ্মী থেকে শুরু করে আশালতা, বিহারী, মহেন্দ্র সবাই তড়িৎ প্রবাহের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। তাই তো বিনোদিনীর মুখ থেকে বেড়িয়ে এসেছে-

১. আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। কিন্তু যে কারণেই বল, দগ্ধ হইতেই হউক বা দগ্ধ করিতেই হউক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিষদিগ্ধ অগ্নিবাণ জগতে কোথায় মোচন করিবে। ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিনোদিনী কহিল, 'সে যাইবে কোথায়। সে ফিরিবেই। সে আমার।'[১৯১]
২. ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুব্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারি দিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।[১৯২]

পরশ্রীকাতরতা মানব চরিত্রের অন্যতম তাড়না। বিনোদিনীও এই তাড়নায় পতিত হয়ে তাড়িত করেছে মহেন্দ্রকে। তার জীবনকে অসময়ে থামিয়ে দেবার জন্য, তার সংসারের স্বপ্নটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবার জন্য মনে মনে সে মহেন্দ্রকে দায়ী করতে থাকে। বেশি করে দায়ী করে যখন আশালতার মতো ননীর পুতুলকে নিয়ে মহেন্দ্রের বাড়াবাড়ি রকমের প্রীতি তার চোখে পড়ে। মহেন্দ্র যখন বিভিন্ন ছলে বিনোদিনীকে অনুসরণ করে তখন বিরক্তির ভাবও প্রকাশ করে বিনোদিনী। কিন্তু সেই মহেন্দ্র যখন কলেজ হোস্টেলের কাছে বাড়ি ভাড়া নেয় সেটাও সে সহ্য করতে পারে না। আশালতার ওপর ভর করে তার নাম ভাঙিয়ে সে নিজের মনের কথা মহেন্দ্রের কাছে ব্যক্ত করে।

Dhaka University Institutional Repository

'প্রিয়তম, যাহাকে ভুলিবার জন্য চলিয়া গেছ, এ লেখায় তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিব কেন। যে লতাকে ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলে, সে আবার কোন্ লজ্জায় জড়াইয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করে। সে কেন মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশিয়া গেল না।[১৯৩]

আশালতা তথা বিনোদিনীর প্রথম চিঠির উত্তর না পেয়ে সে দ্বিতীয়বার আশাকে ছলনা করে মহেন্দ্রকে পুনরায় তার মনের কথা জানায়। বিনোদিনী যে মহেন্দ্রকে ভালোবেসেছে সেটা চিঠিতে স্পষ্টতর হয়। সেখানে শুধু হৃদয়ের কথা বলে নি বরং হৃদয়ের গভীর আকুতিও সেই চিঠিতে প্রকাশিত হয়েছে। বিনোদিনী মহেন্দ্রকে জানায় তাকে ভালো না বেসে তার কোনো গতি নেই। মহেন্দ্রকে তুলনা করে দেবতার সঙ্গে। দেবতা বর না দিলেও ভক্তরা তার সেবা থেকে নিজেদেরকে যেমন সরিয়ে নেয় না, তার পরও অপেক্ষা করে, তেমনি সেও অপেক্ষায় থাকবে বলে জানায়। কারণ সে নিরূপায়। দেবতার সান্নিধ্য না পেলে তার চলবে না।

কিন্তু ভক্তের পূজা লইতে গিয় শিবের যদি তপোভঙ্গ হয়, তবে তাহাতে রাগ করিয়ো না হৃদয়দেব "তুমি বর দাও বা না দাও, চোখ মেলিয়া চাও বা না চাও, জানিতে পার বা না পার, পূজা না দিয়া ভক্তের আর গতি নাই।"[১৯৪]

মহেন্দ্রকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে যতটুকু সম্ভব তার সবটুকু করেছে বিনোদিনী। কিন্তু সেই বিনোদিনীই আবার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায়। যদিও সেই যেতে চাওয়াটা ছিল একটা ছল। ছলটা ছিল নিজেকে মহেন্দ্রদের বাড়িতে আরো বেশি করে স্থায়ী করার একটা প্রক্রিয়ামাত্র। সেইসঙ্গে নিজের অবস্থান সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া। এমনকি মহেন্দ্রের কাছে তার অবস্থানটাও যেন সঠিকভাবে বুঝে নিতে পারে যে, সে মহেন্দ্রের কতটা জুড়ে রয়েছে।

মহেন্দ্র মুহূর্তের মধ্যে বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ সজলস্বরে কহিল, "যদি তাহাতে আমার আসে যায়, তবে তুমি থাকিবে?"[১৯৫]

তার বাড়ি ত্যাগের কথাটা যে সত্য নয় এবং সেটা যে ছিল একটা ছলনা, পরিকল্পিত পরিপক্ব বুদ্ধির সিদ্ধান্ত তা বোঝা যায় তার বাড়ি ত্যাগে শেষপর্যন্ত ক্ষান্ত দেওয়া। তার উদ্দেশ্য সফল হয়। বাড়ির সবাই তাকে বাধা দেয়। সে গেলে আশালতা একা হয়ে যায়, মহেন্দ্র তার প্রেম হারায়, মাতা রাজলক্ষ্মী তার সেবাকারীকে হারায়, তাই সবাই তাকে থেকে যেতে অনুরোধ করে। মনে মনে বিনোদিনী এটাই চাচ্ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে সে বলে-

Dhaka University Institutional Repository

তেমন ব্যথার ব্যথী, সুখের সুখী, অদৃষ্টগুণে যদিই পাওয়া যায়, তবে আমিই বা তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইব কেন।"[১৯৬]

এক জন নারীর সামনে আরেক জন নারী বেশি ভালোবাসা পাচ্ছে এটা কোনো নারীর পক্ষেই সহ্য করা যেন রীতিবিরুদ্ধ বিষয়। যুগে যুগে কালে কালে এটাই ঘটতে দেখা যায়। কদাচিৎ এর ব্যত্যয় ঘটে। দর্শক যে কোনো সম্পর্কের নারী হতে পারে। মা ভাবে ছেলে মাকে ভুলে বউকে নিয়ে মেতে আছে, কিংবা বউ তার ছেলের মাথা খেয়েছে অথবা বউ তার ছেলেকে গুণ করেছে। বোন ভাবে ভাই তাকে ভুলে গেছে, বোনের সংসারে যদি স্বামীর ভালোবাসার ঘাটতি থাকে তো কথাই নেই, ভয়ংকর ও প্রলয়ঙ্কারী ব্যাপার, প্রবীণ আত্মীয়া হলে ভাবে কলিকাল, নির্লজ্জ ও বেহায়া। অল্পবয়সী নারী হলে ভাবে আমি বা কম কিসে, তার চেয়ে আমি কোন দিকে কম আছি। বলা বাহুল্য নয় যে, উক্ত প্রেম দেখবার লোভ যেমন দুর্বার, সহ্য করা তার চেয়ে বেশি কষ্টসাধ্য, কখনো কখনো অসাধ্য। বিনোদিনীর ক্ষেত্রে অসাধ্য হয়ে পড়েছিল। কর্মনিপুণতা, শারীরিক সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতা, বুদ্ধিমত্তা, সাংসারিক বুদ্ধিদীপ্ততা বিনোদিনীকে কষ্টসাধ্য থেকে অসাধ্য করে তুলেছিল। তাই সে বলে-

১. আশার মধ্যে তোমরা কী দেখিতে পাইয়াছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। ভালোই বল আর মন্দই বল, তাহার আছে কী। বিধাতা কি পুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টি কিছুই দেন নাই। তোমরা কী দেখিয়া, কতটুকু দেখিয়া ভোল। নির্বোধ! অন্ধ![১৯৭]
২. সমস্ত সংসারের উপর বিনোদিনীর যেন খুন চাপিয়া গেছে। মিথ্যা কথা বটে! বিনোদিনীকে কেহই ভালোবাসে না বটে! সকলেই ভালোবাসে এই লজ্জাবতী ননির পুতুলটিকে।[১৯৮]

আশালতা বিনোদিনীকে সেই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে অজান্তে। আশালতার মন চায় নি কাশী যেতে কিন্তু স্বামীর পুনঃপুন চাপ সৃষ্টিতে সে হতবিহ্বল হয়ে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। যাওয়ার পূর্বে স্বামীর দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে যায় বিনোদিনীকে। 'আমি তো ভাই, কাল কাশী যাইব, আমার স্বামীর যাহাতে কোনো অসুবিধা না হয় তোমাকে সেইটে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। এখনকার মতো পালাইয়া বেড়াইলে চলিবে না।'[১৯৯] সে এক বারও ভাবতে পারে নি তার যাওয়ার রাস্তা তৈরি-ই হয়েছিল বিনোদিনীর জন্য। বাংলা প্রচলিত প্রবাদে আছে- একে তো নাচুনে বুড়ি, তাতে আবার ঢোলে বাড়ি। মহেন্দ্রে ও বিনোদিনীর জন্য এই প্রবাদটি প্রযোজ্য হয়েছে। আশা থাকা অবস্থায় কোনো বাধা না থাকলেও একটা সূক্ষ্ম বাধা ছিল, কিন্তু আশা না থাকায় সেই সূক্ষ্ম বাধাও দূরীভূত হয়। সুতরাং মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর প্রেমলীলা চরমে পৌঁছায়। তাদের প্রেমলীলার উজ্জ্বল দৃশ্যের একটি এরূপ-

শিয়রের কাছে বসিয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিহ্বল যৌবনের গুরুভারে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর মাথা নত হইয়া আসিতেছিল, অবশেষে তাহার কেশাগ্রভাগ মহেন্দ্রের কপোল স্পর্শ কবিল।

Dhaka University Institutional Repository

> বাতাসে আন্দোলিত সেই কেশগুচ্ছের কম্পিত মৃদু স্পর্শে তাহার সমস্ত শরীর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল, হঠাৎ যেন নিশ্বাস তাহার বুকের কাছে অবরুদ্ধ হইয়া বাহির হইবার পথ পাইল না।[২০০]

পরস্পরের প্রেম নিবেদন ও প্রেমাবেদন চূড়ান্ত সীমায় উত্তীর্ণ হয়। তবে এক জনেরটা নিরেট অপরেরটা নির্জলা নয়। গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ না করলে সেটা বোঝা যায় না। প্রেমান্ধ মহেন্দ্র সেটা বিচার-বিশ্লেষণ কিংবা উপলব্ধি করতে পারে না। যখন করতে পারে তখন জল অনেক গড়িয়ে যায়। বিনোদিনী কথায় সে আত্মহারা হয়ে বিচারিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাই যখন সে বলে-' মাপ কিসের জন্য। বেশ করিয়াছ। আমি কি লোককে ভয় করি। আমি কাহাকেও মানি না। যাহারা আঘাত করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়, তাহারাই কি আমার সব, আর যাহারা আমাকে পায়ে ধরিয়া টানিয়া রাখিতে চায়, তাহারা আমার কেহই নহে?[২০১]। 'যাহারা আঘাত করিয়া' কথাটি দিয়ে বিনোদিনী কি বোঝাতে চেয়েছে মহেন্দ্র তার নিগূঢ়তত্ত্ব বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে পারে না। উল্টো প্রেমের নিশ্চয়তা পেয়ে যেন 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করতে শুরু করে। বিনোদিনী আরেকটি ইঙ্গিত প্রদান করে সেটাও মহেন্দ্র বুঝতে ব্যর্থ হয়। সে বলে-

> মাথায় করিয়া রাখিব। ভালোবাসা আমি জন্মাবধি এত বেশি পাই নাই যে, 'চাই না' বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারি।"[২০২]

ছোট্ট শিশু একটি খেলনার জন্য বায়না ধরে, যেন তা না পেলে তার চলবেই না, কাঁদতে কাঁদতে মরেও যেতে পারে মা-বাবার এমত মনে হয়। কিন্তু সেই খেলনাটি কিনে দেবার পর অনেক সময় দেখা যায়, এক মুহূর্ত পর সেই খেলনার প্রতি তার মনোযোগ থাকে না। সেই খেলনাটি ঘরের কোণে বা কোথায় পড়ে আছে তাও তার খেয়াল থাকে না। বিনোদিনী মহেন্দ্রকে সেরূপ খেলনার মতো কিছুটা হলেও ব্যবহার করেছে। তা না হলে যাকে পাবার জন্য তার এমন আপ্রাণ প্রচেষ্টা, সেটা পাওয়ার পর তার প্রতি অবহেলা দেখে সে কথাটাই যেন মনে করিয়ে দেয়।

> আমি তোমাকে বারংবার বলিতেছি, তুমি আমাকে ত্যাগ করো, আমার পশ্চাতে ফিরিয়ো না; নির্লজ্জ হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না। আমার খেলার শখ মিটিয়াছে; এখন ডাক দিলে কিছুতেই আমার সাড়া পাইবে না।[২০৩]

বিনোদিনীর উপর্যুক্ত উক্তির মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, মহেন্দ্রের প্রতি তার আসক্তি কমে গেছে। কোনো কোনো সময় এমনটি দেখা যায়, বহুদিনের একটি চাওয়া যদি সেটা যথাসময়ে না পাওয়া যায় সেটার প্রতি একটা পর্যায়ে আর আসক্তি থাকে না। বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও সেটা ঘটেছে। এক সময় বিনোদিনী

Dhaka University Institutional Repository

মহেন্দ্রকে চেয়েছে এবং পেয়েছে কিন্তু যেভাবে সে মহেন্দ্রকে চেয়েছে সেভাবে পায় নি। তাই চাওয়াটা ফিকে হয়ে যায়। তখন তার আর প্রেমভাব থাকে না। বরং তার মনে হয়-

> বিনোদিনী স্বহস্তে স্বচেষ্টায় মাটি খুঁড়িয়া মহেন্দ্রের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই যে একটা লোলজিহ্বা লোলুপতার ক্লেদাক্ত সরীসৃপকে বাহির করিয়াছে, ইহার পুচ্ছপাশ হইতে সে নিজেকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে।[২০৪]

বিনোদিনী তার জীবনে প্রেম কিংবা ভালোবাসা কোনটাই প্রয়োজনীয় পরিমাণে পায় নি। প্রথমত, পিতৃহারা। দ্বিতীয়ত, স্বামীহারা বিধবা। সংসারে সে একটু ভালোবাসা খুঁজে ফিরেছে কিন্তু কোথাও সে পূর্ণাঙ্গরূপে সেই ভালোবাসার খোঁজ পায় নি। মহেন্দ্রের কাছে চেয়েছিল এবং মহেন্দ্র তা দিতেও চেয়েছে কিন্তু বিনোদিনী যেভাবে চেয়েছে সেভাবে সে পায় নি। উপরন্তু ভালোবাসার চেয়ে তার বেশি প্রয়োজন ছিল স্থায়ী একটি আবাসন অর্থাৎ ভরণপোষণের নিশ্চয়তা। সেটা মহেন্দ্র প্রথমে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। পরে যখন দিতে পারতো তখন মহেন্দ্রের প্রতি তার সেই টান কিংবা অনুরাগ অবশিষ্ট ছিল না। সে আত্মরক্ষার্থে ও সমাজে ভালোভাবে সম্মানের সঙ্গে টিকে থাকতে মহেন্দ্রের চেয়ে বিহারীকেই বেশি উপযুক্ত মনে করে।

> বিনোদিনীর এই দুর্দান্ত প্রেমের উপরে তাহার আত্মরক্ষার একান্ত আকাঙ্ক্ষা যোগ দিল। বিহারী ছাড়া তাহার আর উপায় নাই। মহেন্দ্রকে বিনোদিনী খুব ভালো করিয়াই জানিয়াছে, তাহার উপরে নির্ভর করিতে গেলে সে ভর সয় না-তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তবেই তাহাকে পাওয়া যায়, তাহাকে ধরিয়া থাকিলে সে ছুটিতে চায়। কিন্তু নারীর পক্ষে যে নিশ্চিন্ত নিরাপদ নির্ভর একান্ত আবশ্যক, বিহারীই তাহা দিতে পারে। আজ আর বিহারীকে ছাড়িলে বিনোদিনীর একেবারেই চলিবে না।[২০৫]

চোর যদি চুরি করে বলে সে চুরি করেছে তাহলে সবাই সেটা মেনে নেয়, বিশ্বাস করে। কিন্তু এক জন মানুষ যাকে চোর বলে সন্দেহ হয় না, সে যদি বলে সে চুরি করেছে তাহলে তাতে আরো বেশি দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অবিশ্বাসের সামান্য সম্ভাবনা থাকলে তা নাকোচ হয়ে যায়। বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও তার সহজ সরল স্বীকারোক্তি সবাইকে সন্দেহপাশ থেকে দূরে রেখেছে। মহেন্দ্রের সঙ্গে তার গোপন প্রেম সম্পর্কে সামান্য সন্দেহ হলেও তার মুখের সত্য কথাটিও হয়ে পড়েছে অসত্য। বিহারী ও আশালতাকে বলা ও দেওয়া ইঙ্গিত সে কথাটাকেই প্রমাণ করেছে।

১. বিনোদিনী কহিল, "আমি দেবী নই ঠাকুরপো, শুনিয়া যাও। তুমি চলিয়া গেলে কাহারও ভালো হইবে না। ইহার পরে আমাকে দোষ দিয়ো না।[২০৬]

Dhaka University Institutional Repository

২. বিনোদিনী। সাবধান থাকিস, ভাই। ঠাকুরপো যেরকম বাড়াবাড়ি করেন, এক-একবার সন্দেহ হয়, বুঝি বশ করিবার বিদ্যা জানি বা।[২০৭]

বিনোদিনীর আচার-আচরণ কিংবা কথাবার্তা অসংলগ্ন নয় কিন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। মনে হয়, সে শতধা দ্বিধান্বিত। তার শুরু রাজলক্ষ্মীর সেবা করে। তখন কোনো অভিসন্ধি কিংবা পরিকল্পনা ছিলো বলে মনে হয় না। কিন্তু যত জল গড়িয়েছে, ততই তার নানা রূপ প্রকাশিত হতে থাকে। মহেন্দ্রের বাড়ি এসে মহেন্দ্রকে পাবার কিংবা জয় করবার বাসনা জাগে। তাকে ভালোবাসতে গিয়ে কেবল ভালোবাসার অভিনয় করে। সে অভিনয় মহেন্দ্র কেন, যেকোনো পুরুষই বোধ করি বুঝতে গিয়ে ভুল বুঝবে। মহেন্দ্রও ভুল করেছে। প্রকৃতপক্ষে সে মহেন্দ্রের কাছে কি চায় সেটা স্পষ্ট হয় নি। এক বার মনে হয় সে মহেন্দ্রকে চায়, পরক্ষণেই মনে হয় সে মহেন্দ্রকে আকৃষ্ট করে তার সংসারে স্থায়ী আসন গড়তে চায়। কিন্তু এটা চরম সত্য যে, সেটা কখনো কোথাও সম্ভব নয়। এটাও মনে হয় বিনোদিনীর মতো সচেতন শিক্ষিত মেয়ে আশ্রিতা হয়ে স্বর্ণলতার ন্যায় কোথাও থাকবে সেটাও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। তাহলে দাঁড়ায় মহেন্দ্রকে সে নিজের করে পেতে চায়। যদি সেটা চায়, তাহলে অবশ্যই অপরাধ। পুনরায় মনে হয়, সে প্রতিশোধ প্রবণ হয়ে প্রতিশোধ নিতে চায়। সে দেখাতে চায় তাকে যে মহেন্দ্র অবহেলা করে বড় ধরনের একটা অপরাধ করে ফেলেছে। সেটাও প্রতিহিংসা বলেই প্রতিপন্ন হয়। নিম্নোক্ত উক্তি থেকেই সেটাই মনে হয়-

> সুখ যদি না পাইল, তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে পরাস্ত ধূলিলুণ্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে।[২০৮]

বিহারীরকে তার ভালো লাগে। মহেন্দ্রকে ছেড়ে তাকে দেখে সে আশান্বিত হয়। কিন্তু তার মনে হয় সে আশার প্রেমে মশগুল। যদিও ঔপন্যাসিক কোথাও সে ধরনের ইঙ্গিত দেন নি। তাই বিহারীর ওপরও সে বিরক্ত হয়, আসক্তও হয়। সেখানেই সে থেমে যেতে পারতো। কিন্তু সেখানে সে না থেমে মহেন্দ্রের সর্বনাশ করতে এক প্রকার উঠে পড়ে লাগে। যদিও তার অজানা নেই তার পরিণাম কি হতে পারে। বিহারীর জন্য অপেক্ষা করলে, তাকে পাওয়ার চেষ্টা করলে সেটা বরঞ্চ মানানসই হতো। এখানেই তার নেতিবাচক বিষয়গুলো এক এক করে ভেসে উঠতে থাকে। মহেন্দ্রকে যখন নিজের মতো করে পায় না, তখন সে চিন্তা করে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে। অস্তিত্ব সংকট কাটাতে সে আরো বেশি করে মহেন্দ্রকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সেই মহেন্দ্রকেও যখন হাতের মুঠোয় পায় তখন সে তাকে ত্যাগ করে। যদি সে মহেন্দ্রের পরিবারের কথা চিন্তা করে তাকে ছেড়ে দিতো তাহলেও সেটা পাঠক সমাজে সমাদৃত হতো। কিন্তু সে ধরনের কোনো চিন্তা-চেতনা তার ভেতর প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। মহেন্দ্র যখন তার জন্য পুরো সংসার ত্যাগ করে তখনও সে মহেন্দ্রকে নিয়ে উন্মত্ত খেলায় মেতে উঠেছে। নিজের

Dhaka University Institutional Repository

স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। নিজের স্বার্থ সিদ্ধি বলতে, তার তখন মনে হয়, মহেন্দ্র নয় বিহারী তার জীবনের সব। বিহারীই হতে পারে তার প্রকৃত নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কারণ সমাজ সংসারের বিরুদ্ধে তার লড়াই করার মতো সাহস ও বুদ্ধি-বল আছে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে বিনোদিনী চরিত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়। সেখানে সে পুরোপুরি প্রেমিকা। বিহারীর অজান্তেই সঁপেছে মন-প্রাণ। এই ভালোবাসা হঠাৎ কোথা থেকে জন্মালো তার খোঁজ করতে গেলে দেখা যায় তার আশ্রয় বড় প্রয়োজন। কিন্তু আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে বিহারীকে উন্মাদিনীর ন্যায় ভালোবাসার মধ্যে একটা বড় বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কোনোভাবেই তার উত্তর মেলানো যায় না।

> তাই জোড়হাত করিয়া চোখ বুজিয়া সে বিহারীকে ডাকিতে লাগিল, "আমার জীবন শূন্য, আমার হৃদয় শূন্য, আমার চতুর্দিক শূন্য- এই শূন্যতার মাঝখানে একবার তুমি এসো, এক মুহূর্তের জন্য এসো, তোমাকে আসিতেই হবে, আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না।[২০৯]

বিনোদিনীকে মুখরা কোনোভাবেই বলা যায় না। তবে অসংকোচপ্রাণা বলা যেতে পারে। তারপরও সে প্রথমে কেন বিহারীকে তার ভালোবাসার কথা বললো না, সেখানে একটা প্রশ্ন রয়ে যায়। আবার, বিপরীত চিত্রও দেখা যায়, যখন বিহারীকে সে এক পলকের জন্য পেল, সেখানে সে অবলীলায় তার দুর্বার প্রেমের আকুতি জানিয়ে ফেললো। এবং সেই জানানোতে কিছুটা অতিরঞ্জনের ছাপ মেলে। বিহারীর প্রেম পেতে, বিহারীর কাছে যেতে মহেন্দ্রকে ব্যবহার একটা বিতর্কের সৃষ্টি করে। প্রশ্ন জেগে উঠে কয়েকটি বিষয়কে ঘিরে।

এক. মহেন্দ্রকে ভালোবাসার নামে ছল করার কারণ কী?

দুই. মহেন্দ্রের সংসার ভাঙার কারণ কী?

তিন. মহেন্দ্রকে সে কোন কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছে?

চার. বিহারীর প্রতি তার প্রেমের অভূতপূর্ব রহস্য কী?

উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোর প্রতিটির আংশিক উত্তর মেলে কিন্তু তার মনের পুরো খোঁজ মেলে না। বিনোদিনীর নিজের কাছেও মনে হয় স্পষ্ট কোনো ছবি নেই। আছে কেবল, বিহারীর কাছে প্রেম নিবেদনের অপরিমেয় বাক্‌চাতুর্য ও পরাজয়। কিছু চিত্রজ্ঞাপক সংলাপ ও আবেদন তুলে ধরা হলো নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে-

১. বিনোদিনী। ভুল কর নাই ঠাকুরপো, কিন্তু বুঝিলেই যদি, শ্রদ্ধা করিলেই যদি, তবে সেইখানেই থামিলে কেন। আমাকে ভালোবাসিতে তোমার কী বাধা ছিল। আমি আজ নির্লজ্জ হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, এবং আমি আজ নির্লজ্জ হইয়াই তোমাকে বলিতেছি-তুমিও আমাকে ভালোবাসিলে না কেন। [২১০]

Dhaka University Institutional Repository

২. বিনোদিনী চৌকি হইতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বিহারীর দুই পা প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "ঐটুকু দুর্বলতা রাখো ঠাকুরপো! একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়ো না, মন্দকে ভালোবাসিয়া একটুখানি মন্দ হও।"[২১১]
৩. চৌকিতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিল, "জীবনসর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আজ এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালোবাসো।[২১২]

উপর্যুক্ত চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর প্রেম অপূর্ব নির্জলা ও নিকষ । এভাবে প্রেম নিবেদন তৎকালীন রীতিসিদ্ধ বলেই মনে হয়। কিন্তু এত উলঙ্গ চিত্র খুব কম উপন্যাসেই চোখে পড়ে। বিহারীর জন্য যদি সে এতটা নিচে নামতে পারে, নিজের ব্যক্তিত্ব- যে ব্যক্তিত্বের কারণে সে মহেন্দ্রকে অবহেলায় দু'পায়ে ঠেলেছে, তাহলে পাঠক মনে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য, নিচের চিত্রজ্ঞাপক সংলাপ কোন বিষয়টিকে প্রতিফলিত করে। নিম্নোক্ত চাতুর্যপূর্ণ উক্তির কারণই বা কী?

> এখন শুধু বাসনা চরিতার্থ করা নয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে। বিনোদিনী কহিল, 'আগে দেখি বিহারী কিরূপ উত্তর দেয়, তাহার পরে কোন পথে চলা আবশ্যক, স্থির করা যাইবে।'[২১৩]

স্ববিরোধিতা বলে যে কথাটি প্রচলিত রয়েছে, সেটাই যেন বার বার বিনোদিনী মাঝে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। মহেন্দ্রকে পথে নামালো, বিহারীর জন্য পাগল হলো, সেই বিহারী-ই যখন তাকে যেচে ধরা দিলো; তখন সে তাকেও দূরে ঠেলে দিল। বিহারীর জন্য সব কিছু করতে সে রাজি ছিল, বিহারী তাকে যেখানে যেভাবে রাখবে সেখানেই সে থাকতে রাজি। দু'বেলা দু'মুঠো আহার জুটলেও যে বিহারীর কাছে থাকতে পারে, বিহারীকে না পেলেও তার সামনে থাকতে পারলেও তার চোখের ও মনের পিপাসার নিবৃত্তি হয়, যার জন্য কেবল দাসী হয়েও থাকতে পারে সেই বিহারীকে সে ত্যাগ করলো। তার ধারণা ছিল তার জীবনে বিহারী-ই একমাত্র পুরুষ যে সমাজ, সংসার ও সংস্কারের বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বে উঠে তাকে রক্ষা করতে পারে, শেষপর্যন্ত তার প্রতিও সে বিশ্বাস তার রইলো না, সেটা ভাবিত হবার মতো গুরুবিষয়-ই বটে। বিনোদিনী বলেছে- 'তাহা জানি, কিন্তু যতদিন বিহারীর আশা আছে, ততদিন আমি মরিতে পারিব না।'[২১৪] অথচ বিহারী তাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে চাইলে সে তাকে অপমান করেছে, ধিক্কার দিয়েছে। এবং পরিশেষে সে তার স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে কাশীবাসী হয়েছে। নিতান্তই রহস্যময়।

১. ছি ছি, এ কথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তামাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতে পারে না। ছি ছি, এ কথা তুমি মুখে আনিয়ো না।[২১৫]
২. বিনোদিনী কহিল, "তোমার চিহ্ন আমার কাছে আছে, তাহা আমার অঙ্গের ভূষণ–তাহা কেহ কাড়িতে পারিবে না। আমার আর কিছু দরকার নাই। বলিয়া সে নিজের হাতের সেই কাটা দাগ দেখাইল।[২১৬]

Dhaka University Institutional Repository

বিনোদিনীর নানাবিধ অপরাধ সত্ত্বেও বিনোদিনীকে পুরো দায়ী করা যায় না। তার নেতিবাচক চরিত্র বিশ্লেষণ করতে প্রয়োজন সমাজবিদ্যা, মনোবিদ্যা এবং দর্শন। সামাজিক দিক দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে দেখা যাবে, সে নিরূপায় ও অসহায় বিধবা নারী। তার বেঁচে থাকবার জন্য ছিল একটি নিরাপদ আশ্রয়। একলা একটা বিধবা এবং সুন্দরী নারীর জন্য সামাজিকভাবে সম্মানের সঙ্গে টিকে থাকা সহজ বিষয় ছিল না। সেজন্য তার প্রয়োজন নিরাপদ ভরসাস্থল। সেকারণে সে রাজলক্ষ্মীকে ভর করে মহেন্দ্রে বাড়িতে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিল। মনোবিদ্যার ভাষায় রিপুর তাড়না একটি বড় দিক। অবহেলিত মন ব্যস্ত হয়ে ওঠে অবহেলার কারণ খুঁজতে এবং তা খুঁজে পেলে তা নিরাময় কিংবা প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠে। বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। তার অসহায়ত্বের কারণ হিসেবে সে সম্যক হিসেবে পেয়েছে মহেন্দ্রকে। বিপিন থাকলে তার এই প্রতিশোধপরায়ণ রিপু জেগে উঠতো না, তা জোর গলায় বলা চলে। তাছাড়া পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার ভাষায় যথাক্রমে প্রবাহমাধ্যম ও প্রভাবক না পেলে কখনো রিপু প্রবাহিত কিংবা প্রভাবিত হতে পারতো না। কিন্তু বিনোদিনী দুটোই পেয়েছে অর্থাৎ উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়ায় তার হিংসা, প্রতিহিংসা, পরশ্রীকাতরতা, প্রেম সবকিছুই জেগে উঠেছে। উদাহরণ হিসেবে বিনোদিনীর নিম্নোক্ত উক্তিটি গ্রহণযোগ্য।

১. তুমি কি কখনো তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই। একবার ঠাওর করিয়া দেখো দেখি।[২১৭]
২. কী করিয়াছি। ভীরু কাপুরুষ। কী করিবার সাধ্য আছে তোমার। না জান ভালোবাসিতে, না জান কর্তব্য করিতে। মাঝে হইতে আমাকে কেন লোকের কাছে নষ্ট করিতেছ![২১৮]

উপর্যুক্ত উক্তি দুটি থেকে রাজলক্ষ্মীর সুযোগ সুবিধা ও মহেন্দ্রে ব্যর্থতা প্রকাশিত হয়। সুতরাং তারাও বিনোদিনীর নেতিবাচক আচরণের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

নজিবর রহমানঃ *আনোয়ারা :* গোলাপজান ও দুর্গা

উনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে বাঙালি মুসলিম সমাজসংস্কার আন্দোলন দানা বেঁধেছিল। এ সময় যেসব মুসলমান লেখক সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম প্রাতিহারিক ঔপন্যাসিক মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৬০-১৯২৫)। সমকালীন মুসলমান সমাজকে তাঁর ধর্ম-কর্ম, আচার-ব্যবহার, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য নজিবর রহমান লেখনি ধারণ করেছিলেন। স্বকালে তাঁর রচিত উপন্যাস মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছিল এবং তাঁর জনপ্রিয়তা কালের সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি তাঁর উপন্যাসে নারী

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার প্রচলন, ধর্মীয় গোঁড়ামির অবসান ও সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন।

আনোয়ারা উপন্যাসটির প্রকাশকাল নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। আনোয়ারা উপন্যাসের কৃতজ্ঞতা পত্রে বলা হয়েছে-'নজিবর রহমানের প্রথম সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস *আনোয়ারা*'র প্রকাশকাল ১৮ মে, ১৯১৪।[২১৯] *আনোয়ারা* উপন্যাসের প্রকাশকালের পর প্রশ্ন আসে প্রকরণ নিয়ে। বেশির ভাগ সমালোচক এটাকে সামাজিক উপন্যাস বলেছেন। কেউ কেউ একে আবার কেবল পারিবারিক উপন্যাসও বলেছেন। "গ্রন্থকার নিজে এটিকে বর্ণনা করেছেন, 'পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস' হিসাবে।"[২২০] কিন্তু পরিবার তো সমাজেরই একটা অংশ বিশেষ। সমাজের প্রভাব যেমন পরিবারের উপর পড়ে, তেমনি পরিবারের প্রভাবও সমাজে পড়তে পারে। তাই *আনোয়ারা* উপন্যাসকে সামাজিক উপন্যাস বলাই শ্রেয়। তাছাড়া এই উপন্যাসে একটি পরিবারের কাহিনী বর্ণনার ভেতর দিয়ে সমগ্র সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। আনোয়ারার পরিবার সমাজের অনুরূপ আরও দশটি পরিবারের প্রতীভূ। 'নজিবর রহমান একটি গোটা সমাজকে চিত্রিত করেছেন, যে সমাজ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত কিংবা শিক্ষিত হলেও সংস্কার মুক্তি তাদের পক্ষে অসম্ভব; ধর্মীয় বিশ্বাসে ও সংস্কারে তারা স্থবির, সনাতন বিশ্বাসের ঊর্দ্ধে জীবনকে তুলে ধরা তাদের পক্ষে অসাধ্য।'[২২১] ১৯১৪ সালের মুসলমান নারীরা এক রকম বদ্ধ জীবন যাপন করত। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাদের বিনোদনের কোনো বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। স্বামীরা স্ত্রীদেরকে অন্তঃপুরবাসিনী, প্রতিপ্রাণা, সতী-সাবিত্রী হিসেবে দেখতে ও রাখতে চাইত। *আনোয়ারা* উপন্যাসে আনোয়ারাকে সতী-সাবিত্রী, ধার্মিক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। স্বামীরা নিজ নিজ স্ত্রীদেরকে অনুরূপ গুণের অধিকারিণী হিসেবে দেখতে চাইতেন। সেই লক্ষ্যে বেশিরভাগ শিক্ষিত পরিবারে স্বামীরা স্ত্রীদেরকে একটি করে *আনোয়ারা* উপন্যাস উপহার দিতেন। নারীরাও এটাকে সদর্থকভাবে গ্রহণ করেছিল। ফলে উপন্যাসটি সে সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। 'জনপ্রিয়তার দিক থেকে উপন্যাসটিকে শীর্ষ স্থানীয় বলা যেতে পারে।'[২২২] *আনোয়ারা* উপন্যাসটি পারিবারিক জটিলতাসমৃদ্ধ। সামাজিক সাম্যহীনতা, বিপত্নীজাত ভয়াবহতা প্রভৃতি অঙ্কনে ঔপন্যাসিক বিচিত্রসমূহকে আশ্রয় করেছেন। আনোয়ারা উপন্যাসের কাহিনি নানাদিকে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। তারই সূত্র ধরে জীবনের পরিধিকে সমগ্রভাবে ধরার জন্য সৃষ্টি হয়েছে প্রাসঙ্গিক চরিত্রসমূহ।[২২৩] লেখক কীভাবে সেটাকে রূপায়িত করেছেন তার কলমস্পর্শে এখানে আলোচনায় তা উঠে আসার প্রয়াস পাবে।

বিমাতা মানেই বাঙালি সমাজে শত্রুবৎ, কদাচিৎ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়। আনোয়ারা উপন্যাসে নায়ক চরিত্র 'নূরুল এসলাম' এবং নায়িকা চরিত্র 'আনোয়ারা' উভয়ের বিমাতাই চিরন্তন বাঙালি সমাজের বিমাতা শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। উত্তরসূরী এবং সে সূত্র ধরে নুরুল-এর

বিমাতাকন্যা 'সালেহা'ও একপর্যায়ে জড়িয়ে পড়ে। তাই *আনোয়ারা* উপন্যাসের চিরায়ত এই খল-চরিত্রদ্বয়ের একজন আনোয়ারার বিমাতা 'গোলাপজান' এবং বিধবা ও বৈষ্ণবী শ্রেণিপ্রতিনিধি 'দুর্গা'কে নিয়ে আলোচনায় প্রয়াস পাব।

আনোয়ারা উপন্যাসে 'গোলাপজান' চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যে, সমাজে কিংবা পরিবারিক ইতিহাসের ধারায় বিমাতাদের প্রতিনিধি এবং প্রতীকী চরিত্র। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা বিমাতাদের যেমন সর্বদা নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তেমনি বিমাতাও ইতিবাচক হবার ব্যাপারে ততটা সচেতন নয়; যতটা হওয়া উচিত ছিল। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকেই 'গোলাপজান' চরিত্রটির সাক্ষাৎ মেলে। *আনোয়ারা* উপন্যাসটির নায়িকা ও কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র। আনোয়ারার অন্তরঙ্গ বান্ধবী হামিদা। হামিদার পিতা-মাতার মাঝে আনোয়ারার বিয়ে বিষয়ক কথোপকথনের ভেতর দিয়েই 'গোলাপজান' চরিত্রটির পরোক্ষ আগমন উপন্যাসটিতে। এই পরোক্ষ আগমনের ভেতর হতেই লেখক তাকে নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

> ভূঞা সাহেব হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া রূপে মজিয়া জাফর চোরের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়াই কি আনোয়ারার মত বেহেস্তের হুরকে তাহাদেরই ঘরে বিবাহ দিবেন?[২২৪]

উক্ত উদ্ধৃতিটির ভেতর দিয়ে ঔপন্যাসিক একই সঙ্গে অনেকগুলো তথ্য দিয়েছেন। প্রথমত গোলাপজান নামকরা ডাকাত ও চোর জাফর বিশ্বাসের কন্যা। দ্বিতীয়ত ভূঞা সাহেব গোলাপজানের বংশ পরিচয় জানা সত্ত্বেও গোলাপজানের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেছেন। অর্থাৎ গোলাপজান যথেষ্ট সুন্দরী তা লেখক প্রথমেই বলে নিয়েছেন। এরপর আরও একটা বিষয় তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন আনোয়ারাও সৌন্দর্যে বিমাতা অপেক্ষা কম নয়। উপরন্তু তাকে বেহেস্তের হুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদেও আনোয়ারার বিমাতা গোলাপজানকে পরোক্ষভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে বিমাতার আচরণের স্বরূপ খোলাসা হতে প্রয়াস পেয়েছে। আনোয়ারার দাদিমা কাছে বসিয়া ছিলেন, তিনি কহিলেন,

> 'কি জানি মা, কিসে যে কি হইল কে বলিবে? বৌয়ের দিনরাত কথার খোঁচায় বাছার আমার কলেজা ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। গত রাতে ভাত খাইতে দেরী হওয়ায়, বৌ মেয়েকে অকারণে যেরূপ ঘেন্না দিয়া কথা বলিয়াছে, তাহা শুনিলে বুক ফাটিয়া যায়।'[২২৫]

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হামিদার বাবা-মার মাধ্যমে আর তৃতীয় পরিচ্ছেদে হামিদার মাতা ও আনোয়ারার দাদিমার কথোপকথনের ভেতর দিয়ে গোলাপজানের নেতিবাচক দিক ধীরে ধীরে প্রকট করা হয়েছে। দাদিমার মুখে উচ্চারিত 'বৌয়ের' দ্বারা গোলাপজানের কথা বলা হয়েছে। বিমাতারা সবময় খোঁচা দিয়ে কথা বলেন, সেটাই বোঝানো হয়েছে। এবং বিমাতার খুব ছোটখাট বিষয় নিয়ে খোঁচা দিয়ে থাকেন, তা ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ ও সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছেন; দেরিতে ভাত খাওয়া। কিন্তু আনোয়ারার অসুস্থ হবার সামনে ও পেছনের ঘটনাই বলে দেয় আনোয়ারার অসুস্থ হবার কারণ কেবল বিমাতার গালাগালি নয়, নুরুল এসলামই মূল কারণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে লেখক গোলাপজানের পুরো জীবনেতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন। লেখক বারবার তার সৌন্দর্যের খ্যাতি করে গেছেন। সেই সঙ্গে তার নেতিবাচক দিকগুলোও একে একে তুলে ধরেছেন। তার প্রথমবার বিয়ে হয়েছিল দশ/এগার বছর বয়সে মেহের আলীর সঙ্গে। সেখান থেকে গোলাপজান ভরা নদী সাঁতরিয়ে পিতৃগৃহে চলে আসে। এর পর তার বিয়ে হয় নিজ গ্রামের নবীবক্সের সঙ্গে। তাকে বিয়ে করতে সবার আগ্রহের কারণ-

১. গোলাপজান ভুবনমোহিনী সুন্দরী; ছোটলোকের ঘরে ঈদৃশ সুন্দরী মেয়ের জন্মলাভ খুব কম দেখা যায়।[২২৬]

২. গোলাপজান প্রসিদ্ধ সুন্দরী।[২২৭]

৩. গোলাপজানের রুপে কি যেন এক মাদকাশক্তি ছিল।[২২৮]

যে সৌন্দর্যের কারণে মেহের আলী ও নবীবক্স গোলাপজানকে বিয়ে করেছিল, সেই কারণেই সম্ভ্রান্ত খোরশেদ ভূঞা-আনোয়ারার পিতা তাকে বিয়ে করে। তৃতীয় পরিচ্ছেদেই গোলাপজানের সরব ও প্রত্যক্ষ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এবং আনোয়ারার সঙ্গে তার নেতিবাচক আচরণের অন্যতম এবং প্রথম কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে 'বিজাতীয় বিদ্বেষবিষ'। 'বিজাতীয় বিদ্বেষবিম্ব' বলতে আনোয়ারার সৌন্দর্যের প্রতি তার বিষদানলের কথা বলা হয়েছে। অত্যন্ত মুখরা রমণী হিসেবে লেখক তাকে তুলে ধরেছেন। কেবল মুখরা নয় সেইসঙ্গে গর্ব নিঃসঙ্কোচ ও ঝাঁঝালো প্রকৃতিকেও দাঁড় করেছেন।

> না, তাহারা আর অন্যায় করিবে কি? তাহারা পীর-মোরশেদের মত শুইয়া বসিয়া খাইলে কোন দোষ নাই? আর আমি রাত-দিন আগুনের তাতে চুলার গোড়ে বসিয়া বাঁদী-দাসীর মত খাটুনী খাটিয়া তা দিগন্তে দু'একটি কাজের কথা বলিলেই যত দোষ।[২২৯]

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আনোয়ারার পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোলাপজানের আচরণেরও বিকাশ ঘটেছে। সে আনোয়ারার পীড়ার প্রতি উদ্বিগ্ন হয় নি বটে, তবে একটা পরিবারিক দায়বোধ তার ভেতর কাজ করেছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এবং চক্ষুলজ্জাজনিত কারণে ভূঞা সাহেবকে মেয়ের অসুখ সারাবার জন্য ডাক্তার নিয়ে আসতে বলেছে। মানবীয় বিবেচনা সেখানে কাজ করে নি। কেননা ডাক্তার নিয়ে আসতে বলেছে ঠিকই সেইসঙ্গে তার ভাইয়ের কাছ থেকে হাওলাতকৃত টাকাও দিয়ে দিতে বলেছে। তার ভাষায়-

> আমি ভাল মুখে বলিতেই, আমার ভাইয়ের বিনা সুদের হাওলাতি টাকা শোধ করিয়া, যাহা মনে চায়, তাহাই যেন করা হয়।[২৩০]

ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদে গোলাপজানের উপস্থিতি নেই। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নুরুল এস্‌লামের পারিবারিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে সপ্তম পরিচ্ছেদে পীড়িত আনোয়ারার সঙ্গে নুরল এসলামের সাক্ষাৎ ঘটেছে আনোয়ারার সৌন্দর্যের কিছুটা বর্ণনাও পাওয়া যায়। অষ্টম পরিচ্ছেদে আনোয়ারার মনে নুরল এস্‌লামের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে প্রেমাবেগের সূত্রপাত ঘটেছে। নবম পরিচ্ছেদে লেখকের বর্ণনা অনুসারে পরোক্ষভাবে জানা যায় গোলাপজান পিতার গৃহে অবস্থান করছে। দশম পরিচ্ছেদেও গোলাপজান অনুপস্থিত। সেই অধ্যায়ে নুরল এস্‌লামের প্রতি আনোয়ারার প্রেম ঘনীভূত হয়েছে। এরপর লেখক 'বিবাহ-পর্ব' নাম দিয়ে পুনরায় প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে শুরু করেছেন। গোলাপজানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এই পরিচ্ছেদে বর্তমান। গোলাপজান তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে আনোয়ারার লোকজন তো তারই আত্মীয়। তাদেরকে যথাযথ আপ্যায়নে কোনো কার্পণ্য লক্ষ করা যায় না।

> ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহোপলক্ষে লোকজন আসিয়াছে, তাই গোলাপজান আজ পরমানন্দে তাহাদের নাস্তার আয়োজনে ব্যস্ত।[২৩১]

'বিবাহ-পর' দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে হামিদা ও তার স্বামী আমজাদ হোসেন আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। সেখানে গোলাপজান নেই। চতুর্থ পরিচ্ছেদেও তার উপস্থিতি নেই। এই পরিচ্ছেদে নুরল এস্‌লাম ও আমজাদ হোসেনের পরিচয় এবং আমজাদ হোসেনের অসুস্থতা বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে নুরল এস্‌লামের আমজাদের প্রতি যত্নশীলতা এবং তাদের ঐতিহ্য, বাড়ির, প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে। আনোয়ারার বিয়ের উপস্থাপনও এই অধ্যায়ে হয়েছে। 'বিবাহ-পর্ব' অধ্যায়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আনোয়ারার বিয়ে সংঘটিত হচ্ছে এবং এই অধ্যায় বিয়ের কনের মাতা হিসেবে তার উপস্থিতি এবং আনোয়ারার বিয়ে সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের বর্ণনায়-

Dhaka University Institutional Repository

> কেবল একটি স্ত্রীলোক আজ আন্তরিক আনন্দিতা না হইলেও কেবল লোকলজ্জার ভয়ে মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।[২৩২]

সপ্তম পরিচ্ছেদে আনোয়ারার ফুলশয্যা। অষ্টম পরিচ্ছেদে আনোয়ারার ও নুরল এস্‌লামের বিবাহপূর্ব পরস্পরের প্রতি পূর্ব অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। এরপর শুরু হয়েছে 'ভক্তি-পর্ব'। ভক্তি-পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদে নুরল এস্‌লামের কর্মক্ষেত্রে আনোয়ারার সভক্তি পত্র প্রদান। ভক্তি-পর্বের দ্বিতীয় পর্বে রচিত হয়েছে আনোয়ারার বিয়ের চার বছর পরের চিত্র। এই পরিচ্ছেদে পুনরায় গোলাপজানের অনুরূপ নুরল এস্‌লামের বিমাতার সকোপ, সরোষ উপস্থিতি প্রতিভাত হয়েছে। সকোপ ও সরোষ প্রকাশিত হয়েছে কন্যা সালেহার সঙ্গে তার কথোপকথনে। মেয়েকে বলেছে-

> দুইদিনপরে আমাদিগকে বৌ-এর হইয়া সংসারে থাকিতে হইবে। একটু আগেই এক জোড়া কাপড় দিয়াছে, তাই তাহার পরনে সয় নাই। এমন ছোট লোকের মেয়ে কি আছে![২৩৩]

ভক্তি-পর্বের তৃতীয় পরিচ্ছেদে, নুরল এস্‌লামের বিমাতার ক্রোধ তাদের স্বামী-স্ত্রীর প্রতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। বিমাতা তাদের পরিত্যাগ করেছে, তাদেরকে নির্দিষ্ট দিনের ভেতর নির্দিষ্ট টাকা দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়েছে পঞ্চম পরিচ্ছেদে সালেহার বিয়ের ব্যাপারে কথা হয়েছে এবং বিয়ে সংঘটিত হয়েছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ভ্রাতুষ্পুত্র খাদেমের ব্যবসার বিষয় স্থান পেয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে খাদেমের বন্ধু আড্ডায় কয়েকজন সুন্দরী রমনীর সঙ্গে আনোয়ারার সৌন্দর্য উপস্থাপন। অষ্টম পরিচ্ছেদে খাদেমের বন্ধু আব্বাস আলী চুপিসারে আনোয়ারাকে দর্শন করেছে। নবম পরিচ্ছেদে গোলাপজানের অনুরূপ আরেক নারী চরিত্র 'দুর্গা' বৈষ্ণবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দুর্গাকে 'আনোয়ারা' হস্তগত করা বাবদ চুক্তি সংঘটিত হয়েছে। দশম পরিচ্ছেদে নুরুল এসলাম কলকাতা থেকে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দুর্গার অভিসন্ধি পূরণে আনোয়ারার বাড়িতে গমন। একাদশ পরিচ্ছেদে নুরল এসলামকে আরোগ্য করার প্রয়াসে সালেহার স্বামী-আমজাদ হোসেনের আগমন ঘটেছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে পুনরায় নুরল-গৃহে গমন ও আনোয়ারার খোঁজ-খবর সংগ্রহ। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আবার দুর্গা নুরল-গৃহে প্রবেশ এবং সেখান থেকে আনোয়ারার হুকুমে দাসী দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। দুর্গার আনোয়ারাকে বিপদগামী করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে। নুরল এসলামের মাতার সঙ্গে যোগসাজোস স্থাপন। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে আনোয়ারা দুর্গার অভিসন্ধির শিকারের প্রাথমিক ধাপে অবস্থান করেছে। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আনোয়ারা প্রভাবিত হয়ে স্বামীর মঙ্গলার্থে আরোগ্য দুর্গার পরামর্শ শুনে তদানুযায়ী কর্ম করতে উদ্যোগী হয়েছে। ষোড়শ পরিচ্ছেদে স্বামীকে লক্ষ করে অন্তিমপত্র লিখন। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আনোয়ারা দুর্গার যোগসাজোসে আব্বাস আলীদের দ্বারা হরিত হয়েছে অষ্টাদশ

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদে আনোয়ারা উদ্ধার। ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে আনোয়ারা উদ্ধারের আদ্যোপান্ত কাহিনি বর্ণনা। বিংশ পরিচ্ছেদে অপরাধীদের শাস্তির উদ্যোগ গ্রহণ। একবিংশ পরিচ্ছেদে রহমতুল্লার ছেলে আব্বাস আলীকে মামলা থেকে ছাড়ানোর উদ্যোগ। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে আনোয়ারার কোর্টে জবানবন্দী এবং আব্বাস আলী ও দুর্গা বৈষ্ণবীর প্রতি কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে ৭ বছর, কলিম ও খাদেম আলীর প্রতি ৪ বছরের কারাবাসের আদেশ জারি। তিন পর্বের মধ্যে ভক্তি-পর্বে গোলাপজান চরিত্র সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রথম পর্ব এবং শেষপর্বে গোলাপজান চরিত্রটির উপস্থিতি প্রতিভাত হয়। মাঝের একটি পর্ব যার নাম 'ভক্তি-পর্ব'-এই পর্বে গোলাপজান চরিত্রের উপস্থিতি কিংবা কোনোরূপ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় না। 'পরিণাম-পর্ব-এর প্রথম পরিচ্ছেদ। নুরল এসলামের কর্মক্ষেত্রের বর্ণান এবং সেখানে সহকর্মীদের দ্বারা ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার সূচনা পর্বের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অফিসের কর্মচারীদের দ্বারা 'আনোয়ারা'র ওপর কলঙ্ক লেপন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্বামী কর্তৃক কিছুটা নিগৃহীত। চতুর্থ পরিচ্ছেদে সহকর্মীদের দ্বারা অফিসের টাকা লুণ্ঠন এবং তার দায়ভার নুরল এসলামের ওপর অর্পণ। পঞ্চম পরিচ্ছেদে নুরল এসলামের বিপদের কথা সালেহা ও তার স্বামী আমজাদের কাছে পৌঁছেছে এবং আমজাদ যথাসাধ্য মামলা থেকে খালাস করানোর চেষ্টা করার প্রতিজ্ঞা। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নুরল এসলামের স্বীকারোক্তি, অপরাধী প্রমাণিত। সপ্তম পরিচ্ছেদে নুরল এসলামকে জেলে চালান করা হয়েছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে নুরল এসলামের আঠারো মাসের কারাবাসের হুকুম। ভূঞা সাহেবের উপস্থিতি এবং আনোয়ারা পুনঃপুন মূর্ছা। নবম পরিচ্ছেদে নুরল এসলামের দায়মুক্তির জন্য আটহাজার টাকার যোগাড়-যন্ত্রের সবার প্রচেষ্টা। দশম পরিচ্ছেদে আনোয়ারার শাড়ি বিক্রয়কে কেন্দ্র করে নুরল এসলামের অফিস থেকে হারানো টাকার রহস্যের খোঁজপ্রাপ্তি। একাদশ পরিচ্ছেদে নুরল এসলামের বেকসুর খালাস ও অপরাধীদের শাস্তি। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে স্বামীর প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে গৃহসজ্জা। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে আনোয়ারা ও নুরল এসলামের পুনঃমিলন। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে নুরল এসলামের স্বাধীনভাবে নিজের ব্যবসা আরম্ভ। ষোড়শ পরিচ্ছেদে পুত্রের মুখে ক্ষীর দেওয়া উপলক্ষে সই হামিদার গৃহে গমন। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আনোয়ারার বিক্রয় করা অলঙ্কার ও শাড়ি ফেরত পাওয়া। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে নুরল এসলামের ব্যবসায় সমৃদ্ধি লাভ। আনোয়ারার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে এই পরিচ্ছেদে এবং তাকে দেখার জন্য ও পাট কেনার উদ্দেশ্যে নুরল এসলামের শ্বশুরবাড়ি মধুপুরে গমন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে 'গোলাপজান' চরিত্রে নেতিবাচক দিকটি প্রকটিত ও প্রস্ফূটিত হয়েছে। শাশুড়ির কাছে নুরল এসলামের ব্যবসার টাকা রেখে স্থানান্তরে গেলে, সেই টাকা গোলাপজানকে অর্ধমের প্রতি উদ্দীপ্ত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

রাশিকৃত রৌপ্যখণ্ড দীপালোকে ঝক্‌ঝক করিতেছে। গোলাপজান একদৃষ্টে তৎপ্রতি চাহিয়া আছে। এত মুদ্রা এক সঙ্গে সে কখনও দেখে নাই, আজ দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতেছে![২৩৪]

গোলাপজানের ক্ষেত্রে 'অর্থই অনর্থের মূল' কথাটি প্রযোজ্য। দারিদ্র্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে এক সময় হঠাৎ অর্থের সন্ধান পেলে রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে লোভ সামলানো দায় হয়ে যায়। গোলাপজানও নিজেকে সম্বরণ করতে পারে নি। তাই নিজের ভেতর জন্ম নেওয়া সেই লোভকে স্বামীর ভেতর প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছে।

হায়! উদ্দাম-প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় সে আর সাধের মঙ্কল চাপিয়া রাখিতে পারিল না।
প্রকাশ্যে পতিকে কহিল, "এ টাকা গুলি রাখা যায় না?"[২৩৫]

গোলাপজানের আচরণে তীব্র ঝাঁঝালো স্বরের আভাস পাওয়া যায়। বক্রকটাক্ষ ও তীব্র বিদ্রূপবানে স্বামীকে উদ্দীপ্ত করেছে। স্বামীর পৌরুষকে আঘাত করে তাকে সহকারিতা করার জন্য রাজি করিয়েছে। গোলাপজানের পরামর্শক্রমে ছুরি দ্বারা মেয়ে জামাইকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। এবং সে অনুসারে কাজ করেছে। এখানে তার ভেতর হঠাৎ করে জেগে উঠতে দেখা যায় পূর্ব পুরুষের রক্তকে। বংশানুক্রমিক প্রবাহিত সাহসের ওপর ভর করে সে জামাই হত্যায় অগ্রসর হয়েছে। তার সাহসের উৎস সন্ধান করলে দেখা যায়, তার সাহস বংশানুক্রমিক।

আমি জাফর বিশ্বাসের কন্যা। আমার কথামত কাজ করিলে ভূতেও জানিতে পরিবে না,
তোমার গায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগিবে না।[২৩৬]

তবে তাকে আনোয়ারার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ব পরিকল্পনার কথাও লেখক জানিয়েছেন। সৎকন্যা হলেও তাকে জলে ফেলে দিতে চায় নি। তার ভবিষ্যৎ যেন নষ্ট না হয় সে জন্য সে পূর্বের সেই ভ্রাতুষ্পুত্র ফয়েজ উল্লাহর সঙ্গে পুনরায় বিয়ে দিবে বলে পরিকল্পনা করে রেখেছে।

ফয়েজ উল্লার বউ সরিয়াছে, তোমারে বিধবা মেয়েকে তাহার সহিত বিবাহ দিয়া আমাদের চির আশা পূর্ণ করিব।[২৩৭]

গোলাপজান প্রফুল্লচিত্তে নিজের ইচ্ছে পূরণের আশায় ঘুমন্ত জামাইয়ের ঘরে প্রবেশ করেছে হত্যার জন্য। কিন্তু নারীসূলভ কমনীয়তা ও নমনীয়তার কারণে সে প্রথমে 'থরথর' করে কেঁপে বসে পড়েছে। কিন্তু বংশীয় সত্তা যখন জেগে উঠেছে তখন সে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু নিয়তির নির্দেশে

সে জামাইকে হত্যা না করে ভুলক্রমে নিজ ছেলে বাদশাহকে হত্যা করে ফেলেছে। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে 'গোলাপজান' চরিত্রের পরিণতি রচিত হয়েছে।

> জর্জ সাহেব বিচারান্তে হত্যাকারীদ্বয়ের প্রতি যাবজ্জীবন দীপান্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন।[২৩৮]

দুর্গা রাজবংশী ধীবরের মেয়ে। দেখতে দুর্গার মত সুন্দর ছিল বলে পৈত্রিক গুরুদেব তার নাম রাখেন 'দুর্গা'। ভালো বংশে জন্মগ্রহণ করেও বাল্যকালে বিধবা হওয়ায় ধীরে ধীরে সে ভীষম খল-নারীতে পরিণত হয়। বাল্যকালে বিধবা হয়েছিল বলে ভরাযৌবনের উদ্দামতা শৃঙ্খল মানে নি বা মানাতে পারে নি। জড়িত হয়ে পড়েছে একের পর এক অনৈতিক সমাজবহির্ভূত সম্পর্কে। ফলে চরিত্রটি সমাজের সবার চোখে হয়ে উঠেছে খল। লেখক তার খলতার শুরুটা তুলে ধরেছেন এভাবে-

> বাল্যকালে বিধবা হইয়া ভরাযৌবনে প্রতিবেশী এক স্বজাতি যুবকের অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া আসাম নওগাঁয় চলিয়া যায়।[২৩৯]

বর্তমানে সমাজের প্রেক্ষাপটে অবৈধ প্রণয় ক্রমান্বয়ে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কিন্তু সেই যুগে দুর্গার ঐরূপ কাজ নিঃসন্দেহে বড় কঠিন ছিল। শুধু সেজন্য আমরা তাকে খল-নারী বলতে পারি না। এরপর সে আরও তিনবার প্রণয় শিল্পীকে পাল্টিয়েছে। এই বারম্বার তার গতিপথ পরিবর্তনকে যদি আমরা নারী স্বাধীনতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয় হয় তবে দোষের অনেকটা উপশম হয়। কিন্তু ভিক্ষা ও কামরূপী মন্ত্রে চিকিৎসার ভান, দুষ্টু লোকের অনুগ্রহে গ্রাসাচ্ছাদন এবং কুকাজে অন্যদের সহায়তা খল পর্যায়ে পড়ে বৈকি।

> ভিক্ষা ও কামরূপী মন্ত্রে চিকিৎসা তাহার জীবিকা-নির্বাহের ভান মাত্র। হীরা যেমন সুন্দরের মাসী ছিল, দর্গাও সেইরূপ আব্বাস আলীর মাসী হইল এবং তাহার অনুগ্রহে মাসীর গ্রাসচ্ছাদন চলিতে লাগিল।[২৪০]

বিশাশুড়ি কন্যা সালেহার স্বামী খাদেম। খাদেমের বন্ধু আব্বাস আলীর মৌখিক ডাকের খালা দুর্গা। বন্ধু খাদেমের কাছে আনোয়ারা-র রূপের কথা শুনে এবং পরে দেখে আসক্ত হয়। তার এই অবৈধ লালসা চরিতার্থ করতে কুচক্রী দুর্গা সম্মত হয়ে সেমতো কাজে এগিয়ে চলে। একদিকে আব্বাসের অসামাজিকতাকে প্রশ্রয় প্রদান অপর দিকে তার কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ উভয় খল বৈশিষ্ট্যকে ঔপন্যাসিক সযতনে তুলে ধরেছেন।

> দুর্গা যাহা মনে করে, তাহা সম্পন্ন করে। তবে আজকার ভাবে যাহা বুঝিলাম, তাহাতে কাজ হাসিল করিতে বিলম্ব ঘটিবে।[২৪১]

Dhaka University Institutional Repository

দুর্গা, আনোয়ারাকে বশে বা হাতে আনবার জন্য বারবার বৈষ্ণবীর বেশে তার বাড়ি গিয়ে আলাপ ও খাতির করতে চেয়েছে। প্রথম ক'বার ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তার গ্রাসাচ্ছাদনের মালিক আব্বাসকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজের স্বার্থকে টিকিয়ে রেখেছে এভাবে-

তোমার কার্য হাসিলের জন্য আমার রাত্রিতে ঘুম হয় না; নিশ্চিত থাকা দূরের কথা।[২৪২]

মানুষ যদি মানুষের কথা বুঝতে পারতো তাহলে জগৎ হয়ে উঠতো হট্টগোলের কুরুক্ষেত্র অথবা শান্তিময়। তাহলে দুর্গা বুঝতে পারত প্রার্থনারত আনোয়ারার চোখের পানি স্বামী অথবা নিজের মৃত্যু কামনার্থে নয় বরং স্বামীর রোগমুক্তির জন্য। তাই উক্ত ধারণার সুযোগ নিয়ে আনোয়ারার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে পাটকেল খেয়েছে দুর্গা। ফলশ্রুতিতে তার খল-বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে নগ্নরূপে।

আমার নাম দুর্গা বৈষ্ণবী। আমি এ অপমানের শোধ নিব, তবে ছাড়ব।[২৪৩]

দুর্গা প্রয়োজন কিংবা অপ্রয়োজনে জীবনের অনেকটা সময় দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছে। বাস্তব দুনিয়ার তাই অনেক জটিল ও কুটিল রীতিনীতি সে প্রত্যক্ষ এবং আয়ত্ত করেছে। সে আনোয়ারার সৎ-শাশুড়ি ও মেয়েকে দেখে অভিজ্ঞ চোখে ঠিক বুঝে নিয়েছে কাকে দিয়ে তার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। সে আনোয়ারার সৎ-ননদ সালেহাকে মনে মনে তার কাজ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে এবং সেইমত তাকে শুনিয়েছে যে, নুরল এসলামের অসুখ সারাবার ঔষধ সে জানে।

যাতে সারবে, আমি তাই বউটিকে বলতে গিয়েছিলাম, তা কালের দোষ। ভালো করতে গেলে লোকে মন্দ বুঝে।[২৪৪]

কুচক্রী দুর্গার দুনিয়ার চিরায়ত এই রীতি অবিদিত নাই যে কোনো কাজে একবার ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলে নিজের বুজুর্কী কমে যায। সালেহার কানে কোনো কথা পৌঁছা মানে আনোয়ারার কাছে যাওয়া। সেও জানে প্রতিপ্রাণা নারী স্বামীর আরোগ্য কামনার কথা শুনে স্থির থাকতে পারবে না এবং অচিরেই তাকে ডেকে পাঠাবে।

যাদু এরূপস্থলে ডাকামাত্র হাজির হইলে বুজুর্কী কমিয়া যায়, যত গৌণ করিব, ততই আগ্রহ হইবে। বাড়া আবেগের মুখে কাজ হাসিলের সুযোগ বেশী।[২৪৫]

খল-নারী দুর্গা, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আনোয়ারা-কে ঘরের বাহিরে এনে আব্বাসের হাতে তুলে দেওয়া। কাজে সফল হলে তিনশত টাকা নগদ দেওয়া হবে এরূপ চুক্তি হয়েছিল আব্বাসের সঙ্গে। এই

Dhaka University Institutional Repository

লোভে দুর্গা বৈষ্ণবীকে যখন আনোয়ারা বাড়িতে ডেকে আনে, তখন সে নুরল এসলামের রোগমুক্তির জন্য এমন দুটি উপায় বাতলে দেয় যেন তাকে গভীর রাতের অন্ধকারে একা বের হতে হয়। তাহলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে। একটি উপায় এরূপ-

> মৃতসঞ্জীবনী বলিয়া এক রকম গাছ আছে। অমাবশ্যার মাথায় দুপুর রাতে, এলো চুলে পূর্বমুখো হইয়া সেই গাছের শিকড় এক নিঃশ্বাসে তুলিতে হয়। সেই শিকড় বাটিয়া খাইলে সকল রোগের আরাম হয়।[২৪৬]

উপরিউক্ত মৃতসঞ্জীবনী গাছের ওছিলায় গভীররাতে সতী-সাধ্বী আনোয়ারাকে ঘরের বাইরে বের করে আনে দুর্গা বৈষ্ণবী। এটা তার খলতার বড় দিক, উপরন্তু তাকে তুলে দেয় পরপুরুষ আব্বাস-সহ অন্যদের হাতে। নিজে নারী হয়ে আরেক সতী নারীর এরূপ ক্ষতিসাধন খলতার শীর্ষ পর্যায়ে পড়ে। এবং এখানেই তার খলতার নিকৃষ্টতম পর্যায় পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দুর্গা স্বেচ্ছায় খলতার পর্যায়ে আসে নি। তাকে প্রভাবিত করা হয়েছে, বাধ্য করা হয়েছে। তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়েছে গ্রামের অসৎপর্যায়ের সমাজপতিরা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: *চরিত্রহীন* : কিরণময়ী

বাংলা সাহিত্যের এক জন অন্যতম কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। বাংলাসাহিত্যের শিলীন্ধ্র নয়, বরং একচেটিয়া ধারার অনবদ্য ঔপন্যাসিক তিনি। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অসামান্য সংবেদশীলতার অপূর্ব সম্মিলনে তাঁর উপন্যাস পেয়েছে নৈকষ্য শ্রী। পূজার বেদীতে নারীচরিত্রের মাতৃরূপ প্রতিচ্ছবি তাঁর উপন্যাসের পরতে পরতে। মানুষের অন্তরে তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস-সংস্কারের সঙ্গে প্রণয়াকাঙ্ক্ষার যে অবিরাম দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম তারই নানা দিক শৈল্পিককুশলতায় ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাসসমূহে। মানুষের অন্তরের বেদনাকে উপন্যাসে ধারণ করায়, তাঁর উপন্যাসগুলো পেয়েছে প্রবল ও অবিসংবাদিত জনপ্রিয়তা।

চরিত্রহীন তাঁর অন্যতম উপন্যাস। এই উপন্যাসে নারীচরিত্রসমূহের মধ্যে কিরণময়ী ও সাবিত্রীকে প্রধানা নারী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে আলোচনায় প্রাসঙ্গিকতায় 'কিরণময়ী' চরিত্রকে কেবল আলোচনার প্রয়াস পাব।যুক্তিবিদ্যানুসারে প্রত্যেক অপরাধের পেছনে নির্দিষ্ট কিংবা অনির্দিষ্ট ঘটনা বা ঘটনাবলি থাকে। অপরাধী সেগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং অনেকসময় নিরূপায় হয়ে মনের অজান্তে নানারকম অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। কিরণময়ী অপরাধের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে-ভালোবাসার অভাববোধ। তার ভালোবাসার অভাববোধ ত্রিমুখী।

Dhaka University Institutional Repository

এক. মা-বাবা হীন হওয়ায় তাদের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত।

দুই. স্বামীকে কেবল শিক্ষক হিসেবে পাওয়ায় তার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত।

তিন. প্রেমিকদের কাছ থেকে তার মতো করে ভালোবাসা না পাওয়া।

কিরণময়ী ছোটকালেই মা-বাবাকে হারিয়েছে। তাদের যত্ন, শিক্ষা ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে স্বামীগৃহে এসে ভেবেছিল ভালোবাসা পাবে। কিন্তু স্বামীগৃহে এসে স্বামীকে পেল না, পেল কেবল শিক্ষক। যে সারাক্ষণ তাকে বাধ্য করেছে পড়ালেখা করতে। ঘরে বিভিন্ন রকম অসংখ্য বইয়ের সম্ভার ছিল। অবসর সময়ে সে বই পড়ে সময় কাটাতো। কিন্তু সেই শিক্ষকও অসময়ে চলে যাবার উপক্রম হয়ে পড়লো। উপেন্দ্রকে ডেকে পাঠালো। উপেন্দ্র তার বিশেষ প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু। তার কাছেই সে মা, স্ত্রী ও বাড়িটা দেখভালের দায়িত্ব দিতে চায়।

আমার স্ত্রী কিরণ? হাঁ; ও তো আছেই। ওর বাপ মা কেউ বেঁচে নেই, ওকেও দেখো।[২৪৭]

উপেন্দ্র এক জন প্রথিতযশা উকিল। সে যখন হারানের চিঠি পেয়ে তার বাড়ি আসে তখন তার অসুখের মাত্রা অনেক বেড়েছে কিন্তু স্মৃতিশক্তি লোপ পায় নি। বেশ স্বাভাবিক কথাবার্তা বলতে পেরেছে। সেই উপেন্দ্রকে বলে তার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বলতে কেবল বাড়িটি তার নামে লিখে নিতে এবং তার পরিবার, বৃদ্ধ মাতা ও স্ত্রী কিরণের দেখভাল দায়িত্ব তার হাতে দিতে চায়। কিন্তু কিরণ উপেন্দ্রকে কখনো দেখে নি এবং তার কথাও তার স্বামী হারানের মুখে কখনো শুনে নি। তাই তার সঙ্গে প্রথম দেখাতেই কিরণময়ীর সঙ্গে তাদের এক ধরনের অপ্রীতিকর তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়। কিরণময়ীর মনে হয়, হারানের সিদ্ধান্ত সঠিক নয় এবং যাদেরকে সে কখনো দেখে নি, চেনে না, তাদের কাছে এই বাড়িটি চলে যাবে সেটা সে মানসিকভাবে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

১. কিরণময়ী একটু হাসিয়া বলিল, ওঃ এই! এর জন্যে লেখাপড়া করা! আচ্ছা উপীনবাবু, আপনি সমস্তই নিজের নামে লিখে নেবেন?[২৪৮]
২. এতদিন এত কষ্ট করেও যা করে হোক, দু'সন্ধ্যা দুমুটো জুটেছিল- এখন পথে দাঁড়াতে হবে। তাই হোক আপনারাই সমস্ত ভাগ করে নিন।[২৪৯]
৩. কিরণময়ীর দুই চোখ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। বলিল আমার আছে। মরণকালে মতিচ্ছন্ন হয়, আমার স্বামীর তাই হয়েছে, কিন্তু আপনারা লিখে নেবার কে?[২৫০]

স্বামী মারা গেলে স্ত্রী সম্পত্তির অধিকারী হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কেন স্ত্রী কিরণের নামে বাড়িটি না দিয়ে বন্ধু উপেন্দ্রকে এত দূর থেকে মৃত্যুপথযাত্রী হরেন ডেকে এনেছে, সেটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কথাটি ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যায় তা উপেন্দ্রের মুখ থেকে এসেছে। সে

Dhaka University Institutional Repository

বলে 'আপনি যদি নিজের অধিকার নিজে নষ্ট না করতেন হারানবাবুর এ সতর্কতার আবশ্যক ছিল না।' [২৫১]এই কথার অর্থ দাঁড়ায় হারান তার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারে নি। যার কারণটা হারান উপেন্দ্রকে বলে নি কিন্তু উপেন্দ্র ও সতীশ উভয়ই তা বুঝতে পারে। কারণটা ডাক্তার অনঙ্গ। তাই নিজের অধিকার নিজে নষ্ট করার করা বলতেই দপ করে জ্বলে উঠে কিরণময়ী।

> তীব্র কার্বলিকের গন্ধে সাপ যেমন করিয়া তাহার উদ্যত ফণা মুহূর্তে সম্বরণ করিয়া আঘাতের পরিবর্তে আত্মরক্ষার পথ অন্বেষণ করে, এই নিরুপমা, এই লীলা কৌশলময়ী, তেজস্বিনী যুবতী চক্ষের পলকে তেমনি সঙ্কুচিত হইয়া বলিল আমার কথা উনি কি বলেছে শুনি।[২৫২]

কিরণময়ী অচেনা দু'জন লোকের মুখে নিজের ব্যর্থতার কথা শুনে এবং তারা যে তার স্বামীর সমস্ত কিছু লিখে নেবে এটা সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। যদিও সে নিজেই সে জন্য দায়ী, তারপরও তখন সে বুঝতে পারে না যে, তার জন্য এই ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। তার ধারণা ছিল তার স্বামী তাকে ঠকাচ্ছে এবং মৃত্যুপথযাত্রী হওয়ায় তার মতিভ্রম ঘটেছে কিন্তু উপেন্দ্রের কথা থেকে বোঝা যায় যে, হারান তখনও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তি। তাই সে তার বাড়ি বাঁচাতে, মাকে ভালো রাখতে এবং স্ত্রী কিরণকে ঠিক রাখতে সে উপেন্দ্রকে ডেকে এনেছে এবং তার হাতে সমস্ত ভারার্পণ করেছে। সে উপেন্দ্রকে জানতো, সে জানতো উপেন্দ্রকে দায়িত্ব দিলে কোথাও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই বরং অনেক বেশি আস্থা তার প্রতি রাখা যায়। কিন্তু যেহেতু কিরণময়ী তার সম্পর্কে জানতো না, তাই তার মনে হয়েছে কে, কারা এসে হঠাৎ করেই তার ভবিষ্যতকে এক মুহূর্তে দখল করে তাদেরকে পথে বসাতে যাচ্ছে। তাই কিরণময়ীর মন বিদ্রোহ করে উঠে। প্রতিশোধপ্রবণ মন জেগে উঠে। সেই সঙ্গে নিজেকে নিজেই ধিক্কার দিতে থাকে তার দূরদর্শিতার অভাবে। মনে হয় নিজের ক্ষতি সে নিজেই করেছে। নিজেই যেন খাল কেটে কুমীর এনেছে তার ঘরে। এজন্য সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। মানসাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। সেই আগুনে পুড়িয়ে মারতে চায় সে সবাইকে।

> অন্ধকারে তাহার চোখ দুটো হিংস্র জন্তুর মতই জ্বলিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া কাহারো বক্ষস্থলে দংশন করিতে পারিলে সে বাঁচে। হাতের দীপটা উঁচু করিয়া ধরিয়া উন্মাদ ভঙ্গি করিয়া বলিল, আগুন ধরিয়ে দেবার উপায় থাকলে দিতুম। দিয়ো যেখানে হোক চ'লে যেতুম। ডাকাডাকি চেঁচাচেঁচি ক'রে একটু একটু ক'রে পুড়ে মরত, শত্রুতা করবার সময় পেত না। শীতের রাত্রেও তাহার কপালে মুখে ঘাম দিয়াছিল। সেগুলা হাত দিয়া মুছিতে মুছিতে সহসা নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, কেন সংবাদ দিতে দিলুম, কেন নিজের পায়ে কুড়ুল মারলুম; কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি সমস্তই ওই হতভাগী বুড়ীর কাজ! ছেলের সঙ্গে মতলব করে ওই এমন ঘটিয়েছে।[২৫৩]

কিরণময়ী ছেলেবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে অন্য এক আত্মীয়ের বাড়িতে মানুষ হয়েছে। এর পর বয়স বেশি না হতেই তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। সে আসে হারানের ঘরে। সেখানে তার ধারণা ছিল

Dhaka University Institutional Repository

কিছুটা হলেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাবে। নিজের ঘর পাবে, শাশুড়িকে পাবে অভিভাবক হিসেবে, ভালোবাসার অভাবও পূরণ হবে স্বামীর মাধ্যমে। কিন্তু দেখা যায় বিপরীত চিত্র। স্বামী হারান বইয়ের পোকা। স্ত্রীকেও সে বইয়ের গুণিজন বানাতে চায়। সারাক্ষণ তাই নিজেও পড়ে স্ত্রীকেও পড়ায়। একদিনের জন্যও স্বামীর ভালোবাসা পায় না। শাশুড়ির কাছে পায় চরম নির্যাতন। ভালোবাসার পাবার যে আকুল বাসনা কিরণহৃদয়ে জেগেছিল, তার নিবৃত্তি কোথাও হয় না। বিয়ের সময় যে স্বামীগৃহে এসে ঢুকেছে, সেখান থেকে সে বেরও হতে পারে না। কোথায় যাবে সে, যাওয়ার জায়গা একটি ছাড়া আর নেই। সবাই যেখানে এক বারই যায়। তাই স্বামী অসুস্থ হলে তাকে দেখতে আসে অনঙ্গ ডাক্তার। তার কাছেই সে ভালোবাসার অতৃপ্ত বাসনাকে পূরণ করে নিতে চায়। তার শাশুড়ি এবং স্বামীও সেটা এক সময় জানতে ও বুঝতে পারে। শাশুড়ি কিছু বলে না সন্তানবাৎসল্যের কারণে। কারণ অনঙ্গ ডাক্তার নিয়মিত তার ছেলেকে দেখতে আসে, ঔষধের ব্যবস্থা করে এবং সংসারের অর্ধেক খরচ সেই বহন করে। তাই জেনেও শাশুড়ি না জানার ভান করে। বিনিময়ে সে তার ভালোবাসার বীজ বপন করতে থাকে অনঙ্গ ডাক্তারের হৃদয়ে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সে বুঝতে পারে, যে প্রকারের ভালোবাসা সে অনঙ্গ ডাক্তারের কাছে প্রত্যাশা করেছিল সেটা অনঙ্গ ডাক্তারের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, কিন্তু তার কারণে যেহেতু স্বামীর ঔষধপত্রের ব্যবস্থা হচ্ছে এবং সংসারের খরচ চলছে , উপরন্তু শাশুড়িও যে সেটা চাচ্ছেন তা সে বুঝতে পারে বলেই সে অনঙ্গের সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয়ে মেতে উঠে। বিষয়টি হারানের কাছেও অজ্ঞাত থাকে না। তাই সে বিশ্বস্ত উপেন্দ্রকে ডেকে আনে এবং তার হাতে সব কিছু সমর্পণ করে দেয়। এমন কি স্ত্রী ভারও।

১. এমনি করিয়াই সংসারের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য হইতে নির্বাসিতা, শুষ্ক কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল এবং এমনি স্নেহ প্রেমে বঞ্চিত হইয়াই সে নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মও জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছিল। অঘোরময়ী সমস্ত জানিতেন। তাঁহার রূপসী বধূ যে ইদানীং সতীধর্ম্মেরও সম্পূর্ণ মর্য্যাদা বহন করিয়া চলে না, ইহাও তিনি বুঝিতেন।[২৫৪]

২. যে ডাক্তার হারানের চিকিৎসার করিতেছিল, সে যে কি আশায় বিনা ব্যয়ে ঔষধ-পথ্য যোগাইতেছে, কেন সংসারের অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করিতেছে, ইহা তাঁহার অগোচর ছিল না।[২৫৫]

কিরণময়ী যখন উপেন্দ্রকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পায়, তখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তার এক সময় মনে হয় সে সারাজীবন ধরে যেটা এখানে সেখানে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেটা কেবল উপেন্দ্রের কাছেই পাওয়া যাবে। তার মধ্যে সে সত্যিকারের প্রেমিক পুরুষ দেখতে পায়, যাকে সে এতদিন ধরে খোঁজ করে বেড়িয়েছে, এই উপেন্দ্রই সেই পুরুষ। অনঙ্গ ডাক্তারকে তাড়াবার জন্য, তাকে সরাবার জন্য কোনো উপায় কিরণ কখনো খুঁজে পায় নি। কিন্তু উপেন্দ্রকে জানার পর মুহূর্তেই সে সিদ্ধান্ত নিতে সাহস ও ভরসা পায়। সেকারণেই সে অনঙ্গকে ফিরিয়ে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

> বুকের ভিতরটা এমনি অশান্ত হইয়া উঠিল যে দুই বাহু দিয়া সজোরে চাপিয়া রাখিয়া এই বিদায়ের পালাটা একদিন তাহাকে সমাপন করিতেই হইবে, ইহা সে নিশ্চয় জানিত, কারণ আগাছা তাহার সর্ব্বদেহে মূল বিস্তার করিয়া তাহাকে নিরন্তর আচ্ছন্ন করিতেছে এ কথা সে যতই মনে করিয়াছে, ততই মন তাহার তিক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি এই বীভৎস বন্ধন-পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবার মত জোর সে নিজের মধ্যে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় নাই।[২৫৬]

উপেন্দ্রকে ও সতীশকে পাবার পর কিরণময়ীর জীবনের বলা চলে, দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়। স্বামী বিষয়টি কী! তার উপলব্ধিতে আসে। সত্যিকারের প্রেম কী! তাও তার উপলব্ধিতে আসে। বিশেষত উপেন্দ্রের স্ত্রী সুরবালার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে তার চিন্তাচেতনার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। সুরবালার ধর্মীয় ও স্বামীর প্রতি বিশ্বাস যেন তাকে একটা বেশ নাড়া দেয়। মৃতপ্রায় স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য সে মরিয়া হয়ে সেবা দিতে শুরু করে। কিন্তু যমদূতের সঙ্গে পেরে উঠে না। হারানের মৃত্যুর পর সতীশের বিদায় ক্ষণে সে পুনরায় নিজেকে আবিস্কার করে প্রেমীরূপে, সতীশের কথা থেকে। সতীশকে সে ইতোমধ্যে ছোট ভাই হিসেবে গ্রহণ করে। তার কাছ থেকেই সে প্রথমবারের মতো জানতে পারে যে, সতীশ তাকে এবং উপেন্দ্রকে সমানভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। সতীশের ভাষায়-

> কিরণময়ী চোখ বুঝিয়া, চৌকাঠে মাথা রাখিয়া নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার দুই কানের মধ্যে কেবলি প্রতিধ্বনি ঘুরতে লাগিল- আমি একজনকে ভাবলেই দু'জনকে দেখি।[২৫৭]

সতীশের উক্ত কথায় সে ভাবিত হয়ে পড়ে। সতীশ এক জনকে ভাবলে দু'জনকে দেখে, কথাটা হয়তো সতীশ কোনোরকম চিন্তা না করেই তুলনা অর্থে বলেছে কিন্তু কিরণময়ীর অন্তরে অঙ্কুরিত বীজ যেন জল পেয়ে বাড়বার সুযোগ পায়। তার ভালোবাসার হৃদয়কে কে যেন উস্কিয়ে দেয়। সতীশ সেটা জানতে পারে না কিন্তু কিরণময়ীর হৃদয়ে ঘণ্টা বেজে যায়। উপেন্দ্রকে নিয়ে তার অনেক দিন বাঁচার একটা তীব্র অথচ গোপন বাসনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। হারানের মৃত্যুর পর সে কাশী কিংবা বৃন্দাবন যেতে চেয়েছিল কিন্তু উপেন্দ্রকে পেয়ে সেই স্বপ্ন দেখলো অনেকদিন বেঁচে থাকার। উপেন্দ্রের ভালোবাসা পাবার। উপেন্দ্রকে পাবে কিনা সে জানে না, কিন্তু তাকে ছাড়া তার চলবে না সেটা সে বুঝে গেছে। তাই তার মনে প্রশ্ন জেগে উঠলে সতীশের কাছে সে বলে-

> এই পৃথিবীর সঙ্গে কারবার আমার বেশী দিনের নয়, দেনা-পাওনা চুকিয়ে নিতে এখনও ঢের বাকি। এই দীর্ঘ জীবনের হিসেব নিকেশ দোষঘাট ভুলভ্রান্তি হতেও পারে। তখন, তিনিই বা কি ব'লে দেবেন, আর আমিই বা কোন মুখে হাত পাতব? আবার গোড়া থেকে নিজের পথে নিজে চলতে হবে। [২৫৮]

ভালোবাসার মানুষ কাছে ভালোবাসা পেতে চাওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যাকে ভালোবাসা যায় তারও সম্মতি প্রয়োজন। কিরণময়ী উপেন্দ্রকে ভালোবেসেছে দুটো কারণে। কারণ দুটো হলো-

Dhaka University Institutional Repository

এক. তার ভালোবাসার বাসনা তীব্র এবং তা উপেন্দ্রর মাঝে খুঁজে পায়।

দুই. উপেন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, দায়িত্ব ও ভালোবাসাবোধ।

ভালোবাসার মানুষকে যেকোনো মূল্যে কাছে রাখতে চাওয়া সেটা গভীর ভালোবাসারই পরিচয় বহন করে। কিন্তু যদি কোনো কারণে তাকে কাছে রাখতে না পারা যায় কিংবা এক বারে হারিয়ে ফেলার ভয় থাকে অথবা প্রিয় মানুষটি যদি দূরে কোথাও চলে যায় তাহলে কেউ আত্মহননের পথ বেছে নেয়, কেউ বা শোকাতুর হয়ে উন্মাদপ্রায় হয়ে ওঠে, কেউ বা বিরহ যাতনায় ছটফট করে দিন অতিবাহিত করে প্রিয়মানুষের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। উক্ত সবগুলোই স্বীকৃত ভালোবাসার বিরহের নিদর্শন। কিন্তু যা সমাজ স্বীকৃত নয়, কিংবা প্রেমিক বা প্রেমিকা কর্তৃক স্বীকৃত নয় অথবা পরস্পরকে জানানোর ফুসরত না ঘটে তাহলে উক্ত প্রেমিক বা প্রেমিকা চেষ্টা করে তার প্রিয় কিছু বুকে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে। অথবা সেই পথ অনুসরণ করতে যা করলে প্রিয়মানুষটির সঙ্গে পুনরায় দেখা হবার কমপক্ষে ক্ষীণ সম্ভাবনাও থেকে থাকে। কিরণময়ীকে শেষোক্ত ধারা অনুসরণ করতে দেখা যায়। সে উপেন্দ্রের বিদায়লগ্নে তার কাছ থেকে দিবাকরকে চেয়ে নেয়। কারণ দিবাকর উপেন্দ্রর প্রিয় বিষয়টির একটি। এবং যাকে পেলে কোনো না কোনোভাবে উপেন্দ্রের কখনো না কখনো দেখা পাওয়া যাবেই। এটাই ছিল তার লক্ষ্য। তাই সে উপেন্দ্রকে বলে-

> কিরণময়ী তাহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কিংবা এতটা স্বচ্ছন্দে হ'তে পারে। দিবাকর ঠাকুরপো ত কলকাতায় থেকেই বি-এ পড়বেন স্থির হয়েছে, তাঁকে কেন আমার কাছেই রেখে দাও না? একটা অজানা বাসায় থাকার চেয়ে আমার চোখের উপর থাকা ত ঢের ভাল। যত্নও হবে, কলকাতায় একলা রাখার যে সব ভয় আছে, সে ভয়ও থাকবে না। বলিয়া সে উপেন্দ্রর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।[২৫৯]

নারীর সহজাত বৈশিষ্ট্য যে, তারা তাদের প্রিয়মানুষটির কাছে কেবল তারই গুণকীর্তন শুনতে আগ্রহী। কিন্তু তার সামনে অন্যের গুণ বর্ণনা করবে সেটা সে যত ধৈর্যশীলই হোক না কেন, তারও কিছুটা হলে খারাপ লাগে। তাই অনেক বুদ্ধিমতী হওয়া সত্ত্বেও কিরণময়ী এই বৈশিষ্ট্যের বাইরে নিজেকে নিয়ে যেতে পারে নি। সেও ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছে উপেন্দ্রের কাছে সুরবালার প্রশংসা শুনে। এটা নারীর স্বভাবসুলভ। যদিও তার এই ঈর্ষার ভিত্তি জোরালো নয়, তারপরও সে নিজেকে সংবরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তার স্বভাবহাসি মুহূর্তে মিলিয়ে গেছে। এবং সে যে সুরবালার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়, বরং বুদ্ধিবিবেচনায়, জ্ঞান ও গরীমায় তার চেয়ে ভালো সেটাই সে প্রমাণ করে দেবার জন্য সুরবালার মুখোমুখি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১. উপেন্দ্রর মুখে সুরবালার এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কিরণময়ীর মুখের দীপ্তি নিবিয়া গেল! অথচ, ইহাতে যোগ দেয়, তাহাও ইচ্ছা করিল, কিন্তু ঈর্ষার বেদনা সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া যেন কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল। সহসা সে কথা কহিতেই পারিল না।[২৬০]

২. এ কথাও সে মনে মনে বারবার বলিল, কিন্তু প্রেয়সী ভার্য্যার যে অমূল্য ঐশ্বর্য্যকে উপেন্দ্র ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ করে নাই, সে যে কিছুই নয়, তাহাকে সে যে চক্ষের নিমিষে পরাস্ত খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া তাহারই চক্ষের উপর ধুলার মত উড়াইয়া দিতে পারে, ইহাই সপ্রমাণ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাহার বুকের ভিতর প্রতিহিংসার মত গড়াইয়া বেড়াইতেছিল। কোন মতেই সে ইহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই।[২৬১]

উপর্যুক্ত উদাহরণ দুটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কিরণময়ী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং নারীসুলভ স্বভাববৈশিষ্ট্য থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে নি। উচ্চ শিক্ষা যে সবসময় উচ্চ চিন্তা ও আত্মোৎসর্গের কারণ হয় না, সেটা এখানে প্রমাণিত হয়। সুরবালার প্রতি তার হিংসা বা ঈর্ষা তাই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে কিরণময়ীর কাছে। সুরবালার মোকাবেলা না করে তাই সে ফিরে আসে। উপেন্দ্রকেও সে ছাড়ে না কথা না শুনিয়ে। নির্বোধ হওয়া সত্ত্বেও উপেন্দ্র যে তার স্ত্রী সুরবালাকে কম ভালোবাসে না, সেটাই তাকে যেন অগ্নিকুণ্ডে ফেলে জ্বালাতে থাকে। এই জ্বালার কিছু অংশ গিয়ে পড়ে উপেন্দ্রের ঘাড়ে। কিরণময়ী বলে-

> তোমার নির্ব্বোধটিকে নির্ব্বোধ বলে যদি কিছু কম ভালবাসতে তা হলেও না হয় আর কিছুক্ষণ শোনা যেতে পারত। একটু দয়াও হয়ত পেতে কিন্তু সতীশ ঠাকুরপোর কাছে যে আমি সব শুনেচি। বেশ ত ভাল না হয় তাকে খুবই বাসো কিন্তু তাই বলে কি এমন করে ঢাক পিটে বেড়াতে হয়? একটু বাধবাধও কি করে না।[২৬২]

মানুষ মাত্রই তার ভেতর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, কাম জেগে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক। এবং এক স্থানে বাসনার নিবৃত্তি না ঘটলে অন্যস্থানে গমন করবে। তবে কেউ নিজের ভালোবাসা বা স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের সংসারটাকেই আকড়িয়ে পড়ে থাকে, কেউ সেটা না করে তার কাঙ্ক্ষিত বাসনার জন্য ছুটে চলে অজানার পথে। কিরণময়ী দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যে পড়ে। কেননা, সে প্রথমে স্বামীগৃহে ভালোবাসা পায় নি কিন্তু ভালোবাসা পাবার চেষ্টা করেছে কিনা সে বিষয়টি উল্লেখ করা হয় নি। সুতরাং সে যে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে এমত বোঝা যায় না। কারণ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মধ্যে কারো মধ্যে যদি কোনোটার ঘাটতি বা কমতি থাকে তাহলে উচিত অপর জনকে সেটা জাগিয়ে তোলার বা সংশোধন করবার চেষ্টা করা। কিন্তু কিরণময়ীর ভেতর সে চেষ্টার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি। এক সেবা দেখা যায়, তা অন্তিম মুহূর্তে এবং সেটাও সে প্রভাবিত হয়েছে সুরবালাকে দেখে এবং উপেন্দ্রকে না পেয়ে। অপরদিকে সে স্বামীকে রেখে ছুটে চলেছে ভালোবাসার খোঁজে। প্রথমে অনঙ্গ এবং পড়ে সে উপেন্দ্রের প্রেমে পড়ে। এবং সে নির্দিধায়, নিঃসংকোচে উপেন্দ্রকে তার প্রেম নিবেদন করে।

Dhaka University Institutional Repository

১. ভালবাসার সাধ যে আমার কত বেশী, সে কথা প্রথমে টের পাই তোমাকে দেখে। তাই তুমিই গুরু।[২৬৩]
২. কত ভেবেচি, কিন্তু কোন দিকে কোন কুলকিনারাই চোখে দেখিনি, কিন্তু কি অমৃত হাতে করেই তুমি উদয় হ'লে ঠাকুরপো, কোথায় বা গেল বিষের জ্বালা, আর কোথায় বা রইল বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা। চোখের পলকে এ সব এমনি তুচ্ছ হয়ে গেল যে, অনঙ্গকে বিদায় দিতে আমার একটা মিনিটও লাগল না।[২৬৪]
৩. কিরণময়ী ধীরে ধীরে কহিল, যাক, তোমাকে যে ভালবাসি তা জানিয়ে দিয়ে আমি বাঁচলুম। এখন তোমার যা খুসী ক'রো, আমার কিছুই বলবার নেই, কিন্তু মনে ক'রো না ঠাকুরপো, আমি অন্ধ আশায় ভুলে একথা জানালুম।[২৬৫]

কিরণময়ীর প্রেম মূলত একপক্ষীয়। প্রেমের ধারণার সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি পুরুষ নারীকে তার ভালোলাগা, ভালোবাসার কথা জানিয়ে থাকে। বর্তমানে তার কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে তার ব্যতিক্রমও ঘটতে দেখা যায়, তবে তা খুব সামান্য। কিন্তু শরৎ-যুগে সেটা নিঃসন্দেহে দুর্লভ। কিরণময়ীকে সেই দুর্লভ কাজটিই করতে দেখা যায়। সে উপেন্দ্রকে প্রেম নিবেদন করেছে, তবে সে উপেন্দ্রের কাছ থেকে ইতিবাচক কোনো সাড়া পায় নি। সে জানতো যে উপেন্দ্রর কাছ থেকে সে কী উত্তর পাবে। উপেন্দ্র তার স্ত্রীকে সে অনেক ভালোবাসে এবং তার ব্যক্তিত্ব এমন যে, সেখানে কোনো অনৈতিক চিন্তাচেতনার প্রবেশ ঘটবে না। তারপরও সে বলেছে, তার যুক্তি ছিল এমন-

> কিরণময়ী কহিল, তার দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ না জানালে আমি পাগল হয়ে যেতুম। দ্বিতীয় কারণ, তোমাকে সব কথা না বলে তোমার আশ্রয় নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।[২৬৬]

উপর্যুক্ত কারণ পর্যন্ত কিরণময়ী চরিত্রটি পাঠকদৃষ্টে ইতিবাচক বলার নানা কারণ উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু দিবাকরকে ঘিরে তার যে আচরণ তা তীব্র সমালোচনার যোগ্য। প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যে একটা সীমারেখা থাকা প্রয়োজন। কিরণময়ী শিক্ষিত ও চতুরা। সুতরাং তার পক্ষে নির্দিষ্ট সীমারেখায় সম্পর্ককে আবদ্ধ রাখা উচিত ছিল। কিন্তু সে দিবাকরের সঙ্গে সম্পর্কের সীমা, ঠাট্টার সীমা অতিক্রম করেছে। শিক্ষিত হওয়ায় তার আরো চিন্তাচেতনা ও ভবিষ্যৎ ভাবনার সুযোগ ছিল কিন্তু সে সেটা করে নি।

> হাঁ ঠাকুরপো, আমিই বলিয়া কিরণময়ী বিহ্বল দিবাকরের বুকের উপর অকস্মাৎ উপুর হইয়া পড়িল। কহিল, ঠাকুরপো, আমাকে ছেড়ে নাকি তুমি যাবে? কৈ যাও দেখি![২৬৭]

দিবাকর ছোট ছেলে নয়, আবার সাংসারিক বুদ্ধি সম্পন্ন ধূর্ত ব্যক্তিও সে নয়। সাংসারিক কথোপকথন এবং প্যাঁচ কিংবা দূরদর্শিতা তার ভেতর তেমনভাবে সৃষ্টি বা উন্নয়ন হয় নি। উন্নয়ন ঘটেছে কেবল পুরুষালি বৈশিষ্ট্যের। সুতরাং কিরণময়ীর ঠাট্টা, তার হঠাৎ করে হাত ধরা, তার প্রতি নিক্ষিপ্ত বাঁকা হাসি- তার মন ও শরীরের বিভিন্ন অংশকে জাগ্রত করেছে, কিরণময়ীর নানা আচরণকে সে ভুল ব্যাখ্যা করেছে। কিরণময়ী বুদ্ধিমতী মেয়ে তার এ সব বিষয়গুলো লক্ষ করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু সে এদিকে মনোযোগ দেয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

১. কিরণময়ী খপ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, তাই স্পষ্ট করে বল না ভাই, যে ঠাট্টা চাওনা, সত্যি চাও।[২৬৮]

২. কিন্তু তুমি মুখ-ফুটে না বললে, আমিও বলছিনে, এতে আমারই বুক ফাটুক আর তোমারই বুক ফেটে যাক! বলিয়াই হঠাৎ হেঁট হইয়া দিবাকরের দাড়িটা হাত দিয়া একবার নাড়িয়া দিয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।[২৬৯]

৩. কিরণময়ী মুচকিয়া হাসিল। বলিল, ঐটার ওপর বসলে যদি তোমার ব্যথা লাগে ঠাকুরপো, না হয় তোমার নরম বিছানার ওপরেই উঠে বসব! কেমন? তা'হলে ত আর ক্ষোভ থাকবে না।[২৭০]

কিরণময়ীর ব্যবহার তার শাশুড়ি অঘোরময়ীও ভালো দৃষ্টিতে দেখে নি। কিন্তু প্রতিবাদ করতেও পারে নি। কারণ ছেলের জোরে হয় বৌ, যে ছেলেই নেই; সেই ছেলের বৌ-এর প্রতি তার কতটুকু অধিকার আছে তা বিবেচ্য বিষয়। অধিকার বলতে শুধু এতটুকুই যে, সে তার যতটুকু সেবা করে সেটাই লাভ। তাছাড়া অভিযোগ দেবে কাকে, ছেলেই তো নেই। সুতরাং তার দৃষ্টিতে দিবাকরের সঙ্গে কিরণময়ীর কথাবার্তা এবং আচরণ তার কাছে ঘৃণিত হলেও সে চুপ করে থেকেছে। কিন্তু ছেলেতুল্য উপেন্দ্র, যেহেতু উপেন্দ্র তাকে মায়ের মতো দেখে এবং মাসি বলে ডাকে, উপরন্তু ছেলে তার হাতেই তাদের ভবিষ্যৎ সঁপে দিয়ে গেছে; সেই উপেন্দ্র এলে অঘোরময়ী কিরণময়ী সম্পর্কে তার মনের কথা অকপটে বলে দিয়েছে। তার ভয়ও ছিল, কেননা, উপেন্দ্র যদি তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সে জন্য সে উপেন্দ্র আসা মাত্র তার কাছে দিবাকর ও কিরণময়ীর আচার-আচরণের বিরবণ দিয়েছে এভাবে-

> অঘোরময়ী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, কি ক'রে খবর জানবে উপীন? দুজনের কি যে রাতদিন ফষ্টি-নষ্টি হাসি-তামাসা ফুসফুস গল্প গুজব হয় তা ওরা জানে। আমি বার বার বললাম বৌমা, ও পরের ছেলে, লেখা-পড়া করতে এসেছে, ওর সঙ্গে অষ্টপ্রহর অত কেন? হলোই বা দেওর, - বৌমানুষের সোমত্ত ছেলের কাছে একটু সরম-ভরম থাকবে না?[২৭১]

কিরণময়ীকে উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং চোখের দৃষ্টি এমন যেন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। সেটা ছিল উপেন্দ্র ও সতীশের আগমন এবং তাদের বাড়ি তাদের নামে লিখে দেবার জন্য। তেমনি আরেকবার তাকে এরূপ অবস্থায় দেখা যায়, যখন উপেন্দ্র কিরণময়ীর কথা অগ্রাহ্য করে দিবাকরকে নিয়ে যেতে চায়। এতে কিরণময়ী লজ্জাবোধ করে এবং প্রতিবাদী হয়ে উঠে। মূলত সে নিজেও বুঝতে পারে নি, যে কোন রাস্তায় হাঁটছিল। তার মনে হয়েছিল, দিবাকর তার ঠাট্টা সম্পর্কের আত্মীয়, তার সঙ্গে উপর্যুক্ত তামাশা করা চলে কিন্তু তার ফলাফল কি হতে পারে সেটা সে ভেবে দেখে নি। সে নিজেকে জানে কিন্তু দিবাকরের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কিনা সেটা সে ভাবে নি। এটা তার দূরদর্শিতার অভাব। কিন্তু উপেন্দ্র অবিশ্বাস তাকে বেশ নাড়া দেয় এবং সে ক্ষিপ্ত বিষধর সাঁপের ন্যায় ফুঁসতে থাকে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়-

Dhaka University Institutional Repository

> অনেক দিন পূর্ব্বে ঠিক এইখানে দাঁড়াইয়া তাহার দুই চোখে এমনি উন্মত্ত চাহনি, এমনি প্রজ্জলিত বহ্নিশিখা দেখা দিয়াছিল, সেদিন সতীশকে সঙ্গে করিয়া উপেন্দ্র প্রথম দেখা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। আবার আজ শেষ বিদায়ের দিনেও তাহার বিরুদ্ধে সেই দুইটি চোখের মধ্যে তেমনি করিয়াই আগুন জ্বলিতে লাগিল।[২৭২]

প্রতিহিংসা মানুষকে পশুতে পরিণত করে। তখন তার স্বাভাবিক বুদ্ধি বিবেচনা লুপ্ত হয় এবং এমন সব সিদ্ধান্ত নেয় যা পরবর্তী সময়ে আত্মঘাতী করে তোলে। কিরণময়ীর অবস্থা সেরকম হয়, যখন উপেন্দ্র দিবাকরকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়। মূলত তার রাগ উপেন্দ্রর ওপর কিন্তু উপেন্দ্রকে হাতের নাগালে না পেয়ে তার প্রিয় ছোট ভাই দিবাকরের ওপর সে তার খড়্গ প্রয়োগ করে। তার ধারণা ছিল, দিবাকরের কষ্ট মানে তার কষ্ট। দিবাকরের ওপর শোধ নেওয়ার মানে উপেন্দ্রের ওপর নেওয়া। তাই সে ছলে বলে কৌশলে চড়াও হয় দিবাকরের ওপর। প্রতঙ্গকে প্রলুব্ধ করার জন্য জমিতে বৈদ্যুতিক বাল্ব ঝুলিয়ে দেওয়া হয় আর প্রতিটি বাল্বের নিচে কেরোসিনের একটি করে পাত্র রাখা হয়। ফলে, পোকা আলোতে প্রলুব্ধ হয়ে কাছে আসে এবং শক্তি হারিয়ে পড়ে গিয়ে কেরোসিনের পাত্রের ভেতর। তাদের জীবনলীলা সেখানেই সমাপ্ত হয়। দিবাকরের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

> কাঁচপোকা যেমন করিয়া পতঙ্গকে টানিয়া আনে, তেমন করিয়া দুনিয়ার যাদু-মন্ত্রে কিরণময়ীর অর্ধ-সচেতন, বিমূঢ় চিত্ত হতভাগ্য দিবাকরকে জাহাজ-ঘাটে টানিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল এবং টিকিট কিনিয়া আরাকান যাত্রী-জাহাজে চড়িয়া বসিল।[২৭৩]

কিরণময়ীর কাছে যেটা ছিল প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ প্রবণতা, দিবাকরের কাছে সেটাই ছিল প্রেম। গভীর প্রেমের ছলনায় অপরিণামদর্শী বালক দিবাকর আলোর মোহে পড়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কিরণময়ীর সঙ্গে কালাপানি পাড়ি দিয়ে হাজির হয় আরাকানে। সেখানে সে আরো বেশি প্রতারিত হয় কিরণময়ীর ঘনিষ্ট কথাবার্তা ও আচরণে। সে ভুলেও বুঝতে পারে নি সে কী করতে যাচ্ছে। কারণ সে তখন রঙিন নেশায় বিভোর। কিরণময়ীর ধারণা তার অপরূপ রূপই দিবাকরের মন ভোলাতে সাহায্য করেছে। কিন্তু ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যায়, তার আচার-আচরণ শুধু দিবাকরকে কেন যেকোনো পূর্ণবয়স্ক পুরুষকেও হার মানাতে পারে, মন ভোলাতে পারে, প্রতারিত করতে পারে।

১. কিরণময়ী তাহার অশ্রুসিক্ত মুখ নিজের বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিল এবং ধীরে ধীরে তাহার মাথার মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিয়া নিঃশব্দে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।[২৭৪]
২. তুমি না খেলে আমারও খাওয়া হবে না। তুমিই এখন আমার সর্ব্বস্ব-তোমাকে না খাইয়ে আমি কিছুতেই খেতে পারব না। কথা শুনিয়া দিবাকর লজ্জায় মরিয়া গেল এবং কোনো কথা না বলিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই কিরণময়ী ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, এ যে সপ্তরথীর ব্যূহ ঠাকুরপো, পালাচ্চ কোথায়?[২৭৫]

Dhaka University Institutional Repository

কিরণময়ী শুধু তার কথা দিয়ে দিবাকরকে ভুলিয়েছে, তা নয়। তার ব্যবহার বিশেষ করে তার ঘনিষ্ট সংসর্গ দিবাকরকে বেশি বিচলিত ও প্রভাবিত করেছে। দেবরের সঙ্গে ব্যবহারের মাত্রা অতিক্রম করে বহু বাঙালি পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে, অনেক পরিবারে অশান্তির বিষ বুনেছে , পরবর্তী সময়ে সেগুলো ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে সংসার অঙ্গারে পরিণত হয়েছে। এজন্য প্রয়োজন প্রতিটি সম্পর্কের একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা। কিরণময়ী সে সীমা চূড়ান্তভাবে অতিক্রম করে দিবাকরকে অথৈ সাগরে ভাসিয়েছে। বিশেষ করে দিবাকরকে কিরণময়ীর 'চুম্বন' সকল সীমাকে অতিক্রম করেছে। দেবর-ভাবীর স্বাভাবিক সম্পর্ককে পুরোপুরি ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এছাড়াও তার সঙ্গে শয়ন করা, তাকে বারবার বুকে টেনে নেওয়া ঘোরতর অপরাধের শামিল। যেটা কোনোভাবেই মেনে নেবার মতো নয়।

১. ক্ষণতরেই কিরণময়ী উঠিয়া গেল এবং একটা হাঁড়ির ভিতর হইতে কিছু মিষ্টি একখানি ছোট রেকাবীতে করিয়া আনিয়া দিবাকরের সম্মুখে আসিয়া জানু পাতিয়া উঁচু হইয়া বসিল এবং জোর করিয়া একহাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া একটির পর একটি করিয়া তাহার মুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। এমনি করিয়া সবগুলি নিঃশেষ করিয়া কিরণময়ী মুহূর্তকাল কি ভাবিয়া লইল, পরক্ষণেই নত হইয়া দিবাকরের আর্দ্র ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া খিল্‌খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।[২৭৬]
২. রাত্রে উভয়ে পাশাপাশি শয়ন করিল। অদৃষ্টের ফেরে সর্ব্বস্ব দান করিয়া হরিশ্চন্দ্র যেমন করিয়া চণ্ডালের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি ঘৃণায় দিবাকর কিরণময়ীর শয্যাপ্রান্তে আত্ম-সমর্পণ করিল, কিন্তু এ বিতৃষ্ণা কিরণময়ীর অগোচর রহিল না।[২৭৭]
৩. ছোট একটুখানি 'না' তুমি মানুষ, না পাথরের, ঠাকুরপো? বলিয়াই সে সুদৃঢ় বলের সহিত দিবাকরকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, জাহাজ যদি ডোবে, আমরা যেন এমনি করেই মরি। তীরে ভেসে যাব, লোকে দেখবে, ছাপার কাগজে উঠবে, তোমার উপীনদাদা পড়বে-সে কেমন হবে ঠাকুরপো।[২৭৮]

দিবাকর প্রথমে না বুঝলেও পরে সে জাহাজে থাকাকালীন ভালোভাবে বুঝতে পারে কিরণময়ী আর যাই হোক তাকে কোনোক্রমেই ভালোবাসে না। এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলেও তার মনে হয়। কিন্তু কী সেই উদ্দেশ্য অনেক ভেবেও সে কোনো কূলকিনারা করতে পারে না। নিজের অজ্ঞানতায় সে মুষড়ে পড়ে। কি করবে ভেবে পায় না। তার পরেও সে অজানা আশঙ্কাকে সঙ্গী করেই আরাকানে পা রাখে। সে ভেবেছিল সেখানে গিয়ে হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। সব কিছুকে ছাড়িয়ে সে কিরণময়ীর ভালোবাসা পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে পড়ে লাগে। যে ছেলে কখনো পরিশ্রম কি জানতো না, সে হাড়ভাঙা খাটুনী খাটে কিরণময়ীকে খুশি করার জন্য, তাকে পাবার জন্য। পুরুষের স্বাভাবিক চাওয়াকে অতিক্রম করে সে কিরণময়ীকে ভালোবাসে এবং ভালোবাসা পেতে চায়। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়। পরবর্তী সময়ে কিরণময়ীর কথা থেকে এটা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, দাদা উপেন্দ্রর সঙ্গে তার কিছু একটা নিয়ে বিবাদ আছে। কিন্তু কি নিয়ে সেটা তার বোধগম্য হয় না। কারণ সে তার দাদাকে ভালোভাবে জানে ও বোঝে। তার দাদা যে কোনো অপরাধ কিরণময়ীর সঙ্গে করতে পারে না, সেটাও সে জানে।

Dhaka University Institutional Repository

তারপরও কিরণময়ী তার দাদার উপর কেন এত রাগন্বিত সেটা তার সরল বুদ্ধিতে কিছুতেই আসে না। কিন্তু কিরণময়ীর কথা থেকে বোঝে কোনো একটি বিষয় নিয়ে তার দাদার সঙ্গে কোনো গোল নিশ্চয় রয়েছে।

> দুই চক্ষু তাহার বাণবিদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত জ্বলিয়া উঠিল। সে দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া আস্তে আস্তে বলিল; তুমি কি মনে কর মস্ত অপরাধ আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে, দিব্যি ভাল মানুষটির মত দেশে ফিরে গিয়ে, তোমার উপীনদাদার পা ছুঁয়ে শপথ করে বলবে, তুমি সাধু! তোমার উপীনদাদা মাথা উঁচু করে চলবে? সে হবে না ঠাকুরপো।[২৭৯]

কিরণময়ীর একটি বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে। সেটা হলো কেউ তাকে বিন্দুমাত্র অবহেলা করলে সে সহ্য করতে পারে না। উপেন্দ্র ও সতীশের প্রথম সাক্ষাত্যের অবহেলায় সে ঝলসে উঠেছিল। দ্বিতীয় বার উপেন্দ্র তাকে অবিশ্বাস করে দিবাকরকে ফেরত নিয়ে যেতে চাইলেও সে সেটা মেনে নিতে পারে নি। এমনকি যে দিবাকরকে সে হাতের পুতুলের মতো নাচিয়েছে, সেই দিবাকর জাহাজে তাকে সামান্য অবহেলা করলে তার সেই ঔদাসীন্যকেও সে সহ্য করতে পারে নি। জাহাজে তার সঙ্গে তার বিছানায় শয়নে বাধ্য করেছে। দিবাকরকে সে যে ভালোবাসে না, তা সে জেনেও কিরণময়ী তার সামান্য অবহেলায় কষ্ট পাচ্ছিল তা তার কথা থেকেই বোঝা যায়। সে মনে মনে ভাবে-

> দিবাকরকে সে ভালও বাসে নাই-বাসাও অসম্ভব। তথাপি, আশ্চর্য এই যে ইহারই পরিপূর্ণ ঔদাসীতে কিরণময়ী মনে মনে এতক্ষণ ব্যাথাই পাইতেছিল।[২৮০]

দিবাকরকে সে অতি তুচ্ছ ও নগন্য মনে করে। তারপরও তার উপর ভর করেই সে আরাকানের পথে পাড়ি জমায়। যাকে সে ভাতৃতুল্য বলে প্রকাশ করেছে, অথচ তার সঙ্গে এমন আচরণ সে করেছে যা মোটেও ভাতৃসুলভ নয়। মানুষ আপন ভাইয়ের সঙ্গেও এরূপ ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণ করতে পারে না। তার আচরণ দিবাকরের প্রতি গভীর প্রেমের দিককেই নির্দেশ করে। অন্য কোনো দিক চিন্তা-ভাবনার কোনো অবকাশ তার আচরণে কোনোভাবেই প্রকাশ পায় না। জাহাজে সে যে চিন্তা করে ব্যাকুল হয়েছে সেটাও ভাতৃসুলভ নয়। যাকে সে ভালোবাসে না, যে তার তুলনায় অতি নগন্য তার সঙ্গে ঘর করার চিন্তাও তার মাথায় এসেছে। এবং যতদিন পর্যন্ত সতীশ তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে না এসেছে ততদিন তাদের একই ঘরে এক বিছানায় রাত কাটানোর কথা ভাবতেও অনেকের গা শিউরে উঠে। তারপরও সে নিজেকে সতী দাবি করেছে। সতীত্ব যদি কেবল অন্তরঙ্গ মিলনকে বোঝায় তো ভিন্ন কথা কিন্তু কারো সঙ্গে সংসার করা বা তার অভিনয় করা কতটা সতীত্বের দাবিদার তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

> সেই অতি তুচ্ছ দিবাকর, যাহাকে সে কোন দিন ভালবাসে নাই, কোনদিন ভালবাসিতে পারে না, বুদ্ধির বিপাকে তাহারই ঘর করিতে হইবে, ভালবাসার অভিনয় করিতে হইবে, জাহাজে উঠিয়া পর্য্যন্ত এ ধিক্কার ভিতরে ভিতরে তাহাকে যেন পাগল করিয়া আনিতেছিল।[২৮১]

Dhaka University Institutional Repository

কিরণময়ী প্রয়োজনের তাগিদে অনেক মিথ্যা কথা বলেছে। কিন্তু তার মিথ্যা কথা বলাতে কোনো জড়তা ছিল না। অবলীলাক্রমে সে জাহাজে একের পর এক মিথ্যা কথা বলেছে। এ থেকে বোঝা যায় এখানেই তার মিথ্যা বলার চর্চা কিংবা অভ্যাস হয় নি। পূর্ব থেকেই তার অভ্যাস ছিল। তা না হলে, এত মিথ্যা কথা সত্যের মতো গড়গড় করে বলা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার মিথ্যে কথায় দিবাকর পর্যন্ত চমকে উঠেছে। তার ধারণাও ছিল না কিরণময়ী এত মিথ্যা কথা এমন অবলীলায় বলতে পারে। মিথ্যা কথায় দিবাকরের যে অবস্থা হয়েছিল তা হলো-

১. কিরণময়ী কত মিথ্যা সে কিরূপ অসঙ্কোচে ও অবলীলাক্রমে বলিয়া যাইতে পারে, শুনিতে শুনিতে সে যেন এক প্রকার হতচেতনের মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল।[২৮২]
২. কিরণময়ী তৎক্ষণাত ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া কহিল, কুলীনের ঘর বাছা; আমিই যে বড় হয়ে যাইনে, এই আমার ভাগ্যি। তা প্রায় সমবয়সী বৈকি। ওর জন্ম বোশেখ মাসে, আমার জন্ম আষাঢ়ে-এই মোটে দুটি মাসের বড় বই ত নয়। অনেকে যে আমাকেই বয়সে বড় বলে ঠাওরায়। মা গো! কি লজ্জা! বলিয়া কিরণময়ী টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।[২৮৩]

স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে আরাকানে তারা একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। সেখানে সে দিবাকরের ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে। তার সঙ্গে প্রায়ই বিভিন্ন কারণে তর্কবিতর্ক লেগে থেকেছে। এক পর্যায়ে বাড়িয়ালী জানতে পারে তারা স্বামী-স্ত্রী নয়। তখন থেকে বাড়িয়ালীর কাছে কুলীনের যে সম্মান তারা এত দিন আঁকড়ে ছিল সেটাও তারা হারায়। বাড়িয়ালী ছিল মূলত পতিতা-সর্দারনী। তার বাড়িও সেই টাকায় তোলা। বয়স হয়ে যাওয়ায় সে হয়তো নিজে কাজে যায় না, কিন্তু খদ্দের যোগাড় দেওয়াই তার মূল পেশা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। কিরণময়ীকেও সে ধরনের মেয়ে মনে করে। এবং তার জন্য খদ্দের যোগাড় করে। বাড়িয়ালী তাকে 'বেবুশ্যে' বলে আখ্যায়িত করে। এখানে কিরণময়ী তার যথাযথ আচরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। দিবাকর হয়তো কিছুটা দায়ী কিন্তু কিরণময়ী তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। ফলশ্রুতিতে যা দাঁড়ায় তা হলো-

> বাড়ীয়ালী অবাক হইয়া কহিল, তুই ত আর কারো কুলের বৌ ন'স! মানুষ-জন তোর ঘরে আসবে, বসবে, তাতে ভয়টা কাকে শুনি। তুই হলি বেবুশ্যে।[২৮৪]

বাংলা প্রচলিত প্রবাদ আছে- পাপ বাপকেও ছাড়ে না। কিরণময়ীর ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটতে দেখা যায়। কিরণময়ী উপেন্দ্রকে শাস্তি দেবার জন্য ঘর ছাড়া হয়, উপেন্দ্রকে পাবার জন্য যে গোপন বাসনা তার মনে জেগেছিল এবং যার কাছে সে ভালোবাসার অমূল্য ধনের খোঁজ পেয়েছিল, সেটাও সে হারিয়ে ফেলে। প্রতিশোধের খড়গ উপেন্দ্রকে না কেটে তার পিঠেই সমূলে বিদ্ধ হয়েছে। যা থেকে সে জীবিতও

Dhaka University Institutional Repository

থাকতে পারে না, মরতেও তার বাধা। সুতরাং তার ভুলের মাশুল তাকে প্রতিনিয়ত কুড়ে কুড়ে খেয়েছে। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অন্তর্জামির কোপে সে কখন পতিত হয়েছে তা বুঝতে পারে নি।

> ছয় মাস পূর্ব্বে সেই যে একদিন সে সমাজকে ধর্ম্মকে ব্যঙ্গ করিয়া মনুষ্যত্বকে পদদলিত করিয়া এক অবোধ অপরিণামদর্শী যুবককে রূপ ও ভালবাসার মোহে প্রতারিত করিয়া তাহার সর্ব্বপ্রকার স্বার্থকতা হইতে বিচ্যুত করিয়া আনিয়াছিল, আজ সেই প্রতারণার ফাঁসিই কিরণময়ীর নিজের গলায় আঁটিয়া বসিয়াছে। [২৮৫]

প্রকৃতির প্রতিশোধ বলে একটা বিশ্বাস সবার মধ্যে প্রবলভাবে প্রচলিত রয়েছে। সেটা থেকে কিরণময়ী বাঁচতে পারে না। সতীশ, দিবাকর, অনঙ্গ, উপেন্দ্র কেউ তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায় নি। বরং সবাই তাকে শেষপর্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। বিশেষ করে যখন প্রকাশিত হয়েছে যে, কিরণময়ী উপেন্দ্রকে ভালোবাসে, তখন থেকে তাকে যথোপযুক্ত সম্মান দিয়েছে সবাই। কিন্তু তারপর সে কি রক্ষা পেয়ে নিয়তির অমোঘ নিয়ম বা শাস্তি থেকে? সবাই একবাক্যে হয়তো স্বীকার করবে, না। পরিণামে সে নাস্তিক থেকে আস্তিকে পরিণত হয়েছে, ভগবানের দুয়ারে মাথা কুটে মরেছে, প্রায় উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে। এবং সে উপেন্দ্রকে পাবার জন্য সে এত ঘটনার জন্ম দিয়েছে, তাকে সে শেষ বারের মতো দেখতে পেলেও তাকে নিয়ে স্বপ্নের ভালোবাসা অধরাই রয়ে গেছে। এমনকি মৃত্যুর সময় সে কাছে পর্যন্ত থাকতে পারে নি। যখন উপেন্দ্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, তখন সে গভীর ঘুরে আচ্ছন্ন। শুধু তাই নয়, যে রূপের ও জ্ঞানের বড়াই সে করেছে সেটা প্রকৃতি তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।

১. দুই একটা কথা কহিয়াই সাবিত্রী বুঝিল, স্ত্রীলোকটি উন্মাদ নয়, কিন্তু কোন দিকে মন দেবার মতও তাহার মনের অবস্থা নয়, কথার মাঝখানেই সে বলিয়া উঠিল, আমি ভগবানকে দিনরাত জানাচ্চি তাঁর পায়ে ত আমি অনেক অপরাধ করেচি, তাই তাঁর ব্যামো আমাকে দিয়ে তাঁকে ভাল করে দাও। আচ্ছা ভাই, একি হ'তে পারে? উপোস করে দিনরাত ডাকলে কি সত্যিই তাঁর দয়া হয়? তুমি জান?[২৮৬]

২. একদিন যে রমণীর রূপের সীমা ছিল না, বিদ্যা-বুদ্ধিরও অবধি ছিল না, এ সেই কিরণময়ী, আজ সে কি বলিতেছে, সে নিজেই জানে না। সতীশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া 'উঃ' করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল এবং এতদিনের পর উপেন্দ্রর চোখ দিয়া কিরণময়ীর জন্য জল গড়াইয়া পড়িল।[২৮৭]

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথঃ *যোগাযোগঃ* শ্যামাসুন্দরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব বেশি উপন্যাস রচনা করেন নি। বিশিষ্ট লেখক আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর 'অবসর প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত *রবীন্দ্রনাথ* নামক গ্রন্থানুসারে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সংখ্যা-মোট ১৪টি। সৈয়দ আকরম হোসেন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসসমূহঃ বউ ঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি।
দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসসমূহঃ চোখের বালি, নৌকাডুবি।
তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাসসমূহঃ গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ।
চতুর্থ পর্যায়ের উপন্যাসসমূহঃ শেষের কবিতা, দুইবোন, মালঞ্চ, চার অধ্যায়।

যোগাযোগ (১৯২৯) রবীন্দ্র-উপন্যাসের তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাস। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণির দোদুল্যমানতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্ত্যদর্শন, পারিপার্শ্বিক মূল্যবোধ, দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-হাসি-কান্না এসব বিষয় রবীন্দ্র-উপন্যাসের তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সময়ে গোটা সমাজব্যবস্থায় চলছিল ভাঙা-গড়া। ভাঙা-গড়া সমাজের প্রয়োজনেই সংঘটিত হয়। সেই ভঙ্গস্তূপ থেকেই সৃষ্টি হয় আবার নতুন কিছুর। রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাসসমূহ ছিল সেই সময়ের প্রতিবিম্ব। যখন গ্রামীণসমাজ ভাঙছে, নাগরিকসমাজ প্রতিনিয়ত হচ্ছে মেরুকরণ। 'উনিশ শতকের চিন্তাভাবনার রাজ্যেই এই নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বাসা বাঁধতে শুরু করেছিল। সাহিত্যচর্যাও এর ব্যতিক্রম নয়, হতে পারে না। সে ক্ষেত্রেও দেখি দ্বিধা দ্বন্দ্ব, এক অস্থির দোলাচলতা।'[২৮৮]

যোগাযোগ(১৯২৯) প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় বঙ্গাব্দের ১৩৩৬-এর আষাঢ় মাসে। *বিচিত্রা*'য় ধারাবাহিকভাবে আশ্বিন ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ থেকে চৈত্র ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমে নাম ছিল *'তিনপুরুষ'* । তৃতীয় সংখ্যায় নামকরণ হয় *যোগাযোগ* এ বিষয়ে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা *বিচিত্রা*'য় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *নামান্তর* নামে কৈফিয়ত প্রকাশ করেন। কিন্তু উপন্যাস নামটি পরে কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে নি। তাই নাম পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা অনুযায়ী *যোগাযোগ*(১৯২৯) নামের মধ্যে উপন্যাসের ব্যাখ্যা নেই। কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতি রয়েছে।

যোগাযোগ উপন্যাসের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি, ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজ ও বিকাশমান পুঁজিবাদী সমাজের প্রাথমিক স্তর বণিক শ্রেণির সঙ্গে সংঘাত। ইংল্যান্ডে সংঘটিত শিল্পবিপ্লব রাতারাতি আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তনের বাতাস এসে লাগে ভারতবর্ষেও। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ ব্যবসায়িক শ্রেণির অবাধ অধিকার অর্জিত হয় ভারতবর্ষে। এখানকার গ্রামীণ সমাজকাঠামো ভাঙনের মুখে পড়ে। কলকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন নগরীতে বিস্তৃত হয় যন্ত্রশিল্প। উনিশ শতকের শুরু থেকেই বাঙালি ধনবাদী সমাজ বিকাশ লাভ করে। অর্থে বিত্তে স্ফিত হতে থাকে তারা। সমাজের সর্বত্র প্রতিষ্ঠত হয়ে ওঠে তাদের প্রবল প্রভাব। অপরদিকে, সামন্তসমাজের ভেতরে বাস বাঁধে বিলাসের অপ্রতিরোধ্য কীট। প্রভুদের বেপরোয়া চালচলন, অপচয় ও পরিকল্পনাহীনতা এ সমাজে নামায় ধ্বংস। এ সমাজ এক সময় প্রায় তলানীতে এস দাঁড়ায়। তৈরি হয় উভয় সমাজের মধ্যে টানাপোড়েন। পারস্পরিক ঈর্ষা, প্রতিযোগিতা ও সংঘাত প্রতিদিনের অনিবার্য ঘটনায় রূপ লাভ করে। বিশ্বজগতের এই সত্য যুগসন্ধিই *যোগাযোগ* উপন্যাসের প্রধান বিষয়। বণিক শ্রেণির দ্রুত বিকাশ ও সামন্ত সমাজের ধ্বংসই উপন্যাসের মূলকথা।

যোগাযোগ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র 'মধুসূদন' ও 'কুমুদিনী'। তবে উপন্যাসের স্বাভাবিক চলমানতাকে গতি দান করেছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র 'শ্যামাসুন্দরী'। অপ্রধান এবং নেতিবাচক চরিত্র হলেও তাকে ছাড়া *যোগাযোগ* উপন্যাসটি উপন্যাস হয়ে উঠতো কি না তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থেকে যাবে।

শ্যামাসুন্দরীর আবির্ভাবই নেতিবাচকতাকে হাতে করে। অর্থাৎ ধরেই নেওয়া যায় ঔপন্যাসিকের সজাগ দৃষ্টি বা উদ্দেশ্য শুরু থেকেই সঙ্গে ছিল। তা না হলে সৌজন্যের মধ্য দিয়ে তার আগমন ঘটতে পারতো, কিন্তু তা হয় নি। উদ্দেশ্য থেকেই ঔপন্যাসিক শ্যামাসুন্দরীর আগমন ঘটিয়েছেন এভাবে-

> পরিণত বয়সী আঁটসাঁট গড়নের শ্যামবর্ণ একটি সুন্দরী বিধবা ঘরে ঢুকেই বললে, মোতির মা তোমাকে একটু ছুটি দিয়েছে সেই ফাঁকে এসেছি; কাউকে তো কাছে ঘেঁষতে দেবে না, বেড়ে রাখবে তোমাকে- যেন সিঁধকাটি নিয়ে বেড়াচ্ছি, ওর বেড়া কেটে তোমাকে চুরি করে নিয়ে যাব। আমি তোমার জা, শ্যামাসুন্দরী; তোমার স্বামী আমার দেওর। আমরা তো ভেবেছিলুম শেষ পর্যন্ড় জমাখরচের খাতাই হবে ওর বউ। তা ঐ খাতার মধ্যে জাদু আছে ভাই, এত বয়সে এমন সুন্দরী ঐ খাতার জোরেই জুটল। এখন হজম করতে পারলে হয়। ঐখানে খাতার মন্তর খাটে না। সত্যি করে বলো ভাই, আমাদের বুড়ো দেওরটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?[২৮৯]

কুমুদিনীর সঙ্গে প্রথম দেখাতে শ্যামাসুন্দরী নেতিবাচক ছিল তা আমরা উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে বুঝতে পারি। তারপরও যদি নির্দিষ্ট করে বলতে চাই তাহলে উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে চারটি বিষয় প্রতিফলিত হয়–

১। মোতির মা সম্পর্কে শ্যামাসুন্দরীর নেতিবাচকতা। কারণ প্রথমেই সে এসেই জানিয়েছে, মোতির মা তাকে কুমুদিনীর কাছে ঘেঁষতে দেবে না।

Dhaka University Institutional Repository

২। চুরির বিষয়টি তার মাথায় ছিল। বস্তুগত চুরির কোনো বিষয় না থাকলেও পরবর্তী সময়ে আমরা দেখতে পাই মধুসূদনকে চুরির চেষ্টা তার যথেষ্ট ছিল।

৩। কুমুদিনীর সামনে প্রথম পরিচয়ে স্বামী মধুসূদন সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য।

৪। কুমুদিনী সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ। মধুসূনকে তার পছন্দ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ।

শ্যামাসুন্দরীর নেতিবাচক মন্তব্য ও কথোপকথন কুমুদিনীর মনে সাইক্লোনের আকস্মিক আঘাত হানে। কুমুদিনীর স্বপ্নকে যখন বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখছিল তখনই সেটার মূলে ঘুনের সংক্রমণ ঘটে। আহত হয়, মুষড়ে পড়ে তার আজন্মলালিত সাংসারিক স্বপ্ন। যে কলি ফুটতে গিয়ে আহত হয়ে থমকে দাঁড়াল, যে অঙ্কুর মাথা তুলে স্বগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছিল তা হঠাৎ করে কার যেন পদভারে দলিত হল- সে আর কেউ নয়, তারই মতো এক জন নারী, তার জা বাড়ির বিধবা কিন্তু সুন্দরী বড় বউ শ্যামাসুন্দরী। শ্যামাসুন্দরী বক্তব্য কীভাবে কুমুর উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল তা বোঝা যায় কুমুর মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে-

> শ্যামাসুন্দরী কুমুর মনের মধ্যে ভারি একটা বিস্বাদ জাগিয়ে দিলে। আজকে কুমুর সব চেয়ে দরকার ছিল মায়ার আবরণ, সেইটেই সে আপন মনে গড়তে বসেছিল আর যে- সৃষ্টিকর্তা দ্যুলোকে ভূলোকে নানা রঙ রূপের লীলা করেন, তাঁকেও সহায় করবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় শ্যামা এসে ওর স্বপ্ন-বোনা জালে ঘা মারলে।[২৯০]

আশাহত হওয়ার বেদনা অনেক। সেই বেদনা কম বেশি সবারই মাঝে দেখা যায়। সবাই চায় সেই ভগ্ন আশাকে সংস্কার করে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে। কেউ আবার চায় সেই ভগ্ন আশার ভেতরই পুনরায় আশার সঞ্চার করতে। অর্থাৎ আশাভগ্নতাকে সবাই স্বাভাবিক ভেবে মেনে নিতে চায় না, চায় না বলেই লড়াই করতে চায়। প্রাণপণ চেষ্টা করে ভগ্ন আশাকে শেষরক্ষা করতে। শ্যামাসুন্দরী সেই কাজটিই করেছে। বিধবা শ্যামাসুন্দরী স্বপ্ন ছিল মধুসূদনের মন জয় করে পবিবারে স্থায়ী আসন গাঁড়া। কিন্তু তার সেই স্বপ্নকে ভেঙে দিতে যখন মধুসূদন কুন্দনন্দিনীকে বিয়ে করে ঘরে আনলো, তখন শ্যামাসুন্দরী তা মেনে নিতে পারে নি। পারে নি কুন্দনন্দিনীকে মেনে নিতে। স্বামীকে হারিয়ে যে মধুসূদন ছিল তার পরিবারে স্বসম্মানে স্থায়ী আসন প্রতিস্থাপন করা, সেই আশায় সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল, এমন সময় মধুসূদনের হঠাৎ বিয়ে করায় তার 'বাড়া ভাতে ছাই' দেবার মতো ঘটনা ঘটে যাওয়ায়, সে দিগ্বিবিদিক শূন্য হয়ে পড়ে। তার অন্তরে লালিত স্বপ্ন হঠাৎ করে অশনিসঙ্কেতের দাবানলে পুড়তে থাকে। কিন্তু সে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বলে সেটা মানতে পারে না। তাই সে লড়াইয়ে নামে। এ লড়াই তার বেঁচে থাকার লড়াই, স্থায়ীভাবে স্বীয় অধিকার স্থাপনের লড়াই, দুবেলা দুমুঠো খেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ভালোভাবে টিকে থাকবার লড়াই। এ লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে সে বেছে নেয় কুন্দনন্দিনীকে। কেননা কুন্দনন্দিনীকে সরিয়ে দিতে পারলেই হয়তো তার লড়াই সফল হতে পারে ভেবেই সে ধীরে, অতি ধীরে, সন্তর্পণে বিভিন্নভাবে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় মধুসূদন ও কুন্দনন্দিনীর সম্পর্কের ভেতর। সেই আক্রমণের প্রথম ধাপে অবতীর্ণ হয় যখন কুন্দনন্দিনী মূর্ছা যায়।

> ইতিমধ্যে শ্যামাসুন্দরী হাঁপাতে হাঁপাতে মধুকে এসে জানালে, "বউ মূর্ছো গেছে।" মধুসূদনের মনটা দপ্ করে জ্বলে উঠল; বললে, "কেন তাঁর হয়েছে কী?"
> "তা তো বলতে পারি নে, দাদা দাদা করেই বউ হেদিয়ে গেল। তা একবার কি দেখতে যাবে?"[২৯১]

শ্যামা বাড়ির কোথায় কি ঘটছে তার সকল খবর রাখে। এটাকেই সে প্রাথমিক যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে বেছে নেয়। সে চিন্তা করে যেকোনো খবর মধুসূদন ও কুন্দনন্দিনীর পূর্বে জানতে এবং সেটা মধুসূদন ও কুন্দনন্দিনীকে একটু বিকৃতভাবে উপস্থাপন করতে। এতে যেটা হবে সেটা হলো সে তাদেরকে যেকোনো খবর দিতে পারবে, সেইসঙ্গে তার সঙ্গে ঝাল-টক মিশ্রিত করে উপস্থাপন করতে পারবে। তার লাভ যেটা হবে খবরের সত্যতা থাকবে, তার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার কখনো ভাটা পড়বে না, মধুসূদন ও কুন্দনন্দিনীর কাছাকাছি থাকতে পারবে, খবর দেওয়া দূত হিসেবে এবং তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে, উপরন্তু কোনো সন্দেহের তালিকা এড়িয়ে চলতে পারবে এবং প্রয়োজনীয় বিষ প্রয়োগ করতে পারবে। তার চিন্তাচেতনার প্রথম প্রকাশ পায় কুন্দনন্দিনীর মূর্ছা যাবার সংবাদ প্রেরণের মাধ্যমে। দ্বিতীয় চিন্তার প্রতিফলন পাওয়া যায়, মধুসূদনকে সান্ত্বনা দেবার মাঝে।

> মিছে রাগ করছ ঠাকুরপো, ওরা বড়ো ঘরের মেয়ে, পোষ মানতে সময় লাগবে।[২৯২]

সমস্যা কখনো কখনো অনেক দূরের মানুষকে কাছে টেনে আনে, কাছের মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়। শ্যামা প্রথম পর্যায়ের এক জন হবার চেষ্টা করেছে। সমস্যাসঙ্কুল পথ চলতে প্রয়োজন এক জন নির্ভরতার। সমস্যাসঙ্কুল মানুষটির দুচোখ খুঁজে বেড়ায় সামান্য সাহায্যের আশায়। কেউ প্রকাশ্যে সেটা চেয়ে বসে, কারো চোখ হয়তো সে সাহায্য খুঁজে বেড়ায়। মধুসূদন দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ। প্রকাশ্যে সাহায্য চাওয়ার মতো বৈশিষ্ট্যের মানুষ নয়। উপরন্তু একান্ত দাম্পত্য সমস্যা হওয়ায় মধুসূদন জীবনের সমস্যাসঙ্কুল নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছিল। সেখান থেকে উঠবার পথ তার জানা নেই, কিন্তু মুখ ফুটে কোনো সাহায্য চাওয়াও স্বভাবসিদ্ধ নয়। কিন্তু বুদ্ধিমতি শ্যামা সেটা বুঝতে পেরেছে। কারণ প্রথমত সে অনেক দিন ধরে মধুসূদনকে চেনে-জানে এবং মূলকারণ এই সমস্যা তো তারই কৃত্রিম সৃষ্টি। তাই কিছুটা

উপযাচক হয়েই সে উপদেশ দানে এগিয়ে আসে যার মাধ্যম সান্ত্বনা। যার মাধ্যমে সে মধুসূদনের আরো ঘনিষ্ট হওয়ার সুযোগ খুঁজে এবং তা পেয়েও যায়।

> "ঠাকুরপো, তোমার কথা শুনে হাসি পায়। তা দোষ হয়েছে কী, আমাদের কালে কথায় কথায় মানিনীর মান ভাঙাতে হত, এখন না-হয় মুর্ছো ভাঙাতে হবে।"
> মধুসূদন গো হয়ে বসে রইল। শ্যামাসুন্দরী বিগলিত করুণায় কাছে এসে হাত ধরে বললে, "ঠাকুরপো, অমন মন খারাপ কোরো না, দেখে সইতে পারি নে।"[২৯৩]

মধুসূদনের ঘনিষ্ট হওয়ার সাহস শ্যামার যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু যেহেতু শ্যামা মধুসূদনের বিষয়ে অনেক বছর ধরে অবহিত এবং দুর্বার গতি ও শক্তিসম্পন্ন বাঘও কুয়োয় পড়লে যে দশা হয় মধুসূদনের অবস্থা তখন সেরূপ। তাই সে সেই সুযোগটুকু কোনোভাবেই শ্যামা হাতছাড়া করতে চায় নি। তাছাড়াও শ্যামা এই সুযোগটুকু পাওয়ার জন্য অনেকদিন যাবৎ নীরবে নিভৃতে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে ছিল। ঔপন্যাসিকের ভাষায়ও তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

মধুসূদনের এত কাছে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেয় ইতিপূর্বে মন সাহস শ্যামার ছিল না। প্রগলভা শ্যামা ওর কাছে ভারি চুপ করে থাকত; জানত মধুসূদন বেশি কথা সইতে পারে না। মেয়েদের সহজ বুদ্ধি থেকে শ্যামা বুঝেছে মধুসূদন আজ সে-মধুসূদন নেই। আজ ও দুর্বল, নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে সতর্কতা ওর নেই। মধুর হাতে হাত দিয়ে বুঝল এটা ওর খারাপ লাগে নি। নববধূ ওর অভিমানে ঘা দিয়েছে, কোনো একটা জায়গা থেকে চিকিৎসা পেয়ে
ভিতরে ভিতরে একটু আরাম বোধ হয়েছে। শ্যামা অন্তত ওকে অনাদর করে না এটা তো নিতান্ত তুচ্ছ কথা নয়।

> শ্যামা কি কুমুর চেয়ে কম সুন্দরী, না-হয় ওর রঙ একটু কালো- কিন্তু ওর চোখ, ওর চুল, ওর রসালো ঠোঁট![২৯৪]

কুমুদিনীর অনুপস্থিতির মুহূর্তগুলো শ্যামা গ্রহণ করেছে এবং মধু দখলের প্রয়াসে এক ধাপ অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছে। এক দিকে দখল প্রক্রিয়া অন্যদিকে সান্ত্বনাকে শ্যামা একসূত্রে গেঁথেছে। যেখানে সান্ত্বনা, সেখানেই সুযোগ, সেখানেই ঘনিষ্টতা, সেখানেই সে দেখেছে সফলতা। তারই ধারাবাহিকতায় কুমুর ঘর থেকে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আবির্ভাব ঘটেছে শ্যামার। সহজেই বোঝা যায়, তার দৃষ্টি সীমানার বাইরে কেউ নয়, কুমু কিংবা মধুসূদন। বাইরে কুমুর প্রতি দরদ, অভিভাবকত্ব, সান্ত্বনা ভেতরে বিজয়োল্লাস।

Dhaka University Institutional Repository

কুমু যেই গেছে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে শ্যামা ঘরে প্রবেশ করে বললে, "বউ কোথায় গেল?"
"কেন?"
"সকাল থেকে ওর খাবার নিয়ে বসে আছি, এ বাড়িতে এসে বউ কি খাওয়াও বন্ধ করবে?"
"তা হয়েছে কী? নুরনগরের রাজকন্যা না-হয় নাই খেলেন! তোমরা কি ওঁর বাদী নাকি?"
"ছি ঠাকুরপো, ছেলেমানুষের উপর অমন রাগ করতে নেই। ও যে এমন না খেয়ে খেয়ে কাটাবে এ আমরা সহ্য করতে পারি নে। সাধে সেদিন মুর্ছো গিয়েছিল?"[২৯৫]

শ্যামাসুন্দরী কোনোভাবেই কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় নি। এ কারণে সে সর্বদা সচেতনভাবে অপেক্ষা করেছে এবং সে জানে কোথায়, কখন কীভাবে মধুকে একা একা পাওয়া যাবে। সেই মুহূর্তগুলোকে সে কাজে লাগিয়েছে। একটু কথা বলা, একটু কাছে যাওয়া, একটু একটু করে ঘনিষ্ট হওয়ার সর্বাত্মক প্রয়াস সে চালিয়ে গিয়েছে। সেটাই প্রমাণিত হয় তার অসময়ে রাতের অন্ধকার বারান্দায় মধুর জন্য অপেক্ষা করা দেখে। তবে এই অপেক্ষাকে সে অন্য প্রসঙ্গে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছে উপস্থিত বুদ্ধির মাধ্যমে। বাতির ঘর থেকে মধুসূদন বেরিয়ে এসে বারান্দা বেয়ে খানিকটা যেতেই সামনে দেখে শ্যামা। তার হাতে একটি প্রদীপ।

"একি ঠাকুরপো, এখানে কোথা থেকে এলে?"
মধুসূদন তার কোনো উত্তর না করে বললে, "তুমি কোথায় যাচ্ছ বউ?"
"কাল যে আমার ব্রত, ব্রাহ্মণভোজন করাতে হবে তারই জোগাড়ে চলেছি- তোমারও নেমন্তন্ন রইল। কিন্তু তোমাকে দক্ষিনে দেবার মতো শক্তি নেই ভাই।"[২৯৬]

যোগাযোগ উপন্যাসটি যে সময়ে রচিত, সে সময়ে প্রেম-ভালোবাসার বোধটি প্রকাশ্য ছিল না। তার পরেও প্রেম ছিল না তা নয়, তবে প্রকাশ ভঙ্গি ছিল ভিন্নতর। প্রেমের জন্য শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনকে ভালোবাসে এমন মনে হয় না বা এমন কোনো নিদর্শনও দেখতে পাওয়া যায় না। শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনকে চেয়েছে কেবল তার পরিবারে স্থায়ী আসন গড়ার জন্য। সে কারণে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে। মধুসূদনকে কথার জালে কিংবা মায়ায় জড়াতে চেয়েছে। তাই তো সে বলেছে–

সেই শেষরাত্রের অন্ধকারে প্রদীপের আলোয় শ্যামাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। শ্যামা একটু হেসে বললে, "আজ ঘুম থেকে উঠেই তোমার মতো ভাগ্যবান পুরুষের মুখ দেখলুম, আমার দিন ভালোই যাবে। ব্রত সফল হবে।" [২৯৭]

কুমুদিনীর সঙ্গে যখন পরোক্ষভাবে মধুসূদনের দূরত্বাবস্থা চলছিল, তখন আরো জেঁকে বসার চেষ্টা করলো শ্যামাসুন্দরী। তার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে দ্রুত ধাবমান হতে শুরু করলো। কখনো কথার জালে, কখনো সান্ত্বনার নামে, কখনো বা দিব্যির নামে তাকে গ্রাস করতে চাইলো। ব্রতের নামে, ব্রাহ্মণভোজনের নামে মধুসূদনকে করায়ত করার অভিমুখে ধাবিত হলো–

"কাল কিন্তু আমার ঘরে এসো, মাথা খাও।"[২৯৮]

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামাসুন্দরী দুধের বাটিতে চিনি ঘেঁটে দিচ্ছিল। অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মোটা বললে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে বেশ একটু যেন ঘোষণা করছে। একখানি সাদা শাড়ির বেশি গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয়, সর্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেছে, কিন্তু যেন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্নের মতো, বেলা যায়-যায় তবু গোধূলির ছায়া পড়ে নি। ঘন ভুরুর নিচে তীক্ষ্ম কালো চোখ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না, অল্প একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়। তার টস্‌টসে ঠোঁটদুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেছে। সংসার তাকে বেশি কিছু রস দেয় নি, তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামি বলেই জানে, সে কৃপণও নয়, কিন্তু তার মহার্ঘ্যতা ব্যবহারে লাগল না বলে নিজের আশপাশের উপর তার একটু অহংকৃত অশ্রদ্ধ। মধুসূদনের ঐশ্বর্যের জোয়ারের মুখেই শ্যামা এ সংসারে প্রবেশ করেছে। যৌবনের জাদুমন্ত্রে এই সংসারের চূড়ায় সে স্থান করে নেবে এমনও সংকল্প ছিল।

মধুসূদনের মন যে কোনো দিন টলেনি তাও বলা যায় না। কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই হার মানল না; তার কারণ, মদুসূদনের বিষয়বুদ্ধি কেবল যে বুদ্ধি তা নয়, সে হচ্ছে প্রতিভা। এই প্রতিভার জোরে সম্পদ সে সৃষ্টি করেছে, আর সেই সৃষ্টির পরমানন্দে সে গভীর মগ্ন। এই প্রতিভার জোরেই সে নিশ্চয় জানতো ধনসৃষ্টির যে তপস্যায় সে নিযুক্ত ইন্দ্রদেব সেটা ভাঙবার জন্যে প্রবল বিঘ্ন পাঠিয়েছেন- ক্ষণে ক্ষণে তপোভঙ্গের ধাক্কা লেগেছে, বার বারই সে সামলে নিয়েছে। সুবিধা ছিল এই যে, ব্যবসায়ের ভরা মধ্যাহ্নে তার অবকাশমাত্র ছিল না। এই কঠিন পরিশ্রমের মাঝখানে চোখের দেখায় কানের শোনায় শ্যামার যে সঙ্গটুকু নিঃসঙ্গভাবে পেত তাতে যেন মধুসূদনের ক্লান্তি দূর করতো। ক্রিয়াকর্মের পার্বণী উপলক্ষে শ্যামাসুন্দরীর দিকে তার পক্ষপাতের ভারটা একটু যেন বেশি করে ঝুঁকতো বলে বোঝা যায়। কিন্তু কোনোদিন শ্যামাকে সে এতটুকু প্রশ্রয় দেয় নি অন্তঃপুরে যাতে তার স্পর্ধা বাড়ে। শ্যামা মধুসূদনের মনের ঝোঁকটা ঠিক ধরেছে, তবুও ওর সম্বন্ধে তার ভয় ঘুচল না।

> দুধের বাটি থেকে মুখ না তুলে এক সময় আস্তে আস্তে বললে, "ঠাকুরপো, বউকে কি ডেকে দেব?"
> মধুসূদন কোনো কথা না বলে তার ভাজের মুখের দিকে গম্ভীরভাবে চাইল। তার ভাজ শ্যামাসুন্দরী ভয়ে থতমত খেয়ে প্রশ্নটাকে ব্যাখ্যা করে বললে, "তোমার খাবর সময় কাছে বসলে হয় ভালো, তোমাকে একটু সেবা করতে–"[২৯৯]

শ্যামাসুন্দরীকে আমরা অতিশয় বুদ্ধিমান, চতুর এবং সচেতন হিসেবে দেখতে পাই। নিজেকে বাঁচিয়ে অন্য জনের খবর সংগ্রহ, কিংবা কোনো খবর অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কৌশলটি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত। এ ধরনের বুদ্ধিদীপ্ততা উপন্যাসে সচরাচর চোখে পড়ে না। বউ যে মধুসূদনের ডেরায় তথা অফিসকক্ষে গিয়েছিল সেই খবরটি তাকে দেওয়াই ছিল শ্যামার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু যেন সাপও মরে

Dhaka University Institutional Repository

লাঠিও না ভাঙ্গে সেই উপায়ে তাকে খবরটি দেওয়া হয়। বউ মধুসূদনকে যে খুঁজতে পারে সেটা মধুসূদন বিশ্বাস হয়তো করবে কিন্তু মধুসূদনের কাছে বড় খবর তার বউ সেখানে কেন গিয়েছিল। এবং এটাই শ্যামা চেয়েছিল। অপরদিকে সে কুমুকেও একই পন্থায় জানিয়েছে তার দাদা আসছে। এই জানানোর মধ্যে দুটো বিষয় কাজ করে থাকতে পারে- প্রথমত, সে জানাতে চেয়েছে যে এ বাড়ির সকল খবর তার কাছে আগে আসে এবং দ্বিতীয়ত, কুমুর মধ্যে এক ধরনের সন্দেহ, ঈর্ষা কিংবা নারীসুলভ আঘাত হতে পারে। তার খবর পৌঁছানোর আরো একটি পদ্ধতি হলো খবর দেওয়ার পরিবেশ তৈরি করা। প্রথমেই সে কুমুদিনীকে বলতে পারতো তার দাদা আসছে। কিন্তু সে সেটা না করে প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসা করেছে তার মন ভালো নয় কেন এবং তার মন ভালো না থাকার কারণ যে তার মাতৃগৃহ হতে পারে সেটা কল্পনা করেই সে কুন্দকে খরবটি দিয়েছে।

১. শ্যামাসুন্দরী বললে, "তুমি এখানে বসে আছ, বউ যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"
"খুঁজে বেড়াচ্ছে! কোথায়?
"এই- যে দেখলুম, বাইরে তোমার আফিসঘরে গিয়ে ঢুকল। তা এতে এত আশ্চর্য হচ্ছ কেন ঠাকুরপো–সে ভেবেছে তুমি বুঝি–"[৩০০]

২. এমন সময় হঠাৎ শ্যামা এসে উপস্থিত; বললে "বউ, তোমাকে এমন শুকনো দেখি যে, অসুখ করে নি তো?"
কুমু বললে, "না।"
"বাড়ির জন্যে মনটা কেমন করছে। আহা, তা তো হতেই পারে। তা, তোমার দাদা তো আসছেন, দেখা হবে।"[৩০১]

মধুসূদন বিয়ের পর স্ত্রীকে যেভাবে চেয়েছিল কিন্তু দেখা গেল সেরকম সে নয়। আর দশটা সাধারণ নারীর মত নরম সে নয়। তাকে পুরুষ শাসনের যাঁতাকলে পেষা সম্ভব নয়। তাই সে নিজের অভিজাত গাম্ভীর্য বিসর্জন দিয়ে কাছে পেতে চেয়েছে। কিন্তু শ্যামা বিভিন্নভাবে মধুসূদনকে কুমুদিনীর কাছ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছে। বিভিন্নভাবে তাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দেবার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর নিবিড় সময়েও সে আকস্মিকভাবে হাজির হয়ে তাদেরকে বিব্রত করেছে। এক জনকে অপর জন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছে। তারা যদি অবসর সময় পায় তাহলে হয়তো একে অপরকে বুঝতে জানবে সেটা সে হতে দিতে চায় নি। উপরন্তু মধুসূন কুমুর কাছে যেটা প্রত্যাশা করে নি সেটাই শ্যামা কৌশলে করিয়েছে। অপরদিকে কুমু মধুসূদনকে যেভাবে পাওয়ার চেষ্টা করেছে সেখানেও শ্যামা বাধা সৃষ্টি করেছে। মধুসূদন চায় নি কখনো কুমু মধুসূদনের ডেরায় হাজির হোক কিন্তু শ্যামা কুমুকে দিয়ে সেটাই করিয়েছে। মধুসূদন চেয়েছিল দাদার আসার খবর সে নিজে কুমুকে দিয়ে কুমুর মন পাওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু শ্যামা পূর্বেই সেই খবর পৌঁছে দিয়ে কুমুকে বিভ্রান্ত এবং মধুসূনকে তার কাছে ছোট

এবং খাটো করেছে। চতুরা শ্যামা বুঝেছে মধুসূদন কুমুর মন পায়নি, সুতরাং সে যেন তার মন না পায় সে কারণে কুমুকে উসকিয়ে দিয়েছে।

১. শ্যামা বুঝেছিল ওর দাদার খরব মধুসূদন কুমুকে দেয় নি, যে বউয়ের মন পায় নি, পাছে সে বাড়িমুখো হয়ে আরো অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কুমুর মনটাকে উসকিয়ে দিয়ে বললে, "তোমার দাদার মতো মানুষ হয় না এই কথা সবার কাছেই শুনি। বকুলফুল, চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে, ভাঁড়ার দিতে হবে। আপিসের রান্না চড়াতে দেরি হলে মুশকিল বাধবে।"[৩০২]

২. তখন আর একবার মধুসূদন কুমুর হাতখানা টেনে নেবার উপক্রম করছে এমন সময় শ্যামা হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকেই বললে, "ওমা, ঠাকুরপো যে![৩০৩]

৩. "এমন কিছু নয়। দেখলুম ঠাকুরপোর মেজাজ কিছু চড়া, ভাবলুম তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা করে জানি, নতুন প্রণয়ে খটকা বাধল কোনখানটাতে। মনে রেখো বউ, ওর সঙ্গে কী রকম করে বনিয়ে চলতে হয় সে পরামর্শ আমরাই দিতে পারি।[৩০৪]

শ্যামা শুধু মধুসূদনকে বিব্রত ও বিভ্রান্ত করে ক্ষান্ত হয় নি, কুমুর কাছে বকুলকেও ছোট করার প্রয়াস চালিয়েছে। বকুলের কাছে গিয়ে কুমুদিনী একটু স্বস্তি পায় সেটা শ্যামা জানে বলে সেখানে যাতায়াতের ব্যাপারেও কুমুদিনীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে।

বকুলফুলের ঘরে চলেছ বুঝি? তা যাও, মনটা খোলসা করে এসো গে।"[৩০৫]

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর কারণে কুমুর মনে হয় শ্যামাসুন্দরী আর মধুসূদন একই মাটিতে এক কুমোরের চাকে গড়া অভিন্ন মানুষ। কুমুদিনীর এটাও মনে হয় মধুসূদন এবং শ্যামাসুন্দরী তারা দুজনেরই ভাবগতিকের একটা অনুপ্রাস আছে যেন-তারা একই জগতে বাতাস। উভয়ের চালচলন, কথাবার্তার ধ্যাচ মনে হয় একই ধরনের। এক বৃক্ষের দুটি ফুলের মতন তাদের সুবাস তথা প্রকৃতি।

প্রকৃতি কখনো শূন্যস্থান পছন্দ করে না জানা যায়। তাই কেউ যেটা এক জায়গায় না পায় তখন অন্যত্র খুঁজবে সেটাই স্বাভাবিক, প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। তাই শ্যামাসুন্দরী একদিকে যেমন শূন্যস্থান তৈরি করতে চেয়েছে তেমনি চেয়েছে সেই শূন্যস্থানে নিজেকে প্রতিস্থাপন করতে। অবিরতভাবে না হলেও মাঝে মাঝে শূন্যস্থান পূরণে সে আপনাকে ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছে, তা বোঝা যায় মধুসূদনের আবেদনে। তবে এই শূন্যস্থান তৈরি করা শ্যামাসুন্দরীর পক্ষে খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। কখনো বুদ্ধি দিয়ে, কখনো মান-অভিমান করে, কখনো জিদ করে, কখনো নিজেকে সমর্পণ করে তাকে সেই শূন্যস্থান পূরণের কাজ করতে হয়েছে। প্রয়োজনে সে না খেয়ে থেকেও তা করতে দ্বিধাবোধ করে নি। অপেক্ষা করেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা মুহূর্তের জন্য, একটা সুযোগের অপেক্ষায়। যদি

Dhaka University Institutional Repository

কোনো সুযোগ কখনো এসে যায়, তাই কোনো মুহূর্তকেই সে নষ্ট করতে চায় নি। এটা যেন তার মরণপণ নীরব লড়াই, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

> কিন্তু শুধু হৃদয়টাকে ব্যর্থ বেদনায় বিদ্ধ করবার পাগলামিই যে এই প্রতীক্ষার মধ্যে আছে তা নয়, এর মধ্যে একটা প্রত্যাশাও আছে–যদি ক্ষণকালের কধ্যে একটা কিছু ঘটে যায়; অসম্ভব কখন সম্ভব হয়ে যাবে এই আশায় পথের ধারে জেগে থাকা।[৩০৬]

মধুসূদনকে বাড়ির সবাই ভয় করতো, শ্যামাসুন্দরীরও ভয় ছিল। মধুসূদন মানসিকভাবে কখনো কখনো শ্যামাসুন্দরীর দিকে কিছুটা হলেও টলেছে, শ্যামাসুন্দরী তা আন্দাজ করতে পেরেছে। কিন্তু কোন দিক দিয়ে শ্যামা তার বেড়া ডিঙিয়ে মধুসূদনের কাছে যাবে তা বুঝতে পারে নি। হাতুড়ি ডাক্তারের মত কখনো কখনো হাতড়ে হাতড়ে কিছুটা চেষ্টা করেছে বটে, তবে প্রত্যেকবারই ফিরেছে বেশ ধাক্কা খেয়ে। অসতর্ক অবস্থায় মধুসূদন শ্যামাকে অল্প একটু প্রশ্রয় দিয়ে দেখেছে তাতে যথার্থই ভয়ের কারণ ঘটেছে। শ্যামাসুন্দরীও সে ব্যাপারে নিজেকে খুবই সংযত করে চলেছে। কিন্তু মধুসূদনের বিয়ের পর-

> মধুসূদনের বিয়ের পর থেকে সে আর থাকতে পারছিল না। কুমুকে মধুসূদন যদি অন্য সাধারণ মেয়ের মতোই অবজ্ঞা করত, তা হলে সেটা একরকম সহ্য হত। কিন্তু শ্যামা যখন দেখলে রাশ আলগা দিয়ে মধুসূদনও কোনো মেয়েকে নিয়ে অন্ধবেগে মেতে উঠতে পারে, তখন সংযম রক্ষা তার পক্ষে আর সহজ রইল না।[৩০৭]

মধুসূদনের কাছে ব্যবসাটাই বড় বলে মধুসূদন সব সময় ভেবে এসেছে। কিন্তু বিয়ের পর কুমুদিনীর কাছে বার বার ধাক্কা খেয়ে প্রথমে রাগ, পরে বিরাগ এবং আরো পরে জেগে উঠেছে প্রেম। কিন্তু মধুসূদনের এই প্রেমচিন্তাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে দেয় নি শ্যামা। মধুসূদনও নিজেকে বেশিক্ষণ সংবরণ করতে পারে নি।

> শ্যামা শিয়রের কাছে বসে "তোমাকে যে বড়ো রোগা দেখাচ্ছে আজ" বলে একটু ঝুঁকে পড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। [৩০৮]

শ্যামাসুন্দরী সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইল না। সমস্ত সংকোচ উপেক্ষা করে জোরে-সোরে যেন রাজ্য ও রাজকুমার সংহার করতে লাগলো। কারণ তার হাতে তো বেশি সময় নেই। কুমুদিনী এসে পড়লেই তার এত দিনের আশা আকাঙ্ক্ষার স্রোতে ভাটা পড়বে, এমনকি মৃত আগ্নেয়গিরির অবস্থা হতে পারে। তাই সে নেমে পড়ে দখল যুদ্ধে। দখল তখনই সার্থক যখন সেই দখলের কথা সবাই জানতে পারবে। তাকে তোয়াজ করবে, তাকে সবাই গ্রহণ কিংবা মেনে নিবে। ফলশ্রুতিতে জানাজানি হতে আর বাকি থাকে না। বাড়ির গৃহপরিচারিকা থেকে সবাই জানতে পারে সে কাহিনি। সেই দখলদারিত্বের

Dhaka University Institutional Repository

কথা। কারণ কথা কিংবা আগুন যত ছোটই হোক তা কখনো চাপা থাকে না। মধুসূদন ও শ্যামাসুন্দরীর প্রণয়ের কথা এত দিন যেটা ছাই চাপা ছিল, তা লেলিহান শিখার মতো সজোরে, সবেগে আত্মপ্রকাশ করলো।

১. দখলটা প্রকাশ্য হলে তার জোর আছে, কোনোখানে লজ্জা রাখলে চলবে না। অবস্থাটা দেখতে দেখতে দাসীচাকরদের মধ্যেও জানাজানি হল। মধুসূদনের মনে বহুকালের প্রবৃত্তির আগুন যতবড়ো জোরে চাপা ছিল, ততবড়ো জোরেই তা অবারিত হল, কাউকে কেয়ার করলে না, মত্ততা খুব স্থূলভাবেই সংসারে প্রকাশ করে দিলে।[৩০৯]

২. রাত্রে মধুসূদন যখন শুতে এল শ্যামাসুন্দরী অনাহূত ঘরে ঢুকে বললে, "আহা তুমি একলা।"[৩১০]

প্রথম প্রথম শ্যামাসুন্দরী প্রত্যাশা করেছে যে, মধুসূদনের সংসারে তার স্থানটা পাকা হয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ির গৃহকর্মীদের আচরণে প্রকাশ পেতে থাকলো তারা শ্যামাকে প্রভুপদে বসাতে রাজি নয়। বরং তাকে অবজ্ঞা করাই যেন তাদের অভ্যাসে পরিণত হতে থাকে। শ্যামা বাড়ির চাকরদের অনাবশ্যক গালি, ভৎর্সনা ও অকারণ কাজের ফরমাশ, তাদের দোষত্রুটি এবং অযথা খিট খিট করলে বাড়ির একজন পুরোনো চাকর শ্যামার অসার তর্জন-গর্জন সইতে না পেরে কাজে ইস্তফা দেয়। ফলশ্রুতিতে, শ্যামাকে মাথা হেঁট করতে হয়। মধুসূদনের কতকগুলো কুসংস্কার আছে। যে সব চাকর তার আর্থিক উন্নতির সমকালবর্তী, তাদের মৃত্যু বা পদত্যাগকে মধুসূদন সংসারের জন্য অমঙ্গলজনক মনে করে। তাই সে শ্যামার কথায় কর্ণপাত না করে সেই চাকরকে বহাল তবিয়তে বহাল রাখলো এবং তাকে পুরস্কৃত করলো।

> সেই সময়কার উড়ে চাকর দধি যখন কাজে জবাব দিলে মধুসূদন সেটা গ্রাহ্যই করলে না, উলটে সে লোকটার ভাগ্যে বকশিশ জুটে গেল। শ্যামাসুন্দরী এই নিয়ে ঘোরতর অভিমান করতে গিয়ে দেখে হালে পানি পায় না। দধির হাসিমুখ তাকে দেখতে হল।[৩১১]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: *গণদেবতা:* শ্রীহরি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের এক জন অন্যতম দিকপতি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাসে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্ব-সে দ্বন্দ্বে জমিদার শ্রেণির পরাভব ও শিল্পপতি-ব্যবসায়ী শ্রেণির বিজয়, যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে কৃষি সভ্যতার বিরোধ-সে বিরোধে গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতির ভাঙন ও শিল্পকেন্দ্রিক শহুরে অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা, গ্রামীণ সমাজের শাসন-সংস্কার ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ, জমিদার ও ধনী চাষির সঙ্গে গরিব চাষির বিরোধিতা-সে

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধে প্রবলের কাছে গরিবের আত্মসমর্পণ, পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, অর্থনৈতিক বৈষম্যের নির্লজ্জ বিস্তার, যুব সম্প্রদায়ের ক্রোধ, অস্থিরতা, বিদ্রোহ-সব মিলিয়ে গোটা রাঢ় অঞ্চলের গ্রামীণ জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং তারই মাঝে গোটা মানুষের অভ্যুদয় নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তার উপন্যাসগুলোতে। 'বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭৪) এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) কৃষকদের জীবনসংগ্রাম নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা মহাশ্বেতা দেবীর মতো কৃষকদের শোষণ-নির্যাতনের ঘটনা সেভাবে অঙ্কিত হলেও তাদের লড়াই-সংগ্রামের ঘটনা বর্ণিত হয় নি।'[৩১২]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সংখ্যা ষাট্‌টি বলা হয়ে থাকে। তার মধ্যে প্রতিনিধিত্বকারী উপন্যাসসমূহ হলো- *চৈতালী ঘূর্ণি* (১৯৩১), *ধাত্রীদেবতা* (১৯৩৯), *কালিন্দী* (১৯৪০), *কবি* (১৯৪২), *গণদেবতা* (১৯৪২), *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭), *রাধা* (১৯৫৭) প্রভৃতি। এগুলোর মধ্যে বিশেষস্থানীয় উপন্যাস হলো- গণদেবতা (১৯৪২)। *কবি* (১৯৪২) ও *গণদেবতা* (১৯৪২) উভয় উপন্যাস একই বছরে প্রকাশিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে সে কারণেই হয়তো বিষয় ও চরিত্রগত মিলও রয়েছে। মানব চরিত্রের অনেক জটিলতা ও নিগূঢ় রহস্য তাঁর *গণদেবতা* উপন্যাসে অত্যন্ত জীবন্তভাবে প্রকাশিত। *গণদেবতা* প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। তখন তার নাম ছিল *চণ্ডীমণ্ডপ*। অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ থেকে চৈত্র ১৩৪৮ সংখ্যা পর্যন্ত মুদ্রিত ত্রিশটি অধ্যায়ের নাম ছিল *চণ্ডীমণ্ডপ*। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় (আশ্বিন, ১৩৪৯) নাম দেওয়া হয় *গণদেবতা*। সমালোচক বার্ণিক রায় উপন্যাসের নাম সম্পর্কে বলেছেন-"*গণদেবতা*'র চেয়ে *চণ্ডমণ্ডপ* নাম অধিক প্রযোজ্য। কারণ এই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনাই চণ্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে। তাকে ঘিরেই গ্রামের সমস্ত মানুষের পরিচয় এসেছে।"[৩১৩]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাদর্শের মূলে ছিল গান্ধীবাদী রাজনীতিবোধ ও ভাববাদ। '১৯৫৮-১৯৭০ কালপর্বে ঔপন্যাসিকরা তাঁদের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনজিজ্ঞাসায় রূপায়ণের প্রশ্নে উনিশ শতকীয় এপিক ফর্মের উপন্যাস রচনায় মনোযোগী হলেন। এই নবধারা উদ্ভাবনার পেছনে জাতিসত্তার সমকালীন বহুকৌণিক সংকটচেতনার ভূমিকাই মুখ্য। সময় ও ইতিহাসের পটে ব্যক্তি ও সমষ্টির সংগ্রামশীল জীবন-অবলোকনের মধ্য দিয়ে বাঙালির আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তাসন্ধানকে ইতিহাসের মূলধারায় স্থাপন করার ক্ষেত্রে এপিকধর্মী উপন্যাসের উপযোগিতা সর্বাধিক। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের *গোরা* (১৯০৯), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম* (১৯৪৩-৪৪), অন্নদাশঙ্কর রায়ের *সত্যাসত্য* (১৯৩২-৪২) এবং সতীনাথ ভাদুরীর *ঢোঁড়াই চরিতমানস* (১৯৪৯-৫১) এ

Dhaka University Institutional Repository

ধারার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।'[৩১৪] 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম-এ কলোনিয়াল সমাজের ক্রমবিবর্তনের দ্বন্দ্বজটিল রূপের সঙ্গে ব্যক্তি ও সমষ্টির আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ বিধৃত হয়েছে। বাকুলিয়া-তালতলির নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ প্যাটার্নের মধ্যে ভারতবর্ষীয় রাজনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদ্বন্দ্বের অভিঘাত বিশেষ তরঙ্গ-কম্পন'[৩১৫] সূচিত করেছে।

গণদেবতা উপন্যাসের কাহিনির সূচনাকাল ধরা হয় ১৯২২ সাল। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অন্যতম উপন্যাস *গণদেবতা*'র অন্যতম ও একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র 'শ্রীহরি ঘোষ'। তাকে ঘিরেই উপন্যাসটির ঘটনাবলী মূল আবর্তে ঘুরে ফিরে এসেছে। সে তৎকালীন সমাজের ধনতন্ত্রের প্রতীকী চরিত্র। তৎকালীন সমাজের উত্থান ও পতনের দৃশ্য, ধনতন্ত্রের বিকাশ ও সামন্ততন্ত্রের বিলুপ্তি প্রভৃতি বিষয় ছিরু পাল চরিত্রের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছে। শ্রীহরি অরফে ছিরু পাল ধনতন্ত্রের পথিকৃৎ। উপন্যাসের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তার চারিত্রিক ও শ্রেণিগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার নামের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষণীয়। ছিরু > ছিরু পাল> ছিড়ে মোড়ল> শ্রীহরি ঘোষ। শ্রেণি পরিবর্তনের ধারা- গরীব চাষী> নব্য মহাজন> জমিদারের গোমস্তা> ধনী ক্রেতা> জমিদার। প্রথমে ঔপন্যাসিকের ভাষায় ছিরু পালের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনে নেওয়া কর্তব্য।

> শ্রীহরির বিশাল দেহ-কিন্তু স্থূল নয়, একবিন্দু মেদশৈথিল্য নাই। বাঁশের মত মোটা হাত-পায়ের হাড়- তাহাতে জড়ানো কঠিন মাংসপেশী। প্রকাণ্ড চওড়া দু'খানা হাতের পাঞ্জা, প্রকাণ্ড বড় মাথা, বড় বড় উগ্র চোখ, থ্যাবড়া নাক, আকর্ণ-বিস্তার মুখগহ্বর, তাহার উপর একমাথা কোঁকড়াঝাঁকড়া চুল। এত বড় দেহ লইয়া সে কিন্তু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দ্রুত চলিতে পারে। পরের ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া সে রাতারাতি আনিয়া আপনার পুকুরে ফেলিয়া রাখে, শব্দ নিবারণের জন্য সে হাত-করাত দিয়া বাঁশ কাটে। খেপলা জাল ফেলিয়া রাত্রে সে পরের পুকুরের পোনামাছ আনিয়া নিজের পুকুর বোঝাই করে; প্রতি বৎসর তাহার বাড়ির পাঁচিল সে নিজেই বর্ষার সময় কোদাল চালাইয়া ফেলিয়া দেয়, নতুন পাঁচিল দেবার সময় অপরের সীমানা অথবা রাস্তা খানিকটা চাপাইয়া লয়। কেহ বড় প্রতিবাদ করে না, কিন্তু ব্যক্তিগত সীমানা আত্মসাৎ করিলে প্রতিবাদ না করিয়া উপায় থাকে না। তখন ছিরু কোদাল হাতেই উঠিয়া দাঁড়ায়; দন্তহীন মুখে কি বলে বোঝা যায় না। মনে হয় একটা পশু গর্জন করিতেছে। এই চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সেই সে দন্তহীন , যৌনব্যাধির আক্রমণে তাহার দাঁতগুলো প্রায় সবই পড়িয়া গিয়াছে। হরিজন-পল্লীতে সন্ধ্যার পর যখন পুরুষেরা মদে বিভোর হইয়া থাকে, তখন ছিরু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শিকার ধরিতে প্রবেশ করে। কতবার তাহারা উহাকে তাড়া করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে-কিন্তু ছিরু ছুটিয়া চলে অন্ধকারচারী হিংস্র চিতাবাঘের মত।[৩১৬]

ছিরু পাল ছিল দরিদ্র জনজীবনের প্রতিনিধি। ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি। কেন এবং কী কারণে তার এই পরিবর্তন তা জানতে হলে প্রয়োজন তার শৈশব ও কৈশোর কালকে জানা। ছিরুর বাড়ি হতে তার মাতামহের বাড়ি দশ কিলোমিটার দূরে দুর্গাপুর গ্রামে। ছোটকালে সেখানে সে মাঝে মাঝে যেত মাতামহের সঙ্গে দেখা করার জন্য। সেই গ্রামেই বাস করতো এক জন দুর্ধর্ষ ব্যক্তি ত্রিপুরা সিং। ত্রিপুরা সিং এক সময় অনেক দরিদ্র কৃষক ছিল। পাশাপাশি সে কাজ করতো এক জন

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় জমিদারের বাড়িতে, জমিদারের লাঠিয়াল হিসেবে। পাশাপাশি সে ব্যবসা করতো তামাকের। সে তামাক ফেরি করে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করতো। এর পর শুরু করে মহাজনী তারপর সে আস্তে আস্তে জমি কিনতে কিনতে হয়ে যায় ছোটখাট জমিদার। জমিদারের কাছ থেকে কিছুটা জমিদারি কিনে হয়ে পড়ে নিজেই জমিদার। এক জন ছোট্ট কৃষক থেকে বুদ্ধি ও বাহুবলে সে হয়ে যায় জমিদার। এর পেছনে ছিল শ্রম ও সাধনা। সঙ্গে ছিল কিছু নেতিবাচক প্রচেষ্টা। যেমন- অলক্ষ্যে গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া এবং গ্রামের সাধারণ মানুষকে সেই বিপদের সময় অর্থ সাহায্য দেওয়া, তবে সেটা অবশ্যই সুদে। এভাবে সে গ্রামের মানুষকে সাহায্য করে মূলত নিজেকে সে প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের মাঝে। বাধ্য করেছে সাধারণ অশিক্ষিত মানুষদেরকে তার কাছ থেকে সুদে টাকা ধার নিতে। সেই সুদ দিতে গিয়ে অনেকে হয়ে পড়েছে নিঃসহায়। সেই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছে ত্রিপুরা সিং। ছোটকালে ছিরু মাতামহের কাছে ত্রিপুরা সিং-এর জমিদার হওয়ার কাহিনি শুনেছে গভীর মনোযোগ দিয়ে এবং নিজের অন্তরে তা ধারণ করেছে, লালন করেছে তীব্র মমতায়। নিজের ভেতর ধনী হবার স্বপ্নকে লালন করে ছিরু বড় হয়েছে। উপায় হিসেবে সে আইডল বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে ত্রিপুরা সিং-এর ধনতান্ত্রিক জীবনী। ঔপন্যাসিকের ভাষায়-

> বাল্যকালে শ্রীহরি মাতামহের ওখানে যাইত, তখন সে ত্রিপুরা সিংকে দেখিয়াছে। লম্বা চওড়া দশাশায়ী চেহারা। জাতিতে রাজপুত। প্রথম বয়সে ত্রিপুরা সিং সামান্য ব্যক্তি ছিল। সম্পত্তি ছিল, মাত্র কয়েক বিঘা জমি। সেই জমিতে সে পরিশ্রম করিত অসুরের মত। আর স্থানীয় জমিদারের বাড়িতে লগ্দীর কাজ করিত। আরও করিত তামাকের ব্যবসা। হাতে লাঠি ও মাথায় তামাকের বোঝা লইয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে ফেরি করিয়া বেড়াইত, ক্রমে শুরু করে মহাজনী। সেই মহাজনী হইতে প্রথমত বিশিষ্ট জোতদার, অবশেষে তাহার মনিব জমিদারের জমিদারির খানিকটা কিনিয়া ছোটখাটো জমিদার পর্যন্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরা সিংয়ের দাড়ি ছিল, বড় শখের দাড়ি, সেই দাড়িতে গালপাট্টা বাঁধিয়া গোঁফে পাক দিতে দিতে সে বলিত, শ্রীহরি নিজের কানে শুনিয়াছে, -সে ছেলেবেলায়-'এহি গাঁও হমি তিন-তিনবার পুড়াইয়েছি, তব না ই বেটালোকে হমাকে আমল দিল!'[৩১৭]

উপন্যাসের শুরুতে ছিরু পালকে দেখা যায়, যখন ছিরু পাল চুয়াল্লিশ বছর বয়স্ক দুই পুত্রের জনক। শুরু থেকেই দেখা যায় ছিরু পালকে ধনতান্ত্রিক হবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে। গ্রামের শালিশ দিয়ে সূত্রপাত উপন্যাসের। শালিশ গিরিশ ও অনিরুদ্ধকে নিয়ে। তারা দু'জনই দরিদ্র কৃষক এবং সেই সঙ্গে তাদের পারিবারিক ব্যবসায় যথাক্রমে ছুতার ও কামার। সেই শালিশী আসরে দেখা যায় ছিরু পালকে জেঁকে বসতে কারণ সে হতে চায় সমাজের অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যদিও তখন পর্যন্ত সে গ্রামের নমস্য ব্যক্তিতে পরিণত হয় নি। কিন্তু সম্পদে সে গ্রামে সে বেশ প্রতাপশালী। গ্রামের অন্যান্য ধনী পরিবারে সঙ্গে তুলনায় তার সম্পদ কোনো অংশেই কম নয় বলে গ্রামের লোকের ধারণা। সে সম্পদ যেভাবে

উপার্জন করেছে তা সমাজে রীতিসিদ্ধ নয় বলে সমাজে সে তখন পর্যন্ত কিছুটা তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাই সে শালিশী আসরে জাঁকিয়ে বসে নিজের অস্তিত্বকে সজোরে জানান দিতে চায়।

> ছিরু বা শ্রীহরি পালই এই দুইখানা গ্রামের নূতন সম্পদশালী ব্যক্তি। এ অঞ্চলের মধ্যে বিশিষ্ট ধনী যাহারা, ছিরু ধন-সম্পদে তাহাদের কাহারও চেয়ে কম নয়-এই কথাই লোকে অনুমান করে। লোকটার চেহারা প্রকাণ্ড; প্রকৃতিতে ইতর এবং দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। সম্পদের জন্য যে প্রতিষ্ঠা সমাজ মানুষকে দেয়; সে প্রতিষ্ঠা ঠিক ঐ কারণেই নাই। অভদ্র, ক্রোধী, গোঁয়ার, চরিত্রহীন, ধনী ছিরু পালকে লোকে বাহিরে সহ্য করিলেও মনে মনে ঘৃণা করে, ভয় করিলেও সম্পদোচিত সম্মান কেহ দেয় না। এ জন্য ছিরুর ক্ষোভ আছে, লোকে তাহাকে সম্মান করে না বলিয়া সেও সকলের উপর মনে মনে রুষ্ট। প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা জোর করিয়া আদায় করিতে সে বদ্ধপরিকর। তাই সাধারণের সামাজিক মজলিস হইলেই ঠিক মাঝখানে আসিয়া সে জাঁকিয়া বসে।[৩১৮]

আসরের মধ্যমণি হয়ে থাকলেই শুধু চলে না, কিছু কথা না বলতে নিজের অস্তিত্বকে, নিজের অবস্থানকে জানান দেয়া যায় না। তাই সে আসরে বসে চুপ থাকতে পারে না। গ্রামের প্রধান মান্য ব্যক্তিদের হাতে বিচারের দায়িত্ব চলে যাবার আগেই সে নিজ দায়িত্বে বিচারের মাতব্বর সাজতে চায়। গরীব অনিরুদ্ধ ও গিরিশকে সে রাগতস্বরে প্রশ্ন করে বসে, ঠিক প্রশ্ন নয় ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করে তারা কেন গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে তাদের কারবার করে অর্থাৎ ছুতোর ও কামারের কাজ করে। উত্তরে তারা গ্রামের মানুষের প্রবঞ্চনার কথা বললে সে পুনরায় তাদের বলে, কে তাদের প্রবঞ্চনা করেছে, কে তাদের ন্যায্য দাম দেয় নি। তারা জানায় তাদের কাজের বিনিময়ে যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল তা গ্রামের মানুষ তাদের দেয় না কিংবা ধানের সময় ধান দিয়ে পাওয়া শোধ করার কথা থাকলেও তা তারা পায় না। ছিরু তাদের বলে যারা দেয় না তাদের নাম বলতে। তারা জানায় সে অর্থাৎ ছিরু পাল নিজেই দেয় না।

> ছিরু সাপের মত গর্জিয়া উঠিল- পাও না? কে দেয় নি শুনি? মুখে পাই না বললে তো হবে না। বল, কার কাছে পাবে তোমরা?[৩১৯]

অগ্রহণযোগ্য পন্থায় সম্মানিত হয়ে উঠলেও নেই তার প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা কখনো জোর করে হয় না কথাটি যেমন সত্য তেমনি এই সত্য কখনো কখনো ধামাচাপা পড়ে বৃহৎগর্ভে, যার বের হয়ে আসতে সময় লাগে অনেক। সে চেষ্টাই করতে দেখা যায় ছিরু পালকে। গ্রামের সম্মানিত অনেক ব্যক্তি থাকলেও ছিরু পাল নিজেই বিচারের দায়িত্ব নেওয়ায় এবং গ্রামের বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তি চৌধুরী সাহেবের কথায় কর্ণপাত না করায় গিরিশ ও অনিরুদ্ধ বিচারিক সভা পরিত্যাগ করে। তাদের বক্তব্য যারা ছিরু পালের

Dhaka University Institutional Repository

মতো ব্যক্তিকে শাসন করতে পারে না সেখানে তাদের থাকার কোনো মানে হয় না। সুতরাং তারা সভাসদ প্রাঙ্গন ত্যাগ করে। তাদের মুখের ভাষায়-

> অনিরুদ্ধ বলিল-আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা আর ও কাজ করব না মশায়, জবাব দিলাম। যে মজলিস ছিরু মোড়লকে শাসন করতে পারে না, তাকে আমরা মানি না।[৩২০]

ছিরু পালের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা সে নিজেকে জাহির করতে চায় এবং কেউ তাকে বাধা দিলে সে সেটা সহ্য করতে পারে না। কারণ সে হতে চায় গ্রামের একমাত্র বিচারিক ব্যক্তি। সে চায় সবাই তাকে সম্মান করবে, তার কথা অনুযায়ী সবাই চলবে। সবাই তাকে মান্য করবে। যারা সে প্রাপ্তিতে বাধ সেধেছে তাদের কাউকে সে ছেড়ে দেয় নি। চরম প্রতিশোধ প্রবণ হয়ে সে তাদের দমন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেটা অবশ্যই নেতিবাচক সিদ্ধান্ত। তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে সে পর দিনই অনিরুদ্ধের উপরে প্রতিশোধ নিতে তার দুই বিঘা জমির ধান কেটে নিয়ে গেছে। তার প্রতিশোধের দুটি দিক রয়েছে। এক. সে প্রতিশোধ নেয়, দুই. সেটা তার কেবল নেশা নয় পেশাও।

১. পরদিন প্রাতেই শোনা গেল, অনিরুদ্ধের দুই বিঘা বাকুড়ির আধ-পাকা ধান কে বা কাহারা নিঃশেষে কাটিয়া তুলিয়া লইয়াছে।[৩২১]
২. ছিরু ভয়ঙ্কর ব্যক্তি- এ সংসারে তাহার অসাধ্য কিছুই নাই! এ ধান কাটিয়া লওয়া তাহার অনিরুদ্ধের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যই নয়-চুরিও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য।[৩২২]

ছিরু খুব ধুরন্দর ব্যক্তি, অতি চতুর এবং চালাক। পরিবেশকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়, তা তার ভালোভাবে জানা। তাই সে যে অপরাধ করে তার কোনো সাক্ষ্য থাকে না। যা করে রাতের আঁধারে। দিনে সে কোনো রকম অপরাধ করে না, তার কারণ কোনো সাক্ষ্য সে রাখতে চায় না। তাছাড়া সে রাতের আঁধারে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। জীবনের ও কাজের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সে রাতের আঁধারকে তার চলার ও কাজের উপযুক্ত সময় হিসেবে বেছে নিয়েছে। অপরাধকে ঢাকা দেবার জন্য গড়ে তুলেছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ই। থানার জমাদার থেকে দারোগা পর্যন্ত সবার সঙ্গে তার গভীর ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক। টাকা দিয়ে সে সবসময় তাদেরকে হাতে রাখে। তাই অনিরুদ্ধর ধান কেটে নিয়ে গেলেও থানায় নালিশ করে কোনো সুরাহা হয় না।

> ও এখুনি টাকা দিয়ে দারোগার মুখ বন্ধ করবে। তা ছাড়া জমাদারের সঙ্গে ছিরুর বেশ ভাবের কথা তো জানেন! একসঙ্গে মদ-ভাং খায়-[৩২৩]

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বে এক বার বলা হয়েছে, শ্রীহরি তথা ছিরু পাল প্রতিশোধপ্রবণ মানুষ। তাকে নিয়ে কেউ নেতিবাচক আলোচনা করলেও সে সেটা মেনে নিতে পারে না। হরিজন পল্লীতে তাকে এবং দুর্গাকে নিয়ে নোংরা সমালোচনা হলে, সে সেটা মেনে নিতে পারে নি। হরিজনপল্লীর বাসিন্দা পাতু তার বোন ও ছিরুকে নিয়ে যখন বলছিল-'আমার ভগ্নী দুর্গা একটু বজ্জাত বটে; বিয়ে দেলাম তো পালিয়ে এল শ্বশুরঘর থেকে। সেই তারই সঙ্গে মশায় ছিরু পাল ফষ্টিনষ্টি করবে। যখন তখন পাড়ায় এসে ছুতোনাতা নিয়ে বাড়িতে ঢুকে বসবে।'[৩২৪] তখন সে নিজেকে খুব অপমানিতবোধ করে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি ভর করে। কোনোরকম না ভেবে তার বিড়ির আগুনে পুড়িয়ে দেয় পুরো হরিজনপল্লী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খড়ের ঘরগুলো দ্রুত আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মে পরিণত হয়। অনেকগুলো গৃহহীন ও খাদ্যহীন হয়ে পড়ে। সেটাই তার মূল চাওয়া ছিল। কারণ গ্রামের সাধারণ মানুষ যত গরীর হবে, গৃহহীন হবে, খাদ্যহারা হবে তার তত লাভ। সে তার ধনতান্ত্রিক চিন্তাকে বাস্তবায়নের সুযোগ পাবে।

> শ্রীহরি আবার একটা বিড়ি ধরাইল। কিছুক্ষণ পরে সে গাছতলা হইতে বাহির হইয়া জ্বলন্ত বিড়িটা পাতুর চালের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া দ্রুত লঘুপদে আপন বাড়ির দিকে চলিয়া গেল।[৩২৫]

ছিরুর অপরাধ অনেক। সে গ্রামের মুরব্বী লোকদের সম্মান করে না। তবে বেশিরভাগ অপরাধই তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে প্রতিশোধপ্রবণতার কারণে। শ্রীহরি বলিল–'অন্যায় আমি করব না, হরিশ-দাদা। কারু অনিষ্টও আমি করতে চাই না। কিন্তু আমার মাথায় যে পা দেবে, তাকে আমি শেষ করব–সে অন্যায়ই হোক আর অধর্মই হোক।'[৩২৬] তাই, সে গিরিশ ও অনিরুদ্ধের শালিসে বিচার করতে না পেরে অনিরুদ্ধের দুই বিঘা জমির ধান কেটে নিয়ে গেছে। পাতুর অপমানকর কথায় অপমানিতবোধ করায় তাদের পাড়ায় আগুন দিয়েছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ তার কথা না শুনে দেবনাথ ঘোষের দিকে ধাবিত হতে থাকলে প্রজাসমিতির মিটিংকে বান্‌চাল করার জন্য থানা থেকে দারোগাকে এনেছে। চণ্ডীমণ্ডপের ছাউনি দিতে পয়সা দাবি করায় তাদের প্রতিও সে চড়াও হয়েছে। তালগাছের পাতা কাটাকে কেন্দ্র করে লাঠিয়াল আনিয়ে তাদেরকে বাধা দিয়েছে এবং তালগাছ কেটে নিয়েছে। উপরন্তু বাধা দিতে গেলে ছিরুর লাঠিয়াল বাহিনী দেবনাথ ঘোষ এবং গ্রামের প্রবীণ মোড়ল দ্বারকা চৌধুরীর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস ছাত্রনেতা শীতলকে ছিরুর গ্রামে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল। সে গ্রামের লোকদের প্রতিবাদী করে তুলছে বলে তার মনে হলে সেই শীতলকেও সে গ্রামছাড়া করেছে। অনিরুদ্ধকে তার বাড়ির গাছের চারা কাটার অভিযোগে জেলে পাঠিয়েছে। অনিরুদ্ধের দু'মাসের জেল হলে সে সেটাকে নিজের বিজয় মনে করেছে।

> শ্রীহরি ফোকলা-দাঁতে একগাল হাসিয়া বলিল- সুখবর! দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড![৩২৭]

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীহরির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর নেশা ভূপতি হবার নেশা। মহাজন হিসেবে সে গ্রামের প্রায় বেশিরভাগ জমিই বন্ধক রেখেছে। গরীব অসহায় দরিদ্র কৃষকরা বিভিন্ন সময় নানারকম সমস্যায় পড়ে ছিরুর কাছে জমি বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছে। এর কিছুটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কিছুটা শ্রীহরির নিজের সৃষ্টি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল না হওয়ায় অভাবে পড়ে জমি বন্ধক দিতে বাধ্য হয়েছে, আবার ছিরু পাল নিজেও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছে। ফলাফলে, সে সুদে টাকা ধার দিয়ে তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য করেছে। কিন্তু শেষাব্দি সে জমি তারা আর ছাড়িয়ে নিতে পারে নি। সুদের টাকা দিন দিন বেড়ে এমন হয়েছে যে জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

> এই গ্রামের মাঠে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রায় সব জমিই নাকি মহাজনদের কাছে আবদ্ধ। মাহাজনদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মহাজন শ্রীহরি।[৩২৮]

ছিরু পাল নিজ হাতে হরিজনদের ঘরে আগুন দিয়ে কৃত্রিম সমস্যা সৃষ্টি করে তাদেরকে আবার ধান, চাল, বাঁশ, খড় দিয়ে সাহায্য করেছে। এতে সরাসরি কোনো লাভ লক্ষ করা না গেলেও গভীর দৃষ্টিতে বোঝা যায়, এটার মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে তার প্রতি অনুগত রাখা। তাদের কাছে সে যে সম্মান হারিয়েছিল তাকে পুনরুদ্ধার করা। যেন তারা তার সকল কথায় বাধ্য হয়ে সমর্থন দেয়। অর্থাৎ করুণা বিলিয়ে জনসমর্থন আদায় করা। কারণ গ্রামের মাতুব্বর হতে হলে প্রয়োজন বৃহত্তর জনসমর্থন। সেটা সে করতে সমর্থ হয়েছে। এবং সেটাই তার সবচেয়ে বড় সাফল্য যেটা সে বহুবছর ধরে আশা করে এসেছিল। যারা এক সময় তাকে ছিরু পাল বলতো তারাই শেষ পর্যন্ত তাকে শ্রীহরি ঘোষ বা ঘোষ বাবু বলে সম্বোধন করেছে। সেটাই তার সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা ছিল। বাউরি-বায়েনদের গরু মাঠে নামলে তাদের গরুগুলোকে আটকিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে সে কি না করতে পারে এবং তার কাছে এসে যেন কান্নাকাটি করতে বাধ্য হয়।

> তাহার ইচ্ছা ছিল, গরুগুলোকে আটক করিয়া তাহার বাড়িতেই রাখিবে, বাউরি-বায়েনদের দল আসিয়া কান্নাকাটি করিলে তাহাদের অন্যায়টা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবে।[৩২৯]

সামাজিকভাবে একটা প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে, পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। শ্রীহরি ধন-সম্পদ পাপে অর্জিত হলেও তা প্রায়শ্চিত্তে শেষ হবে কিনা সেটা জানা যায় না। ঔপন্যাসিক সে ব্যাখ্যা কিংবা সীমানায় পোঁছান নি। কিন্তু একটা সূত্র রেখে দিয়েছেন। সেটা হলো তার পরবর্তী বংশধর সম্পর্কে। তার সাতটি ছেলে সন্তান হলেও শেষ পর্যন্ত দুটো টিকে আছে। তারাও সম্পূর্ণ সুস্থ্য নয়। তার গোপন অপরাধের যেন সাক্ষ্য হয়েই তারা বেঁচে রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, পাপের ধন হয়তো প্রায়শ্চিত্তেই

Dhaka University Institutional Repository

যাবে। বাংলা প্রচলিত প্রবাদের সত্যতা নিশ্চিত করছে। ঔপন্যাসিক খুব সজাগ দৃষ্টিতে তাকে সামাজিকভাবে হেয় না করে তার বিচারিক ভার যেন সর্বময় কর্তার হাতে সমর্পণ করেছেন, হয়তো তৎকালীন সমাজের সেই সব মানুষদের কথা ভেবেই।

> ছিরু পালের সাতটি ছেলের মধ্যে দুইটি মাত্র অবশিষ্ট; তাও পৈত্রিক গুপ্ত ব্যাধির বিষে জর্জরিত-একটি রুগ্‌ণ, অপরটি প্রায় পঙ্গু![৩৩০]

'শ্রীহরিকেও লোকে খাতির করে না এমন নয়; কিন্তু শ্রীহরি তাহা পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করে না। সে অনুভব করে, লোকে ওই মৌখিক শ্রদ্ধার অন্তরালে তাহাকে ঈর্ষা করে, তাহার ধ্বংস কামনা করে। তাই এক এক সময় তাহার মনে হয়, সমস্ত গ্রামখানাতেই সে আগুন লাগাইয়া লোকগুলোকে সর্বহারা করিয়া দেয়।'[৩৩১] কিন্তু সে তা করে নি। বরং সে তার ট্রাটেজি পরিবর্তন করেছে। গ্রামের ছোট ছোট ক্ষতি করে সে দেখেছে, বাহ্যদৃষ্টিতে গ্রামের অনেক লোক তাকে সম্মান করলেও পেছনে তাকে অনেকে ঘৃণা করে। তাই সে চিন্তা করে দেখে এভাবে জনসাধারণের মন পাওয়া যাবে না বা যাচ্ছে না। এজন্য সে গ্রামের লোকদের কিছু কিছু প্রত্যাশা পূরণ করতে থাকে। যেমন: গ্রামে একটি পুকুর খনন করা, গৃহহীনদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা, বাড়ি-ঘরের ব্যবস্থা করা, গ্রামের একমাত্র চণ্ডীমণ্ডপটার মেঝে পাকা করে দেওয়া, বাড়িতে অন্নপূর্ণার পূজার সময় বাড়তি আয়োজন হিসেবে কৃষ্ণযাত্রার আয়োজন করা, গ্রামে মেলা বসানো, স্কুলঘর স্থাপন করা প্রভৃতি। উপন্যাস থেকে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি নিয়ে দেখা যাবে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কি কি ভালো কাজ করেছে-

১. গ্রামে সে হাট বসাইবে। স্নানের মজা-দিঘিটা কাটাইয়া দিবে। চণ্ডীমণ্ডপে পাকা দেউল তুলিবে, আটচালা ভাঙিয়া নাটমন্দির গড়িবে। এল-পি পাঠশালার বদলে এম-ই স্কুল করিবে; নাম হইবে 'শ্রীহরি এম-ই স্কুল'। ইউনিয়ন বোর্ড হইতে লোকাল বোর্ডে দাঁড়াইবে।[৩৩২]
২. শুষ্ককণ্ঠে শ্রীহরি বলিল, এক কাজ কর। যা খড় লাগে আমার বাড়ি থেকে নিয়ে আয়। বাঁশ কাঠ যা লাগে নিবি আমার কাছে; ঘর তুলে ফেল।- তারপর রাখালটার দিকে চাহিয়া বলিল-বাড়িতে গিয়ে চাল নিয়ে আয় দশ সের। কাল বরং ধান নিবি, বুঝলি![৩৩৩]
৩. আচ্ছা, পাঁচ সের করে চাল আজ ঘরপিছু আমি দেব। সে আর শোধ দিতে হবে না। আর ধানও অল্প অল্প দোব কাল।[৩৩৪]
৪. গ্রামের পথটা কাঁকর ঢালিয়া পাকা করিয়া দিবে। চণ্ডীমণ্ডপটার মাটির মেঝেটা বাঁধাইয়া দিবে; সিমেন্ট-করা মেঝের উপর খুদিয়া লিখিয়া দিবে-শ্রীচরণামিশ্রিত শ্রীহরি ঘোষ। যেমন কঙ্কনার চণ্ডীতলায় মার্বেলবাঁধানো-বারান্দার মেঝের উপর সাদা মার্বেলের মধ্যে কালো হরফে লেখা আছে কঙ্কনার বাবুদের নাম।[৩৩৫]
৫. নবান্নের দিন ছিরু পালের বাড়িতে অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে; সেই উপলক্ষে সন্ধ্যায় গ্রামের সমস্ত লোকই গিয়া জমায়েত হয় ছিরুর বাড়িতে। তামাক খায়, গালগল্প করে, খোল বাজাইয়া অল্প অল্প কীর্তন গানও হয়। এবার ছিরু নাকি বিশেষ সমারোহের আয়োজন করিয়াছে। রাত্রে লোকজন খাওয়াইবে এবং একদল কৃষ্ণযাত্রাও নাকি বায়না করিয়াছে।[৩৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ কেউ কাউকে দেয় না। সুযোগ সৃষ্টি করে নিতে হয়। শ্রীহরি সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছে। কারণ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটিই তাকে সমাজের উর্ধ্বতন ব্যক্তি হতে হবে। যেন তাকে সবাই সম্মান করে, সব বিপদ-আপদে যেন সবাই তার কাছেই ছুটে আসে। তাই 'বাপের মৃত্যুর পর শ্রীহরি যখন এই সম্পদ হাতে পাইল তখন তাহার মনে পড়িল মাতামহের স্বনামধন্য মনিব ত্রিপুরা সিংকে। মনে মনে তাহাকেই আদর্শ করিয়া সে জীবন-পথে যাত্রা শুরু করিল।'[৩৩৭] একটা পর্যায়ে, জমিদারের গোমস্তা দাশজী যখন তরুণ জমিদারের প্রতিনিধি হয়ে তাকে জমিদারির একটা অংশ অর্থাৎ তার গ্রামের জমিদারি কেনার জন্য প্রস্তাব দেয়। সেদিন ছিল ছিরু পালের সবচেয়ে আনন্দের দিন। কারণ ছোট থেকে যে স্বপ্ন দেখে বড় হয়েছে, যে স্বপ্নকে সে অন্তরে লালন করেছে তা পূরণ হবার সময় হয়েছে। ছোটবেলার সেই স্বপ্নপুরুষ ত্রিপুরা সিং, যাকে সে নিজের পথদার্শনিক, জীবনসঞ্চালক মনে করে সে বড় হয়েছে, তার মতো সে হতে চলেছে। যার জন্য সে এত অন্যায় করেছে, এত পাপ করেছে। সেই স্বপ্ন বাস্তব হয়ে তার চোখের সামনে ধরা দিয়েছে।

> শিবকালীপুরের জমিদারি? গ্রামের প্রতিটি লোক তাহার প্রজা হইবে! ঘোষ হইবে সকলের মনিব, বাবুমহাশয়, হুজুর! চকিতে তাহার অধীর মন নানা কল্পনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।[৩৩৮]

শ্রীহরি জীবনে যা চেয়েছে, তার সবটাই সে পেয়েছে। এর অন্যতম কারণ তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে একনিষ্ঠ থাকা। কঠোর পরিশ্রম এবং বুদ্ধিমত্তা। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তার কাজ ও কাজের ধরনগুলো নেতিবাচক হলেও সে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে সৎ থেকেছে। উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যে প্রচেষ্টা তা রীতিমতো অনুসরণীয়। নিজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং তদানুসারে চলা, প্রয়োজনের তাগিদে নিজেকে পরিবর্তন করা, পরিবেশ উপযোগী করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার গুণটি বেশ উল্লেখযোগ্য।

> কিন্তু ত্রিপুরা সিংয়ের মত দুর্দান্ত সাহস তাহার নাই। সে আমলও যে আর নাই! ত্রিপুরা সিং যে ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিতে পারিত, আমলের চাপে শ্রীহরিকে সে ইচ্ছা দমন করিতে হয়। তাছাড়া অন্যায় বোধ-কালের পার্থক্যে ত্রিপুরা সিংয়ের চেয়ে কিছু বেশি।[৩৩৯]

আইনকানুন সম্পর্কে শ্রীহরির ভালো ধারনা ছিল। যদিও সে পড়ালেখা বেশিদূর করে নি। কিন্তু যতটুকু পড়েছে তার পুরোপুরি সে ব্যবহার করেছে। তার কর্মকাণ্ডে সেটা প্রমাণিত হয়। সে নিজের ঘাড়ে কোনো প্রত্যক্ষ দোষ চাপাতে দেয় নি। যতবার তার ওপর দোষের দৃষ্টি পড়েছে, ততবারই সে সুকৌশলে মোকাবেলা করেছে। রাতের আঁধারে কার্যসিদ্ধি করেছে, দিনের আলোকে কোনো কাজ করে

Dhaka University Institutional Repository

নি। গাছ কেটে জমিদারের ওপর জনসাধারণের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। অনিরুদ্ধ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে থানায় টাকা দিয়ে সে অভিযোগকে প্রমাণিত হতে দেয় নি। সব সময় আইনকে নিজের হাতে রাখতে থানা থেকে শুরু করে সব আইনগত স্থানে নিজেকে মানানসই করে তুলেছে। কখনো টাকা দিয়ে, কখনো ভালো ব্যবহার দিয়ে, কখনো তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পানীয় গ্রহণ করে তাদের আপনার জন হিসেবে নিজেকে পরিগণিত করেছে। এক জন দূরদর্শী ব্যক্তি না হলে সেটা করা সম্ভব ছিল না। এমন কি, নিজের সম্মানকে বাড়ানোর জন্য জমিদারের কাগজে তার নিজের নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করে ভদ্রচিত করে তুলেছে। ছিরু পাল থেকে নাম পরিবর্তন করে হয়েছে শ্রীহরি ঘোষ। যাতে সবাই তাকে সে নামে এবং কিছুটা সম্মানের চোখে দেখে সে চেষ্টাতেও সে সফল হয়েছে।

> আজ্ঞে, উনি এখন ছিহরি ঘোষ মশাই গো! ঘোষ বলতে হুকুম হয়েছে। জমিদারের কাগজ-পত্তরে, তায় আদালতে পর্যন্ত ঘোষ করে লিয়েছেন পাল কাটিয়ে।[৩৪০]

গ্রামের লোকের ভাষায়-'ছিরে পাল এখন গণ্যমান্য লোক। একটা গুড়গুড়ি কিনেছে, চণ্ডীমণ্ডপে শতরঞ্জি পেতে একটা তাকিয়া নিয়ে বসে। বেটা আবার গোমস্তা হয়েছে, গাঁয়ের গোমস্তাগিরি নিয়েছে। একে মহাজন, তারপর হল গোমস্তা, সর্বনাশ করে দিলে গাঁয়ের।'[৩৪১] তারপরও সে নিজেকে গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পরিণত করেছে, গাঁয়ের বিচারিক প্রধান হিসেবে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে।

> সে আজ গণ্যমান্য ব্যক্তি, গ্রামের মাতব্বর।[৩৪২]

ছিরু পাল শুধু শ্রীহরিই হয় নি। নামের সঙ্গে সঙ্গে সে তার আচার-আচরণ, চলা-ফেরা ও অভ্যাসকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে। তার ধৈর্যশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। পোষাক পরিচ্ছদেও নিজের ভেতর পরিবর্তন এনেছে। সে পূর্বের মতো নগ্ন দেহের সাধারণ লোক থাকে নি। এক জন সম্ভ্রান্ত লোক যে সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে ছিরু পালও সেগুলো পরিধান করেছে। নামের সঙ্গে পোষাক, পোষাকের সঙ্গে ব্যবহার, ব্যবহারের সঙ্গে ধৈর্যগুণ সবকিছুতেই তার একটা আমুল পরিবর্তন সে ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামের প্রধান হিসেবে মানানসই সব কিছু সে করেছে। এমন কি আগে প্রকাশ্যে সে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতো সেটা সে বাদ দিয়েছে। পান করা বাদ সে দেয় নি, কিন্তু জনসম্মুখে সাধারণের সঙ্গে পান করা সে বাদ দিয়েছে। হরিজনপল্লীতে যাওয়াও সে বাদ দিয়েছে। দুর্গার জন্য যে দুর্বার আকর্ষণ তার ছিল সেটাও সে পরিত্যাগ করেছে। এক কথায় বলতে গেলে বহুগামিনী সস্তা নারীর সঙ্গ পরিত্যাগ করে সেখানেও সে পরিবর্তন এনেছে। প্রয়োজন হলে দূর গ্রামে রুচিশীল নারীর নিকট সে গমন করেছে। ফলে যেটা প্রকাশ্য ছিল সেটাও সে অপ্রকাশ্যে তালিকাভুক্ত করেছে।

> শ্রীহরি এখন সম্ভ্রান্ত লোক। লম্বা চওড়া পেশি-সবল যে জোয়ান চাষী নগ্নদেহে কোদাল হাতে ঘুরিয়া বেড়াইত, দুর্দান্ত বিক্রমে দৈহিক শক্তির আস্ফালন করিয়া ফিরিত, সামান্য কথায় শক্তি প্রয়োগ করিত, জোর করিয়া পরের সীমানা খানিকটা আত্মসাৎ করিয়া লইত, কর্কশ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিত- সে-ই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, তাহার অপেক্ষা বড় কেহ নাই, সেই ছিরু পালের সঙ্গে এই শ্রীহরির কোনো সাদৃশ্য নাই। শ্রীহরি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ! তাহার পায়ে ভাল চটি, গায়ে ফতুয়ার উপর চাদর; গম্ভীর সংযত মূর্তি, সে এখন গ্রামের গোমস্তা-মহাজন। বলিতে গেলে সে এখন গ্রামের অধিপতি।[৩৪৩]

শ্রীহরির অদ্ভূত কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এক. সে কোনো কিছু মুখে না বলেও সাধারণ মানুষদেরকে শাসন ও শ্বাসরুদ্ধ করে মানুষকে মেরে ফেলতে পারে, অর্থাৎ তার দৃষ্টিটা এমন যে মানুষ আতঙ্কে অর্ধমৃত হয়ে পড়ে। সেই দৃষ্টির কী মানে তা সবাই জানে। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তার এই দৃষ্টিকে 'শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা' বলে উল্লেখ করেছেন।

> শ্রীহরির নগ্ন-প্রকৃতির একটা অতি নিষ্ঠুর ভঙ্গি আছে; তখন সে চিৎকার করে না, নীরবে ভয়াবহ মুখভঙ্গি লইয়া অতি স্থিরভাবে মানুষকে বা পশুকে নির্যাতন করে-যেমন শীতের স্বচ্ছ জল মানুষের হাত-পা হিম করিয়া জমাইয়া দিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করে![৩৪৪]

ছিরুর অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য দুই. যখন ছিরু ধর্ম-কর্ম বা পূজা-পার্বণ নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন সে কারো কোনো ক্ষতি সাধন করে না। কারো সঙ্গে কোনো ঝামেলায় জড়াতে চায় না। তখন তাকে দেখে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না এই ছিরু সেই ছিরু, মানুষের ক্ষতি না করে কিংবা ক্ষতির পরিকল্পনা না করে যে ভাত মুখে দেয় না। সেই ছিরু কোনো ঝামেলা ছাড়া কয়েক দিন অনায়াসে কাটিয়ে দিবে তা কল্পনারও অতীত। কিন্তু সেটা একটা রহস্য। লেখকের ভাষায়-

> ছিরু অবিচলিত ধৈর্যে স্থির প্রশান্তভাবেই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া বাড়ির পথ ধরিল। ছিরুর চরিত্রের এই একটি বৈশিষ্ট্য। যখন সে ইষ্ট স্মরণ করে, কোনো ধর্ম-কর্ম বা পূজা-পার্বণে রত থাকে-সে তখন স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া যায়। সেদিন সে কাহারও সহিত বিরোধ করে না, কাহারও অনিষ্ট করে না, পৃথিবী ও বস্তুবিষয়ক সমস্ত কিছুর সহিত সংস্রবহীন হইয়া এক ভিন্ন জগতের মানুষ হইয়া ওঠে।[৩৪৫]

ছিরু পালের সর্বশেষ ও বড় জয় ছিল যতীনকে গ্রাম ছাড়া করা। যতীন ছিল গভর্নমেন্টের নজরবন্দী রাজনৈতিক আসামি। যার আগমনে পদ্ম ও অনিরুদ্ধ-এর সংসার রক্ষা হয়েছে। গ্রামের সাধারণ মানুষকে সংগ্রামী করে তুলেছে। প্রজারক্ষা কমিটি তৈরি এবং তাদের কর্তব্যবোধকে জাগ্রত করতে সে অবদান রেখেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সে আসতে পারে নি বলে, কিন্তু পরামর্শ ও বুদ্ধি দিয়ে সমাজের অবহেলিত,

Dhaka University Institutional Repository

বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষদেরকে সে একটা বড় নাড়া দিতে পেরেছে। তাদেরকে সংগ্রামমুখর, প্রতিবাদী ও জাগরুক করে তুলতে পেরেছে। তার পরামর্শে দেবু ঘোষকে প্রজারক্ষা কমিটির সভাপতি করা হয়েছিল। দেবু ঘোষ নিজেও জানতো না তার ভেতর নেতৃত্বদানের মতো সংগ্রামী মনোভাব অন্তরে অতি গোপনে লুক্কায়িত ছিল, সেটাকে জাগিয়ে তুলেছে যতীন। সেই যতীনের কারণে গ্রামের মানুষ ধীরে ধীরে প্রতিবাদী হয়ে উঠছিল, যা ছিরু পালের স্বপ্নবাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায়। তাই সে সেই অন্তরায়কে তুলে ফেলতে চেয়েছে এবং তা সফলভাবে করতে পেরেছে। যতীনের গ্রামছাড়ার মুহূর্তে শ্রীহরির ক্ষুদ্র নমস্কার যেন তার বিজয়কেতনকেই উড্ডীন করেছে।

> দেবু তাহার পাশে পাশে চলিল। পিছনে জগন, হরেন আরও অনেকে চলিল। পথে চণ্ডীমণ্ডপের ধারে শ্রীহরি দাঁড়াইয়াছিল। মজুরেরা চণ্ডীমণ্ডপের খড়ের চাল খুলিয়া দিতেছে, বর্ষার জলে ওটা ভাঙিয়া তারপর সে আরম্ভ করিবে–ঠাকুরবাড়ি। শ্রীহরি ঘোষও মৃদু হাসিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিল। [৩৪৬]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: *লালসালু* : মজিদ

লালসালু (১৯৪৮) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। 'বাংলাদেশের বাংলা উপন্যাস ধারার এক বিশিষ্ট সংযোজন। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় কমরেড পাবলিশার্স, ৬২ সুভাষ এ্যাভিনিউ, ঢাকা থেকে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। এর প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন জয়নুল আবেদিন। মূল্য ছিলো দু'টাকা দশ আনা। ১৯৬০ সালে করাচিস্থ পাকিস্তান লেখক সংঘ থেকে এর উর্দু অনুবাদ (Lal Shalu) প্রকাশিত হয়; অনুবাদক মি. কলিমুল্লাহ। ১৯৬১ সালে প্যারিসস্থ Editions du Seuid -প্রতিষ্ঠান থেকে এর ফরাসি অনুবাদ (L'Arbre Sansracines) প্রকাশিত হয়; অনুবাদক মিসেস অ্যান-মারি, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সহধর্মিণী। ১৯৬৭ সালে লন্ডনস্থ Chatto & Windus প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয় *লালসালু*'র ইংরেজি অনুবাদ (Tree Without Roots); অনুবাদক মি. কায়সার সাইদ। এর অল্প কিছু দিনের মধ্যে আরো কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় উপন্যাসটি অনূদিত হয়ে বিশ্বব্যাপী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।'[৩৪৭]

'*লালসালু* উপন্যাসে একটি বিশেষ বক্তব্য প্রকাশের জন্য লেখক যে মজিদ চরিত্রের উপর অধিক নির্ভর করেছেন, তার অন্তত দুটো দিক স্পষ্ট। এক, এখানে ধর্মীয় শোষণ ও ধর্মের নামে ভণ্ডামির স্বরূপ উন্মোচিত; দুই, অন্তঃশীল চেতনাপ্রবাহ ধারায় ব্যক্তি বিশেষের অস্তিত্ব সংকট, আত্মজিজ্ঞাসা ও বেঁচে থাকার তীব্র বাসনা-সংগ্রাম প্রকাশিত।'[৩৪৮] *লালসালু* উপন্যাসে মজিদ চরিত্র এবং তার আচরণ ও কথোপকথন বিচার করতে গেলে সেখানে দেখা যায়, হাজার বছরের পুরনো ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল

Dhaka University Institutional Repository

উৎপীড়ন ও আক্রমণের চিত্র। সামন্তবাদী সংস্কৃতির একটি রূপের নাম সাম্প্রদায়িকতা, যার সঙ্গে রয়েছে ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা। সেখানে সামন্ত আর পুরোহিত একে অপরের পরিপূরক। স্কুল-কলেজের শিক্ষায় যারা সংগ্রামী তারাই সেখানে ধর্মান্ধ হিসেবে পরিচিত। আজকের দিনের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর অস্তিত্বের মূল যেন সেখান থেকেই। মজিদের যোগ্য অনুগামী এবং বিশ্বস্ত প্রতিনিধিরা যেন হাজার বছরের পুরনো নিষ্ঠুর ব্রাহ্মবাদেরই অন্ধ ভক্ত ও অনুসারী। *লালসালু*তে যেন তারই পরিচয় মিলে ঔপন্যাসিকের বক্তব্যে-

> শস্যের চেয়ে টুপি বেশী, ধর্মের আগাছা বেশী।[৩৪৯]

অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারের শুরু হয় সে সমস্ত সত্তার হাতে নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে যাদের হীনতা রয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধ যাদের জ্ঞানের বাইরে অথবা অবোধগম্য তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান যেরূপ তাতে উক্ত চিন্তাগুলো করবার মত অবকাশ নেই। আছে শুধু ধর্মীয় ভীতি, যার সৃষ্টি অজানালোকে বসবাস এবং পশ্চাৎপদতা। বয়স তো একটা বড় হাতিয়ার মজিদের মতো স্বার্থান্বেষী মানুষদের জন্য।

> অনেকের অনেক সময় গলায় ঝোলানো তাবিজের থোকাটা ছাড়া দেহে বিন্দুমাত্র বস্ত্র থাকে না শেষ পর্যন্ত। তারা অবশ্য বয়সে ছোকরা। বয়স হলে এরা আর কিছু না হোক শক্ত করে গিরেটা দিতে শেখে।[৩৫০]

মজিদ তৎকালীন সমাজের সার্থক প্রতিনিধি। সামান্য আরবি শিক্ষাকে পুঁজি করে হয়ে উঠেছে পুঁজিবাদী, সাম্যবাদী সমাজের প্রতীকী চরিত্র। অল্পবিস্তর আরবি শিক্ষাকে সঙ্গে করে সে জন্মভূমিকে ত্যাগ করে খাদ্য ও কাজের সন্ধানে দেশান্তরী হয়ে এসেছে মহব্বতনগরে। ফসল না হওয়া এবং জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় কাজের সুযোগ সুবিধা কম থাকায় সে পাড়ি জমায় ভিন দেশে। হাজির হয় শস্যসমৃদ্ধ মহব্বতনগরে। সহজ সরল মহব্বতনগের মানুষকে সে জানায় একটি স্বপ্ন তাকে তার জন্মভূমি ত্যাগ করে তাদের গ্রামে আসতে বাধ্য করেছে ধর্ম রক্ষার জন্য, পীরকে রক্ষা করার জন্য-

> সে-স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে। মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ সে দুর্গম অঞ্চলে মজিদ যে বাড়ি গড়ে তুলেছিল তা নিমেষের মধ্যে ভেঙে ছুটে চলে এসেছে।[৩৫১]

শস্যহীন জনবহুল অঞ্চলে জন্ম মজিদের। বাংলা ও ইংরেজি বর্ণ যার শূন্য, উপরন্তু ধর্মান্ধ। এ ধরনের এক জন মানুষ যখন অন্নের খোঁজে আসে মহব্বতনগরে তখন পায় তারি গ্রামের মত আরেটি গ্রাম। তার জন্মস্থানের মানুষগুলোর মত মহব্বতনগরের মানুষগুলো জন্মান্ধ। নেই সেখানে কোনোরূপ

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার আলো। পার্থক্য শুধু এ গ্রামে রয়েছে অন্নবস্ত্রের সুন্দর ব্যবস্থা, শস্য-শ্যামল ভূমি। সুতরাং তার বিভ্রান্তকরণ এবং স্থায়ী আসন গড়ার শুরুটা হলো এমন-

> মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?[৩৫২]

আনকোড়া এক জন খেলোয়াড় দক্ষ খেলোয়াড়ের সামনে পড়লে দক্ষ খেলোয়াড়ের যেমন আনন্দ হয়, তেমনি হয়েছে মজিদের ক্ষেত্রে। এ খেলার নাম ধর্মের নামে খেলা, ধর্মকে নিয়ে খেলা। সমাজের ধর্মভীরু মানুষের আরো ভীরু বানানোর খেলা। এই শ্রেণির খেলোয়াড়ের লাভ দ্বিমুখী। নিজেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নায়ক লর্ড কর্নওয়ালিশ ভাবা এবং বাকীদেরকে প্রজা ভাবা। এক দিকে অস্ত্রের ভয় অন্যদিকে পাপের ভয়। এ খেলায় ঝুঁকি আছে কিন্তু লাভও ভালো। রাজকন্যার সঙ্গে রাজ্যও পাওয়া যেতে পারে। ঝুঁকিপূর্ণ খেলায় খেলোয়াড় যত দক্ষই হোক না কেন দুঃচিন্তাও তার থাকে। মজিদেরও ছিল।

> গ্রামের প্রান্তে সেই জঙ্গলের মধ্যে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বুকে ঝোলানো তামার দাঁত-খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর খোঁচাতে খোঁচাতে মজিদ সেদিন সে-কথা স্পষ্ট বুঝেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বুঝেছিল যে, দুনিয়ায় স্বচ্ছলভাবে দু'বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে-খেলা খেলতে যাচ্ছে সে-খেলা সাংঘাতিক মনে সন্দেহ ছিল, ভয়ও ছিল।[৩৫৩]

বনের হিংস্র প্রাণীরও বাঁচবার অধিকার আছে। মজিদেরও তাহলে আছে। তারও ইচ্ছে হতে পারে দু'বেলা দুমুঠো ভাত খেয়ে ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখের সংসার করতে। তারও স্বপ্ন থাকতে পারে সমাজের সবাই তাকে সম্মানের চোখে দেখবে। এতটুকু ঠিক আছে। কিন্তু তার জন্য মজিদ যে পন্থা অবলম্বন করেছে তা ঠিক নয়। সে মহব্বতনগরে শস্যভূমি দেখেছে, সেখানে কাজের সুযোগ আছে সেটা সে দেখেছে। সে ইচ্ছা করলে কায়িক পরিশ্রমের চেষ্টা করতে পারতো। হয়তো সে জন্য অনেক শ্রম ও সাধনার প্রয়োজন ছিল কিন্তু সে বিনা পরিশ্রমে সম্পদশীল হবার স্বপ্ন দেখেছে। তবে আত্মদ্বন্দ্ব কিন্তু তার পিছু ছাড়ে নি। বার বার সে আত্মদ্বন্দ্বে ভুগেছে।

> তথাকথিত মাজারের পানে চেয়ে ক্বচিৎ কখনো সে যে ভাবিত না তা নয়। কিন্তু তারও যে বাঁচবার অধিকার আছে সেই কথাটাই সে সাময়িক চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে।[৩৫৪]

প্রথমে অভাব পরে স্বভাব। মজিদের প্রথমে অভাব ছিল। অভাব ছিল দুমুঠো ভাতের, এক টুকরো জমির। এই দুটো যখন পেল তখন প্রয়োজন হলো শয্যাসঙ্গীর। এল রহীমা। কিন্তু সেখানে উন্মোচিত

Dhaka University Institutional Repository

হলো মজিদের অন্য একটি রূপ। নারীর প্রতি তার বিশেষ দুর্বলতা। বিধবা নারীর উত্তাল যৌবন তাকে মুগ্ধ করেছে। সে জন্যই বিধবা হওয়ার পরেও তাকেই বিয়ে করে মজিদ। এই রূপ রূপান্বেষী, লোলুপতা প্রকাশ না পেলে হয়তো তাকে হিরো হিসেবে আখ্যা দেওয়া যেত। কিন্তু সে তা দেখাতে পারে নি।

> অনেকদিন থেকে আলি-ঝালি একটি চওড়া বেওয়া মেয়েকে দেখছিল। দেহে যৌবন যেন ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে, বিশাল তার রূপ। দূর থেকে আবছা আবছা তার প্রশস্ত দেহ দেখে শীর্ণ মজিদ জ্বলে উঠেছিল।[৩৫৫]

মজিদ কেবল রহীমাকে বিয়ে করে ক্ষান্ত হয় নি। রহীমার উত্তাল যৌবনে মত্ত থাকে নি। তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে তার সাধ্যের সর্বোচ্চ সীমানা পর্যন্ত। সেখানে সে ধর্মীয় লেবাসের অন্তরালে তার দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দিয়েছে অভিব্যাপক করে। ঐক্যদেশিক হলে সেটা মানা যেত কিন্তু অভিব্যাপক দৃষ্টি ভঙ্গির কারণে পাঠক মহলে হয়ে উঠেছে নেতিবাচক। রহীমার যৌবন তার কাছে শুধু দেখবার বিষয় হয়ে থেকেছে, রাত্রে তার উন্মত্ততার নিদর্শন মেলেনি।

> পুকুরে গোসল করে সিক্ত বসনে উঠানে দাঁড়িয়ে রহীমা যখন চুল ঝাড়ে তখনো চেয়ে দেখে মজিদ। বিছানার পাশে যে-দেহটির তাল পায় না, সে-দেহটিই এখন সিক্ত কাপড় ভেদ করে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে ওঠে।[৩৫৬]

মজিদের কামনার স্বীকার হয় হাসুনির মা। মজিদ তাকে 'বিটি' (মেয়ে) বলে ডাকলেও তার চোখ বলে অন্য কথা। তার শরীরের অনাবৃত অংশবিশেষ তাকে ভিন্ন মানদণ্ডে দাঁড় করায়। হাসুনির মার খোলা গলা-কাঁধের কিছু অংশ এবং বাহু তাকে আকৃষ্ট করে। তার শরীরে বান ডাকে। চোখগুলো থেকে থেকে চিক্‌চিক করে উঠে লেলিহান শিখার মতো। যেন সেখানে পড়লে কারো নিস্তার নেই। তার হাত থেকে এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে নেয়, এর বেশি কিছু পায় না বলে তার বুক থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে, আহা!। রাতে তার ঘুমেও বিঘ্ন ঘটতে দেখা যায়। কারণ-

> যে-আলো সাদা মসৃণ উঠানটাকে শুভ্রতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গলা-কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে। দেখে মজিদের চোখ এখানে অন্ধকারে চকচক করে।[৩৫৭]

মজিদ নজর দিয়েছে আরো অনেকের দিকে। এমন কি প্রভাবশালী খালেক ব্যাপারীর স্ত্রীর দিকে। কবি জীবনানন্দ দাশের 'একখানি হাত'-এ মত খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনা বিবির শুভ্র পায়ের দিকে। ঔপন্যাসিক মজিদের সেই দৃষ্টিকে সাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেই সাপের উদ্দেশ্য ছিল আমেনা

Dhaka University Institutional Repository

বিবির সৌন্দর্যে ছোবল মারা। অনেকগুলো বছর সংসার করেছে খালেক ব্যাপারী যে আমেনার সঙ্গে তাকে তালাক দিতে পরামর্শ দেওয়ার মূলেও ছিল মজিদের কুদৃষ্টি, কুদৃষ্টির চাহিদা পুরোপুরি সফল না করতে পারায় প্রতিশোধ স্পৃহা।

১. আমেনা বিবির চোখ মজিদের ভালো লাগে না, কিন্তু পাল্কি থেকে নামবার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিল, সে-পা-ই তার মনে সাপকে জাগিয়ে তুলেছে। সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্যে।[৩৫৮]

২. আবছা আলোয় দেখ কালো পাড়ের নিচে একটি সাদা কোমল পা। সে-পা দ্বিতীয়বার দেখল না বলে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন আফসোস বোধ করে মজিদ।[৩৫৯]

৩. না। কওন যায় না। থেমে আবার বলে, তয় একটা কথা আমার কওন দরকার। তানারে তালাক দেন।[৩৬০]

রহীমার পর কন্যাতুল্য হাসুনির মা, তার পরে খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনাবিবি এবং সর্বশেষ মজিদের কামনার স্বীকার হয় ছোট্ট জমিলা। যে বিয়ের পূর্বে চোরাপথে মজিদকে দেখে ভেবেছিল শ্বশুর, বিয়ের পর রহীমাকে দেখে ভাবে শাশুড়ি। 'জমিলাকে পেয়ে রহীমার মনে শাশুড়ির ভাব জাগে। স্নেহ-কোমল চোখে সারাক্ষণ তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে, আর যত দেখে তত ভালো লাগে তাকে। আদর-যত্ন করে খাওয়ায় দাওয়ায় তাকে। ওদিকে মজিদ ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলায়, আর তার আশপাশ আতরের গন্ধে ভুর ভুর করে।'[৩৬১] মজিদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কামনার ফল রহীমার ভয় ও আতঙ্ক, হাসুনির মার তার বাবার হাতে উত্তম-মধ্যম, খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনাবিবির কপালে তালাক প্রাপ্তি এবং সর্বোপরি জমিলার এক প্রকার নির্বাসন। জমিলাকে বিয়ে করার পূর্বে সে নরম সুরে রহীমাকে কৌশলে দ্বিতীয় বিয়ের কথা বলে। এই একটি বিষয়ে সকল শ্রেণির সব মেয়েলোকের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অদ্ভুতভাবে কাজ করে। ফলে, রহীমাও বুঝতে পারে কি বলতে চায় মজিদ।

> বিবি, আমাগো বাড়িটা বড়ই নিরানন্দ। তোমার একটা সাথী আনুম? সাথী মানে সতীন। সে-কথা বুঝতে রহীমার এক মুহূর্ত দেরী হয় না এবং পলকের মধ্যে কথাটা বোঝে বলেই সহসা কোনো উত্তর আসে না মুখে।[৩৬২]

'মধ্যযুগ থেকে সামন্ত ও পুরোহিত-এই দুই শক্তি ও সংগঠন একে অপরের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একত্রিত হয়ে মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সাত চল্লিশোত্তর বাংলাদেশেও এই শোষক শ্রেণির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক লক্ষ করার মতো। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে এরা একে অপরের পরিপূরক ও সহযোগী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাসহ সমাজের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বসে।'[৩৬৩] *লালসালু* উপন্যাসটিতে দুই প্রতাপশালী ঐক্য শক্তির প্রকাশ ঘটে মজিদ চরিত্রে। মূল ভূমিকায় থাকে মজিদ। খালেক ব্যাপারী তার পড়া মন্ত্রে গাঁয়ে কর্তৃত্ব করে। চালকের আসনে মজিদ মিঞা। ক্রমাগত বাড়তে থাকে তাদের ক্ষমতার পরিধি ও প্রতিপত্তি। যাকে প্রয়োজন শাস্তির আওতায় আনতে পারে, আবার কাউকে মুক্তিও দিতে পারে। 'পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে' (বাংলা প্রবাদ) খাওয়ার মতো মজিদ রাজ্যরাজ না হয়েও রাজ্য তার। উদাহরণস্বরূপ হাসুনির বাবার বিচার উল্লেখযোগ্য। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদের জেরে তাকে আসামির কাঠগোড়ায় দাঁড়াতে হয়। যদিও সে জানে না তার অপরাধ কী, মজিদ কিংবা খালেক ব্যাপরীর এই বিচারের অধিকার আছে কিনা। বোঝে কিন্তু প্রতিবাদ করবার মতো শক্তি তার নেই। তাই চুপ থেকে মেনে নিতে হয় অপরাধ। তবে বিচারের ক্ষেত্রে মজিদ অত্যন্ত চতুরতা দেখায়। সে নিজে বিচারের দায় কাঁধে নেয় না, কিন্তু রায় সেই দেয়, বলায় গাঁয়ের মাতবর খালেক ব্যাপারীর মুখ দিয়ে।

> একা বিচার করতে ভরসা হয় না যেন মজিদের। ঢেঙা বুড়ো লোকটা শয়তানের খাম্বা, অন্তরে তার কুটিলতা আর অবিশ্বাস। খালেক ব্যাপারীও এসেছে। মাতব্বর না হলে শাস্তি বিধান হয় না, বিচার চলে না। রায় অবশ্য মজিদই দেয়, কিন্তু সেটা মাতব্বরের মুখ দিয়ে বেরুলে ভালো দেখায়।[৩৬৪]

হাসুনি তার মা-বাবার কাহিনি বিশ্বাস করে বলেছিল রহীমাকে। কিন্তু রহীমা জানায় মজিদকে। ফলে জানে গ্রামের সবাই। সালিশে সবার কাছে অপমানিত হয়। কিন্তু মাথা উঁচু করে বলতে পারে না কিছুই। অনেক চিন্তা করে সে বোঝে কথাটা কীভাবে, কার মাধ্যমে ফাঁস হয়েছে। বুঝতে পারে তার মেয়ে হাসুনির মার রহীমার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আছে, সে বাড়িতে তার যাতায়াত আছে। তাই সে চড়াও হয় মেয়ের ওপর। বেধড়ক মার দেয় মেয়েকে। ছেলেরা বাড়িতে না থাকায় বাধা দেবার কেউ ছিল না। এ অপরাধে তাকে আবার দাঁড়াতে হয় আসামির কাঠগোড়ায়। শাস্তি হয় মেয়ের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এই শাস্তি তার মনে ভয়াবহভাবে আঘাত দেয়। সে জানে এই ক্ষমা চাওয়ার মানে সবার কাছে ক্ষমা চাওয়া, বিশেষ করে মজিদের কাছে ক্ষমা চাওয়া। কেননা মজিদ খালেক ব্যাপারীর মাধ্যমে এই রায় প্রদান করেছে। অন্য কেউ না বুঝলেও সে বোঝে। ঔপন্যাসিক খুব সচেতন ভাবে এই চরিত্রটিকে নীবর প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

> মজিদ নিজে তার মাফ দাবি করে না। কারণ মেয়ের কাছে চাইলে তারই কাছে চাওয়া হবে। নির্দেশ তো তারই। তারই হুকুম তালিম করবে সে।[৩৬৫]

ই.বি টেলর নিদ্রা, স্বপ্ন, সম্মোহন, মৃত্যু প্রভৃতির অভিজ্ঞতা থেকেই ধর্ম বিশ্বাসের উদ্ভব।[৩৬৬] বলে মনে করেন। আদিকালে মানুষ ধর্ম বিশ্বাসের মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত শক্তির সঙ্গে যোগসূত্র রাখার চেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। তাদের জীবনে তার প্রভাব ছিল অপরিসীম। মানুষ প্রকৃতির তাণ্ডবের কাছে ছিল অসহায়। পাশাপাশি এই প্রকৃতিকে জয় করার জন্যও তাদের ছিল অদম্য আকাঙ্ক্ষা। এ কারণেই সমাজবিজ্ঞানীরা নানা যুক্তি দিয়ে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে, ধর্মের উদ্ভবের নানা কারণের মধ্যে ভীতি অন্যতম। প্রাচীনকাল থেকে শুরু হলেও মধ্যযুগে তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। সমগ্র মধ্যযুগে আধিপত্য ও একচ্ছত্র মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে শাসকশ্রেণি। মধ্যযুগের গীতিকবিতায় তার প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রকৃতিকে জয় করার পথে নানা রকম বাধাবিপত্তির প্রাচীর গড়ে তোলে শাসক শ্রেণি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন তাদের ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞান, শিল্পসংস্কৃতির পক্ষে তাই তারা বাধা হয়ে দাঁড়ায়-প্রভুত্ব, প্রতিপত্তির দরজা বন্ধ হয়ে যাবে বলে। মধ্যযুগের শিল্পসাহিত্য তাই দেখা যায় ধর্মকেন্দ্রিক। প্রাচীন *চর্যাপদ* তাই ছিল বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীত। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণবপদাবলি, মঙ্গলকাব্য*, মর্সিয়া সাহিত্য এমনকি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানেও এর পদচারণা লক্ষ করা যায়। প্রভুর মনোরঞ্জন ছিল সেখানে মুখ্য। প্রজারা নানা রকম অপরাধ করবে এবং রাজা তাদের শাস্তি প্রদান করবে, ক্ষমার জন্য শর্ত প্রয়োগ করবে সেটাই ছিল রীতি। বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ সেখানে ছিল না। অন্যায় হোক বা নাই হোক। অনেকটা যেন স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে বিপথ থেকে সুপথে আনার দায়িত্বও যেন তাদের। *লালসালু*-র মজিদও সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ। সবাই তাকে ধর্মীয় রাজা হিসেবেই যেন গ্রহণ করেছে।

> বতোর দিন ঘুরে আসে, আবার পেরিয়ে যায়। মজিদের জমিজোত বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সম্মানও বাড়ে। গাঁয়ের মাতব্বর ওর কথা ছাড়া কথা কয় না; সলা-পরামর্শ, আদেশ-উপদেশ, নছিহতের জন্যে তার কাছেই আসে, চিরনীরব সালু-কাপড়ে আবৃত মাজারের মুখপাত্র হিসেবে তার কথা সাগ্রহে শোনে, খর পড়লে তারই কাছে ছুটে আসে খতম পড়াবার জন্যে।[৩৬৭]

সাধারণ অশিক্ষিত ও ঈশ্বরভীতি পোষণকারী সরলমনা জনগণের ভেতর পরকালের চেতনা ও পুনর্জনমের লোভ জাগিয়ে মজিদের মতো মানুষরা তাদের শাসন ও শোষণের পথকে সুগম এবং দীর্ঘস্থায় করেছে। গীতার মোক্ষযোগের ৫৮ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে-

> সচ্চিত্তঃ সর্বদুর্বানি মৎপ্রশাদাৎ তরিষ্যতি।
> অথ চেৎ ত্বমহঙ্কার শ্রোষ্যসি বিনংক্ষ্যসি।[৩৬৮]

লালসালু উপন্যাসের সময়কার মানব মনে প্রকৃতির বিচিত্রলীলা সম্পর্কে একটা অজানা ভীতি ছিল, সেটাকেই কাজে লাগিয়েছে মজিদ মিঞা। সেই সময়ে বহিঃবিশ্বেও ঘটেছে নানা রকম নৃশংস ঘটনা।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক বিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিকিৎসকে ধর্মান্ধ পুরোহিত-কাঠ্মোল্লাদের রোষানলের স্বীকার হতে হয়েছিল। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী গ্যালিলিও, বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক ওমর খৈয়াম, চিকিৎসাশাস্ত্রের অগ্রদূত ইবনে-সিনা প্রমুখ তাদের মধ্যে অন্যতম। বাইবেলে বর্ণিত সূর্যকে নয়, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘুরছে এই কথা অস্বীকার করায় বিজ্ঞানী ব্রুনোকে ধর্মের বিরোধিতার অভিযোগে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে আরো অনেক এ ধরনের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এ সমস্ত ঘটনার মূলে ছিল অজ্ঞতা এবং মজিদের মত ধর্মীয় প্রতিনিধিদের নিজ স্বার্থ হাসিল, শাসন ও শোষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ মাত্র। অর্থাৎ তাদের শাসনের মূল হাতিয়ার ছিল ভীতি সৃষ্টি। মজিদ সেটা করতে পেরেছে।

১. মজিদ নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখে, রহীমার চোখে ভয়।[৩৬৯]

২. সে খোদাকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায়।[৩৭০]

৩. রহীমার শরীরে তো এদেরই রক্ত, আর তার মতোই এরা তাগড়া, গাঁট্টাগোট্টা ও প্রশস্ত। রহীমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না?[৩৭১]

সৃষ্টিকর্তার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য এবং তদানুরূপ কাজ করাই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য। যারা ধর্মীয় গুরু তারা তো সবসময় আত্মসমর্পণ করেই থাকেন। সুতরাং তারা মহাত্মা। তাদের সংস্পর্শে থাকলেই পরকালে মুক্তি। কোনো অপরাধ করলেও সমস্যা নেই, তার কাছে সকল সমস্যার সমাধান আছে। স্রষ্টার উদ্দেশ্যে তার কাছে গিয়ে কিছু উৎসর্গ করো, তওবা কর তাহলেই হলো। বাকিটা তিনি দেখে নেবেন। এ যেন স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের জন্য তাকে উৎকোচ প্রদান। মোদাচ্ছেদ পীর সেই ধর্মীয় গুরু। তার খাদেম (খাস্‌দাস) মজিদ। মোদাচ্ছের পীর নেই কিন্তু তার খাদেম আছে। সুতরাং তাকে দাও, তার কাছে যাও। সেখানে সকল সমস্যার সমাধান মেলে। কারণ তার কাছে শক্তি আসে উপর থেকে।

> মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালু-কাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল।[৩৭২]

মজিদের মতো খালেক ব্যাপারীও আছে। তার শক্তি লাঠিবল। তার শক্তি সে গ্রামের মোড়ল। কিন্তু তাকেও ধন্যা দিতে হয় মজিদের কাছে। কারণ তার সমস্ত পাপের মুক্তি তো পীর। মজিদ তাকে আশ্রয় করে স্বর্ণলতার মতো। তাকে না হলে কার্যোদ্ধার করতে গেলে লোকের চোখে পড়তে পারে। হাজার হোক সে ভিনদেশী। তাই বটবৃক্ষকে আশ্রয় করতে পারলে সে নিশ্চিন্ত। পুরো গ্রামকে মোহাবিষ্ট করে রাখতে হলে খালেক ব্যাপারীকে তার চাই। সগর্বে চলতে হলে, কাউকে পীরের সাহায্য ছাড়া শায়েস্তা করতে হলে ব্যাপারীকে প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

> মহব্বতনগর গ্রামে সে শক্তির শিকড় গেড়েছে। আর সে-শক্তি শাখাপ্রশাখা মেলে সারা গ্রামকে আচ্ছন্ন করে লোকদের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছে সবলভাবে। প্রতিপত্তিশালী খালেক ব্যাপারী আছে বটে, কিন্তু তার শক্তিতে আর মজিদের শক্তিতে প্রভেদ আছে।[৩৭৩]

মজিদ সমাজের শুধু ধর্মীয় নেতা এবং ধর্মীয় উপদেশ দিয়েই সে ক্ষান্ত থাকে নি। সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায়ও তাকে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। সমাজের কে নামায পড়ে না, কে দাঁড়ি রাখে না, কে খৎনা করায় নি। চিকিৎসাশাস্ত্রেও সে যেন সর্বরোগ উপশমকারী। সাত ছেলের বাবা দুদু মিঞাকে ধমক দিয়ে নির্দেশ দেয় মক্তবে গিয়ে কলমা শিখতে। কয়েকটি বড় ছেলে ধরে জানতে চায় তাদের খৎনা হয়েছে কিনা। হয়েছে বলে রক্ষা হয় নি। বিশেষ সূত্রে সে জানতে পাবে একটা বড় ছেলের খৎনা হয়নি। তাই ছেলেটির কথায় বিশ্বাস না করে অনেকগুলো ছেলের সামনে তার লুঙ্গি তুলে সত্যতা যাচাই করে। তাকে শুক্রবার খৎনা করার নির্দেশ দেয়। দাঁড়ি গোঁফ গজাতে থাকা ছেলেটাও মজিদের এ আচরণে ভয়ে কাঁপতে থাকে । শুক্রবার খৎনা করার সময় জানা যায় তার বাবারও খৎনা হয় নি। সুতরাং বাবা ছেলেকে এক সঙ্গেই খৎনা করানো হয়।

> আমার বাপেরও খৎনা অয় নাই-তানারে আগে দেন।[৩৭৪]

সমাজে যেন আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়া না লাগে সে চেষ্টা করেছে মজিদ মিয়া। তাহলে তো তার প্রভুত্ব থাকবে না। থাকবে না আজন্মলালিত স্বপ্নের অস্তিত্ব। তাই যখন মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস গ্রামে স্কুল করতে চায় তখন বাধা হয়ে দাঁড়ায় মজিদ। খালেক ব্যাপারীকে সঙ্গে নিয়ে বাধা সৃষ্টি করে। খালেক ব্যাপারীরও সেখানে স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। কারণ গ্রামের এক মাত্র মক্তবটি তার । গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে সেটা তো ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে। 'সমাজের মূল হলো একটি লোক-যার আঙুলের ইশারায় গ্রাম ওঠে বসে, সাদাকে কালো বলে, আসমানকে জমিন বলে। সে হলো মজিদ। জীবনস্রোতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারী কী করে এমন খাপে খাপে মিলে গেছে যে, অজান্তে অনিচ্ছায়ও দু'জনের পক্ষে উলটো পথে যাওয় সম্ভব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেকজনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।'[৩৭৫] তাই সমাজের অন্য মানুষদের মধ্যে যেন বিতর্কের কোনো অবকাশ না থাকে সেকারণে মজিদ স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছে।

> কিন্তু একটা বড় জরুরি ব্যাপারে আপনাদের আমি আইজ ডাকছি। খোদার ফজলে বড় সমৃদ্ধশালী গেরাম আমাগো। বড় আফসোসের কথা, এমন গেরামে একটা পাকা মসজিদ নাই। খোদার মর্জি এইবার আমাগো ভালো ধান-চাইল হইছে, সকলের হাতেই দুই-চারটা পয়সা হইছে। এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না।[৩৭৬]

Dhaka University Institutional Repository

স্কুল প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে মসজিদকে দাঁড় করানো হয়েছে। সরাসরি বাধা দিলে আক্কাস শিক্ষিত ছেলে সে হয়তো মানতো না অথবা গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের যদি বুঝিয়ে বিপথগামী করে তাহলে বিপত্তি ঘটবে। আক্কাস তার পক্ষে নানা যুক্তি প্রস্তুত করে রেখেছিল প্রতিবাদ করবার জন্য। কিন্তু মজিদ সেখানে অত্যন্ত ধূর্ততার পরিচয় দিয়েছে। স্কুলের বিষয়ে কথা না বলে আক্কাসসহ সর্বসাধারণকে ভিন্ন স্রোতধারার নিমগ্ন ও নিমজ্জিত করেছে। ফলে, সাপও মরলো লাঠিও ভাঙেনি।

১. ঠাস্ করে চড় মারার ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করলে, -তোমার দাড়ি কই মিঞা।[৩৭৭]

২. মজিদ আসার আগে গ্রামের পথে-ঘাটে দাড়িবিহীন মানুষ নাকি দেখা যেত। কিন্তু সে দিন গেছে।[৩৭৮]

মজিদ রহস্যময়। তার রহস্য সাধারণ জনগণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এই রহস্যই তার পুঁজি। সাধারণ মানুষ হয়েও অসাধারণ হয়ে থাকার আকুল চেষ্টা। না হলে মানুষ তাকে ভক্তি করবে কেন, তার কথাই বা শুনবে কেন। তাই তাকে হতে হয় রহস্যময়। রহস্য সৃষ্টি করার জন্য সে ব্যবহার করে মিথ্যা, অভিনয়, কণ্ঠস্বর, হেয়ালি প্রভৃতি। সুললিত কণ্ঠস্বর আর উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে সে সৃষ্টি করে এক একটি মায়াজাল, উপস্থিত বুদ্ধি ব্যবহার করে সামাল দেয় বিরূপ পরিবেশ, বৈরী আবহাওয়া। সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলাও তার একটি বড় গুণ। এই গুণের কারণে তার কথায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে অনেক অযৌক্তিক ও অন্যায় দাবি মেয়ে নেয় গ্রামের মানুষ। উপস্থিত বুদ্ধি ও মিথ্যার জোরে কাটিয়ে দিতে পারে যেকোনো সংকটাপূর্ণ মুহূর্ত।

১. বাইরে মাজার যেমন রহস্যময় তাদের কাছে, মজিদও তেমনি রহস্যময়। মজিদ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।[৩৭৯]

২. তা দিয়া তোমার দরকার কী? কিন্তু এই কথা জাইনো-কোনো কথা আমার অজানা থাকে না।[৩৮০]

৩. ঋজু ভঙ্গিতে বসে গম্ভীর কণ্ঠে ঢালাসুরে মজিদ বলে চলে। কথায় তার মধু। স্তব্ধ ঘরে তার কণ্ঠে একটা সুর তোলে, যে সুরে মোহিত হয়ে পড়ে শ্রোতারা।[৩৮১]

৪. সময়ে-অসময়ে মিথ্যে কথা না বললে নয়। বলে, ডাক্তার সাহেব তার মুরিদ কি-না তাই সেখানে মজিদের বড় খাতির।[৩৮২]

গ্রামে আধিপত্য গড়ে তোলাই মজিদের মূল লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সে আধিপত্যে প্রথম ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহেরের বৃদ্ধ প্রতিবাদী বাবা। তাকে বার বার জনসাধারণের সামনে অপমানিত করায় সে গ্রাম ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। স্বল্প শিক্ষিত শহুরে চাকরিজীবী ছেলে আক্কাস গ্রামে স্কুল খুলতে চাইলে মজিদ ভীত হয়ে পড়ে এবং আত্মরক্ষায় আক্কাসকে জন সম্মুখে বিভিন্ন কায়দায় অপমানিত করে স্কুলের স্থলে পাকা মসজিদ নির্মাণে গ্রামবাসীকে উদ্যোগী করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

পার্শ্ববর্তী আওয়ালপুর গ্রামে বহুদিনের পরিচিত বৃদ্ধ জনপ্রিয় পীরের আগমনে শঙ্কিত হয়ে উঠে মজিদ। তার আধিপত্য বিনাশের ভয়ে গ্রামের মানুষকে সুকৌশলে উক্ত পীরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে সে গ্রাম ফিরে আসে করে বিজয়ের গৌরব মাথায় নিয়ে।

> কিন্তু জাঁদরেল পীররা যখন আশেপাশে এসে আস্তানা গাড়েন তখন কিন্তু মজিদ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে একে জড়িয়ে পড়বে।[৩৮৩]

মজিদ থাকতে তাকে উপেক্ষা করে সন্তান লাভের জন্য উক্ত পীরের পানি পড়া আনার জন্য খালেক ব্যাপারী লোক পাঠালে মজিদ সেটা জানতে পারে এবং প্রতিশোধ প্রবণ হয়ে খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনাকে তালাক দেওয়ায়। বলে স্ত্রীর পেটে বেড়ি পড়েছে। এর জন্য পানি পড়া দিয়ে কাজ হবে না। এ জন্য প্রয়োজন ভোররাতে খাবার না খেয়ে রোযা রাখা। সন্ধ্যার পর মোদাচ্ছের পীরের মাজারে এসে সাত পাক দিতে হবে। সাত পাক যদি সম্পন্ন করতে না পারে তা হলে বুঝতে হবে তার কোনো চারিত্রিক সমস্যা আছে। সারাদিনের না খাওয়ায় এবং মাজারের চারপাশে চক্কর দিতে গিয়ে আমেনাবিবি বেহুঁশ হয়ে পড়ে। এটাই চাচ্ছিল মজিদ। তাই ঘটে। পরিণামে তাকে তালাকের ব্যবস্থা করে তাকে শায়েস্তা করায়।

> ব্যাপারীর অজ্ঞতা দেখেই তার হাসি পায়। তারপর বলে,- পেটে বেড়ি পড়ে বইলাই তো স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয় না। কারো পড়ে সাত প্যাঁচ, কারো চোদ্দ। একুশ বেড়িও দেখেছি একটা। তয় সাতের উপরে হইলে ছাড়ান যায় না। আমার তো চোদ্দ প্যাঁচ।[৩৮৪]

সকল বাধাবিপত্তি মজিদ তার সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে মোকাবেলা করেছে। ব্যর্থতা বলতে একটি জায়গায়, নিজের স্ত্রীদের কাছে। সেখানে সে চেষ্টার ঘাটতি রাখে নি। কিন্তু পারে নি। যখন জমিলাকে বিয়ে করে আনে তখন মজিদ তার চোখে দেখেছিল ভয়। রহীমার চেয়ে বেশি ভয়। কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত টেকে নি। কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝে যায় সে কত মস্ত বড় ভুল করেছে। এই ভুল শুধরানোর জন্য সে তার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। কিন্তু সুবিধা করতে পারে নি।

> মজিদ যেন সত্যি বজ্রাহত হয়েছে জমিলা এমন একটা কাজ করেছে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি কেউ করতে পারে। যার কথায় গ্রাম ওঠে বসে যার নির্দেশে খালেক ব্যাপারীর মতো প্রতিপত্তিশালী লোকও বউ তালাক দেয় দ্বিরুক্তি মাত্র না করে, যার পা খোদাভাবমত্ত লোকেরা চুম্বনে চুম্বনে সিক্ত করে দেয়, তার প্রতি এমন চরম অশ্রদ্ধা কেউ দেখাতে পারে সে-কথা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।[৩৮৫]

Dhaka University Institutional Repository

মহব্বতনগরে তার দীর্ঘ সময়ের রাজত্বকালে কেউ তার হুকুম অমান্য করার সাহস পায় নি। যারা করেছিল তাদেরকে সে প্রতিহত করেছে। কিন্তু সেই দিনের ঘরে আনা ছোট্ট একটি মেয়ে তার হুকুম অমান্য করবে এটা তার কল্পনাতেও ছিল না। তার আদেশ অমান্য করে নির্বিকারে বসে থেকেছে ওঠে নি, কখনো শুয়ে থেকেছে ওঠে নি। মিথ্যে গল্প বলে ভয় দেখানো চেষ্টা করেছে, তাতেও সে ভয় পায় নি। মিথ্যে গল্প বলে সে নিজেই নিজের কাছে অপরাধী বনে গেছে এবং সে জন্য সঙ্গে সঙ্গে সে তওবাও পড়েছে। হঠাৎ করে বাহির বাড়িতে সে চলে এসেছে। বাধ্য হয়ে পুনরায় মিথ্যে বলতে হয়েছে। সেজন্য সে আর তওবা পড়ে নি। বলেছে, নতুন বউয়ের বাবার বাড়ির কাজের লোক।

১. গল্পটা মিথ্যে এবং সজ্ঞানে ও সুস্থদেহে মিথ্যে কথা বলেছে বলে মনে মনে তওবা কাটে মজিদ।[৩৮৬]

২. পাগলী ঝিটা। একটু থেমে আবার বলে, নোতুন বিবির বাড়ির লোক, তার সঙ্গে আসছে।[৩৮৭]

এখানেই শেষ নয়। তার কথা না শোনা তো একটা বড় অপরাধ মজিদের চোখে। কিন্তু তার চেয়েও যে বড় আকস্মিকতা অপেক্ষা করে ছিল সেটা মজিদ বুঝতে পারে নি। মজিদ জমিলাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মোদাচ্ছের পীরের মাজারের দিকে। জোর করে হাত দিয়ে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে চাইলে সে প্রথমে ছাড়াবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু যখন পারে নি তখন যেটা করেছে, তার জন্য মজিদ মোটেও প্রস্তুত ছিল না। কল্পনাও কখনো করতে পারে নি, তাকে এভাবে অপমানিত হতে হবে। কিন্তু এ রকম দুঃসাহস কেউ দেখাবে সেটা তার কল্পনাতেই আসে নি। জমিলা যা করলো-

> অনেক চেষ্টা করেও হাত যখন ছাড়াতে পারল না তখন সে অদ্ভুদ একটা কাণ্ড করে বসল। হঠাৎ সিধে হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করল।[৩৮৮]

জমিলার তুতু নিক্ষেপ যেন তার এত দিনের গড়ে তোলার স্বপ্নের হঠাৎ ধস। তার ব্যক্তিত্বের চরম অপমান। চিরকাল সে সবার সম্মান পেয়ে এসেছে। তার সেবা করতে পারাকে জনগণ সৌভাগ্য মনে করেছে। তার কথায় মোহমুগ্ধ হয়েছে। তার গলার সুরে সবার চিত্তনিবিষ্ট হয়েছে। সব জায়গায়, সব সভায় তার জয় জয়কার হয়েছে। জিকির করতে করতে মজিদ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এটা তার নিয়মিত হয়েই থাকে। তবু লোকেরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

> কেউ হাওয়া করে, কেউ বুকফাটা আওয়াজে হা-হা কোরে আফসোস করে, কেউ-বা এ-হট্টগোলের সুযোগে মজিদের অবশ পদযুগল মত্ত চুম্বনে চুম্বনে সিক্ত কোরে দেয়।[৩৮৯]

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমা স্ত্রী রহীমা, যে ছিল মজিদের আশ্রয়স্থল, ভরসার জায়গা। যার চোখে মজিদ দেখতো এক রাশ ভয়, সম্মান; সেই রহীমাও জমিলার বিষয়ে তার সিদ্ধান্তকে মেনে নেয় নি। সেও প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। এখানেও শেষ পর্যন্ত তার আত্মগর্ববোধকে জয় করতে পারে নি। মমতার কাছে, সন্তানহীন মায়ের করুণ আরতির কাছে পরাজয় বরণ করেছে। স্নেহের কাছে, ভালোবাসার কাছে হেরে গেছে মজিদের দম্ভ, বিচ্যুত হয়েছে স্বামীত্বের একছত্র ক্ষমতা থেকে। জমিলার জন্য পরামর্শ চেয়েছে রহীমাবিবির কাছে। যা তার স্বভাবসুলভ নয়। যে ফসলের জন্য এক দিন মজিদ মহব্বতনগরে এসেছিল যা রহীমাবিবি নীরবে এত বছর ধরে সামলিয়ে এসেছে, সেই ফসল আজ শিলাবৃষ্টিতে নষ্ট হলেও ভ্রূক্ষেপ নেই তার। সেটা পরাভূত হয়েছে নিকষ স্নেহের লালিত্যের কাছে। হয়ে উঠেছে বিদ্রোহী। বলেছে-

> ধান দিয়া কী হইবো, মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।[৩৯০]

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিশ শতকের শেষার্ধে (মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব) রচিত উপন্যাসে 'খল' নর ও নারী চরিত্র

শহীদুল্লাহ কায়সার: *সারেং বৌ:* গুজাবুড়ি

আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লা অর্থাৎ শহীদুল্লা কায়সার বাংলা কথাসাহিত্যের এক প্রগতিশীল লেখক। খ্যতনামা কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর পরিচিতি। 'তালতমাল-বনরাজিনীলা সাগরমেখলা বঙ্গভূমির পূর্ব উপকূলে যাদের জন্ম, পৃথিবী যাদের দেশ, সমুদ্রে যাদের অন্ন, তরঙ্গ যাদের সবকিছু, তবু সাগরের ডাকে মন ওদের আনচান, কেননা ধমনীতে ওদের সেই নির্ভীক আদি-নাবিকের রক্ত।'[৩৯১] দেশময় আজ সৃষ্টি এবং দ্বৈতচিত্র শিল্পী সাহিত্যিকের মহৎ উপাদান, এ কোলাহল সৃষ্টিরই আহ্বান। আমি তাই আশাবাদীদের একজন।'[৩৯২] জনজীবনের আলেখ্য রূপায়ণে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'বাঙালি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংগ্রামী চেতনা তাঁর উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত।'[৩৯৩] 'খল' চরিত্র মাত্রই 'খল' মানুষ নয়। খলতা কেবল তাদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। কখনো কখনো এই বৈশিষ্ট্য প্রকট আকারে প্রকাশ পেয়ে থাকে। তখন তাকে খল মানুষ রূপে চিহ্নিত করা হয়। শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১) তাঁর বিখ্যাত সামাজিক উপন্যাস *সারেং বৌ* (১৯৬২) তে সে রকম এক খল চরিত্রের আগমন সমাবেশ ঘটিয়েছেন। চরিত্রটি 'সগির মা'। বয়সের চাপে আর ব্যারামের দাপটে লাঠি ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে চলে বলে গ্রামের সবার কাছে সে গুজাবুড়ি হিসেবে পরিচিত। লেখক গুজাবুড়ির প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

> গুজাবুড়ি কুটনী বুড়ি, গুজাবুড়ি পূর্বপাড়ার লুন্দর শেখের কুটনী মাগী, গুজাবুড়ি নবিতুনের নয়ন জ্বালা, গায়ের জ্বালা, গলার বিষ।[৩৯৪]

খল-নারী গুজাবুড়ি। কুলকন্যার কুল ভেঙেছে, তেজ ভেঙেছে, মান ভেঙেছে। সতী বৌ-এর সতীত্ব নষ্ট করেছে। লুন্দর শেখের দাসী বান্দীর খেতমতের লোভ, দু-পদ জেয়ড়, বড় জোড় কিছু নগদ আয়ের লোভ দেখিয়ে অনেক নারীকে গাঙের পানির মত ভাসিয়ে দিয়েছে। গুজাবুড়ি বেওয়া। স্বামী ও পুত্রহীনা। এই অলক্ষ্মীর জীবন নিয়ে অনেক টিটকিরি টিপ্পনী খেয়ে গা-সওয়া স্বভাব সগির মায়ের। কাজেই সতী ও কুল কন্যার ঘর ভাঙতে সে সর্বদা হাস্যমুখী, মুখের কোনো গুমর নেই। অনেক পাপ, অনেক কুটনামীর রেখা জাগা লোল-চর্ম মুখখানা সবসময় লাস্যময়ী।

> জোয়ানকির ঢলটা গেলে পর পস্তাবি। পস্তানই সার হবে তখন-পাঁচ বৌ লুন্দর শেখের। পাঁচ বৌর মাঝে তুই হবি রাণী, রাণীর সুখে থাকবি।[৩৯৫]

Dhaka University Institutional Repository

গুজাবুড়ি গ্রামের মোড়ল-সদৃশ লুন্দর শেখের পোষা প্রাণী। তার কাজ হল লুন্দর শেখের মন ও মান বজায় রাখা। গ্রামের সুন্দরী এবং কেজো মেয়েদের বাগে এনে লালসা চরিতার্থ করা। এর পেছনে আরেকটা নিগূঢ় কারণ তাদেরকে গায়ে-গতরে খাটিয়ে নিজের বিত্ত-বৈভবকে বাড়িয়ে তোলা। পাঁচ পাঁচটি বৌকে ভাত-কাপড় দিয়ে পোষার এর চেয়ে বড় কারণ আর কি হতে পারে। তাইতো ষষ্ঠ বৌ হিসেবে লক্ষ্য নবিতুন, কেননা নবিতুন ঢলঢল উত্তাল যৌবনের আধার উপরন্তু কাজে পটু ও দক্ষ। প্রতিবেশী শরবতি পর্যন্ত লুন্দর শেখের লক্ষ্যের সুপ্রশংসা করে।

> সাধে কি চোখ লেগেছে লুন্দর শেখের। নবিতুন বুয়া, তোর গায়ে যে জোয়ানকির ঢল। আমারই চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।[৩৯৬]

নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে কেউ ব্যর্থ হয়ে পিছু হটে, অনেকে ভিন্নপথে অগ্রসর হয়। গুজাবুড়ি পিছু হটবার মানুষ না। সোজা পথ ধরে এগুতে না পেরে তাই ভিন্নপথে স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে। নবিতুনের অভাবটাকে কাজে লাগাতে চাল, ডাল নিয়ে হাজির হয় তার বাড়ি। তার কথা এবং কণ্ঠস্বরে মনে হয় সত্যিই যেন সে নবিতুনের জন্য দুঃখ-ভারাক্রান্ত। লেখকের ভাষায়-

> শুনলাম দুপুরে নাকি পাক চড়েনি তোর। শুনে অবধি পেরেসান আর বেচাইন মনটা- আহারে বাছারা আমার কত কষ্টই না হচ্ছে ওদের। অন্ধকারে দেখা গেল না কিন্তু স্বরের কম্পনে বুঝিয়ে দেয় গুজাবুড়ি নবিতুনের দুঃখে ছলছল ওর চোখ![৩৯৭]

কাজ উদ্ধারের যখন সকল পথ বন্ধ হয়ে যায় তখনও শেষ চেষ্টা বলে একটা সম্ভাবনার কথা থেকে যায়। গুজাবুড়ি যখন একের পর এক চালে ব্যর্থ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ার অতিক্রম, তখন শেষ হিসেবে নতুন আরেকটা পথ অবলম্বন করে ব্যাভিচারের দূতী গুজাবুড়ি।

> নিকা সাদিতে যদি তোর এতই আপত্তি হবে দরজাটা না হয় মাঝে মাঝে খোলা রাখিস? এ তো আর কেউ জানছেও না, কেউ দেখছেও না। তোরও মান থাকছে, ঘর থাকছে, খসম থাকছে।[৩৯৮]

সকল শ্রেণি বা পেশাজীবীর মানুষরা নির্দিষ্ট কিছু আদর্শ মেনে চলে। ব্যবসায়ীর কখনও নিজ ব্যবসার গুমর অন্যের নিকট ফাঁস করে না। এমন কি চোর-ডাকাতরাও সব জায়গায় অথবা সবার ওপর চড়াও হয় না। তাদেরও আদর্শ আছে। যেমন: 'চোরের সমাজে দুটো পাপের ক্ষমা নেই- মিথ্যাচার আর নারীঘটিত অপরাধ।'[৩৯৯] খল-নারী আখ্যায়িত গুজাবুড়ির পেশা হল নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে অপরের

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে প্রতারণা বা ছলনা করা। তাহলেও তার এই পেশার বড় আদর্শ ধীরতা, বিশ্বস্ততা এবং গোপনীয়তা। এ ধরনের আদর্শ হতে কখনও সে বিচ্যুত হয় নি।

> সগির মা গুজাবুড়ি, অনেক অপবাদ তার। অনেক কলংকের দূতী, অনেক কলংকিনীর দোসর গুজাবুড়ি। কুল কন্যার কুল ভেঙ্গেছে, গৃহ বধূর গৃহ ভেঙ্গেছে, সতী নারীর সতীত্বের পণ্য সওদা করেছে গোপন হাটে.... সবই স্বীকার করে গুজাবুড়ি। কিন্তু হাটে কখনও হাড়ি ভাঙ্গে নি। কারও মান ভাংগেনি গুজাবুড়ি। ঘোর দুশমনও এমন অপবাদ দিতে পারে না গুজাবুড়িকে।[৪০০]

পূর্বে বলা হয়েছে, খলতা মানব মনের একটি বৈশিষ্ট্য মাত্র, তবে পরিবেশ পরিস্থিতিতে তা কখনো কখনো ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। যে বিষয়ের উৎকর্ষ আছে তার অপকর্ষও থাকতে পারে। গুজাবুড়ির সব ধরনে খলচাল ব্যর্থ হওয়ায় লুন্দর শেখের আশ্রয়-চ্যুত হয়েছে। ফলে তার খলতা, কপটতাও ধীরে ধীরে নিস্তেজ, ম্রিয়মান হয়ে গেছে। 'গুজাবুড়ি' চরিত্রটি যথা বিশ্লেষণে বোঝা যায় তার কপটাচার, অন্যের স্বার্থের দূতী হবার বড় কারণ তার নিরাশ্রয়তা, অবলম্বনহীনতা এবং দীনতা।

> ও নবিতুন দেনা একমুঠ পান্থা। শুধু করুণ নয়, কী এক আর্তনাদের ব্যাকুলতা গুজাবুড়ির যাঞ্জায়। স্তব্ধ নবিতুন এবার চমকে যায়। উপোসের সাথে নবিতুনের পরিচয়। সেই পরিচয় দিয়েও শুনতে পায় গুজাবুড়ির স্বরে ক্ষুধার ডাক।[৪০১]

গুজাবুড়ি একটা টাইপ (type) চরিত্র, যারা কিনা সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত, নিপীড়িত এবং নির্যাতিত। গুজাবুড়ির ক্ষেত্রে দেখা যায় সে সহায় সম্বলহীন একজন অসহায় মানুষ। দুনিয়ায় তার আপন বলে কেউ নেই, যে তার জীবিকা নির্বাহে সহায়ক হবে, ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে। উপরন্তু শারীরিক সক্ষমতাও যথেষ্ট নেই, যা দিয়ে সে নিজের ব্যয় ভার বহন করবে। তাই অনেকটা উপায়হীন হয়েই সে দ্বারস্থ হয়েছে লুন্দর শেখের মত লোভী ও স্বার্থন্বেষী মানুষের কাছে। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে-'অভাবে স্বভাব নষ্ট।' অভাবের স্বাভাবিক নিয়মে বেঁচে থাকার তাগিদেই তাকে বিভিন্ন সময় নানারকম ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সমাজের চোখে সে হয়ে উঠেছে খল। কিন্তু যে সমাজ তাকে খল বলে আখ্যায়িত করেছে, সে সমাজ কিন্তু তার দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের ব্যবস্থা করে নি। তারপরও শেষ পর্যন্ত নিজ কৃতকর্মের জন্য সে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে নবিতুনের কাছে মাথা নুইয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থনির্দেশনা

১. আনিসুজ্জামান (সম্পাদক), *আলালের ঘরের দুলাল* (ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৯), পৃ. ভূমিকা।

২. আনিসুজ্জামান (সম্পাদক), *আলালের ঘরের দুলাল*, তদেব, পৃ. ৪১।

৩. তদেব, পৃ. ৩৫

৪. তদেব, পৃ. ৭৫

৫. তদেব, পৃ. ৮৬

৬. তদেব।

৭. তদেব, পৃ. ৩

৮. তদেব, পৃ. ৩৬

৯. তদেব, প. ৪৬

১০. তদেব, পৃ. ৪৭

১১. তদেব, পৃ. ৪৯

১২. তদেব, পৃ. ১২

১৩. তদেব, পৃ. ৬২

১৪. তদেব, পৃ. ৬৩

১৫. তদেব, পৃ. ৬৫

১৬. তদেব, পৃ. ৭৯

১৭. তদেব, পৃ. ৮৩

১৮. তদেব, পৃ. ৮৬

১৯. তদেব, পৃ. ৬৮

২০. তদেব, পৃ. ৯০

২১. তদেব, পৃ. ৯৩

২২. তদেব, পৃ. ৯৪

২৩. তদেব, পৃ. ১০১

২৪. তদেব, পৃ. ১০২

২৫. তদেব, পৃ. ১০৬

২৬. তদেব, পৃ. ১০৩

২৭. তদেব, পৃ. ১০৮

২৮. তদেব, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

২৯. তদেব।

৩০. তদেব, পৃ. ১৩৪।

৩১. সেলিনা হোসেন ও নুলু ইসলাম (সম্পাদক) *বাংলা একাডেমি চরিতাবিধান*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ২৪৩।

৩২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (কলিকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৩৭২), পৃ. ৬৪।

৩৩. ক্ষেত্র গুপ্ত, *বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: শিল্পরীতি* (কলিকাতা: গ্রন্থনিলয় প্রকাশন, ১৯৭৪), পৃ. ০১।

৩৪. সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পাদক) *বাংলা একাডেমি চরিতাবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩।

৩৫. ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ০২।

৩৬. সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩।

৩৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৩৮. ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪।

৩৯. তদেব, পৃ. ০২।

৪০. সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩।

৪১. মণি বাগচী, *বঙ্কিমচন্দ্র* (কলিকাতা: জিজ্ঞাসা: প্রকাশন, ১৯৬৫), পৃ. ১৩০।

৪২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

৪৩. ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৪৪. শ্রী প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *সমাজ দর্শন* (কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৮০), পৃ. ৪১।

৪৫. স্যামুয়েলকোনিগ, ড.এ.কে.নাজমুল করিম (সম্পাদক) অনুবাদ- রঙ্গলাল সেন; *(মূল: sociology-an Introduction to the science of society), সমাজবিজ্ঞান* (ঢাকা: প্যারামাউন্ট বুক করপোরেশন, ১৯৭৩), পৃ. ২২১।

৪৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

৪৭. সফিউদ্দিন আহমদ (সম্পাদক) *বঙ্কিম রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড* (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০০৮), পৃ. ১১৮।

৪৮. সফিউদ্দিন আহমদ (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২২।

৪৯. স্যামুয়েল কোনিগ, পৃ. ২১৬।

৫০. *বঙ্কিম রচনাসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

৫১. তদেব, পৃ. ১২৭।

৫২. বিজিতকুমার দত্ত, *বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস* (কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ প্রকাশন, ১৯৬২), পৃ.৭০

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. *বঙ্কিম রচনাসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

৫৪. ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

৫৫. *বঙ্কিম রচনাসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

৫৬. তদেব, পৃ. ১৫৭।

৫৭. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

৫৮. *বঙ্কিম রচনাসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

৫৯. তদেব, পৃ. ১২৫।

৬০. তদেব, পৃ. ১৩১।

৬১. *সাহিত্য-সাধক চরিতমালা*, *পঞ্চম খণ্ড* (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭০) পৃ. ১৩।

৬২. তদেব, পৃ. ০৯।

৬৩. তদেব।

৬৪. তদেব, পৃ. ১০।

৬৫. তদেব, পৃ. ১৩।

৬৬. তদেব, পৃ. ১৩।

৬৭. তদেব, পৃ. ১৫।

৬৮. তদেব, পৃ. ১৬।

৬৯. তদেব।

৭০. তদেব, পৃ. ১৮।

৭১. তদেব, পৃ. ২২।

৭২. তদেব।

৭৩. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *স্বর্ণলতা* (ঢাকা: প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ১৩৬৭), পৃ. ০৪।

৭৪. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৫।

৭৫. টম বটোমোর (অনু: হিমাচল চক্রবর্তী), *সমাজবিদ্যা তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা* (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৫), পৃ. ৩৪২।

৭৬. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১।

৭৭. তদেব, পৃ. ১২।

৭৮. তদেব, পৃ. ৩২।

৭৯. তদেব, পৃ. ৩৪।

৮০. তদেব, পৃ. ৩৯।

৮১. তদেব, পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

৮২. তদেব, পৃ. ১০০।

৮৩. তদেব, পৃ. ২৩২।

৮৪. মণি বাগচী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪।

৮৫. তদেব, পৃ. ২২৬।

৮৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৮৭. বিজিতকুমার দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

৮৮. তদেব, পৃ. ৬৪।

৮৯. ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪।

৯০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

৯১. তদেব, পৃ. ১০৪-০৫।

৯২. তদেব, পৃ. ১০৭।

৯৩. বঙ্কিম রচনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭।

৯৪. তদেব, পৃ. ৪৭১।

৯৫. ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৯৬. বিজিতকুমার দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৯৭. বঙ্কিম রচনাসমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫।

৯৮. তদেব, পৃ. ৪৭৭।

৯৯. ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

১০০. বঙ্কিম রচনাসমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭।

১০১. তদেব, পৃ. ৫০৯।

১০২. তদেব, পৃ. ৫১০।

১০৩. তদেব।

১০৪. তদেব, পৃ. ৫২৪।

১০৫. তদেব, পৃ. ৫৩৩।

১০৬. শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য (সম্পাদক), *মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী* (কলিকাতা: ১৯৮৪), পৃ. ভূমিকা।

১০৭. তদেব।

১০৮. আবুল আহসান চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন: সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ৯৪।

১০৯. তদেব, পৃ. ৭২।

১১০. হাসান আজিজুল হক, *কথা সাহিত্যের কথকতা*, *মানুষের মুখ: বিষাদ-সিন্ধু (প্রবন্ধ)* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪), পৃ. ৪৮।

১১১. আবুল আহসান চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন: সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

১১২. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

১১৩. তদেব, পৃ. ১২৬।

১১৪. তদেব, পৃ. ১০৯।

১১৫. তদেব, পৃ. ১১০।

১১৬. অমৃতলাল বালা ও ঊষারাণী সরকার, *মশাররফ মানস ও বিষাদ-সিন্ধু* (রাজশাহী: শোভা, ২০০৪), পৃ. ১২৮।

১১৭. সেলিম জাহাঙ্গীর, *মীর মশাররফ হোসেন: জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ১৪৪।

১১৮. কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশ্বতবঙ্গ* (ঢাকা: ব্রাক প্রকাশনী, ১৯৮৩), পৃ. ১২৫।

১১৯. মুনির চৌধুরী, *মীর মানস* (ঢাকা: ১৩৭৫), পৃ. ৫০।

১২০. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

১২১. তদেব।

১২২. বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), *বিষাদ-সিন্ধু* (ঢাকা: অবসর প্রকাশ, ২০০৬), পৃ. ৪৪।

১২৩. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

১২৪. তদেব, পৃ. ১১৭।

১২৫. আবদুল আজীজ আল্-আমান (সম্পাদক), *বিষাদ-সিন্ধু*, (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭১), পৃ. ২৫।

১২৬. তদেব, পৃ. ৪৪।

১২৭. তদেব।

১২৮. তদেব, পৃ. ৪৮।

১২৯. তদেব, পৃ. ৪৯।

১৩০. তদেব, পৃ. ৫০।

১৩১. তদেব, পৃ. ৫৯।

১৩২. তদেব, পৃ. ৬১।

১৩৩. তদেব, পৃ. ৬৩।

১৩৪. তদেব, পৃ. ৬৮।

১৩৫. তদেব, পৃ. ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৬. তদেব, পৃ. ৬৯।

১৩৭. তদেব, পৃ. ৭৪।

১৩৮. কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশতবঙ্গ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ১২৫।

১৩৯. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৭৫৭-১৯১৮)(ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৬৪),পৃ. ২০৬।

১৪০. হাসান আজিজুল হক (সম্পাদক), *বিষাদ-সিন্ধু* (ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৫), প. ভূমিকা।

১৪১. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪), পৃ. ৪২৪।

১৪২. অমৃতলাল বালা ও ঊষা রাণী (সম্পাদক), *বিষাদ-সিন্ধু* (ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ভূমিকা।

১৪৩. মুনীর চৌধুরী, *মীর মানস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৫), পৃ. ৪৫-৪৭।

১৪৪. হাসান আজিজুল হক (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১৪৫. তদেব।

১৪৬. তদেব, প. ১৮।

১৪৭. তদেব, পৃ. ১৯।

১৪৮. তদেব, পৃ. ২০।

১৪৯. তদেব, পৃ. ২৪।

১৫০. তদেব, প. ২৩।

১৫১. তদেব, পৃ. ৩২।

১৫২. তদেব, পৃ. ২৫।

১৫৩. তদেব, পৃ. ভূমিকা।

১৫৪. তদেব, পৃ. ৪১।

১৫৫. তদেব, পৃ. ৩৯।

১৫৬. তদেব, পৃ. ৪১।

১৫৭. তদেব, পৃ. ৪০।

১৫৮. তদেব, পৃ. ৩৪।

১৫৯. তদেব, পৃ. ৪৫।

১৬০. তদেব, প. ৪২।

১৬১. তদেব, প. ৮২।

১৬২. তদেব, পৃ. ২১৮।

১৬৩. তদেব, পৃ. ৫০।

১৬৪. তদেব, প. ৫১।

১৬৫. তদেব, পৃ. ১৬০।

১৬৬. তদেব, পৃ. ২০০।

১৬৭. তদেব, পৃ. ১৪৭।

১৬৮. তদেব, পৃ. ১৬৭।

১৬৯. তদেব, পৃ. ২১৪।

১৭০. তদেব, পৃ. ২০৩।

১৭১. তদেব, পৃ. ১১২।

১৭২. তদেব, পৃ. ২২৬।

১৭৩. তদেব।

১৭৪. তদেব, পৃ. ২০২।

১৭৫. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১১), পৃ. ১৩।

১৭৬. ড. সৌমিত্র শেখর (সম্পাদক), *শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক উপন্যাস* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ভূমিকা।

১৭৭. ড. সৌমিত্র শেখর (সম্পাদক), তদেব, পৃ. ভূমিকা।

১৭৮. তদেব, পৃ. ১৫।

১৭৯. তদেব, পৃ. ৩৯।

১৮০. তদেব।

১৮১. তদেব, পৃ. ৪১।

১৮২. তদেব, পৃ. ৪২।

১৮৩. তদেব।

১৮৪. তদেব, পৃ. ৪১।

১৮৫. তদেব, পৃ. ৪৩।

১৮৬. তদেব, পৃ. ৫২।

১৮৭. তদেব, পৃ. ৪০।

১৮৮. তদেব, পৃ. ৪৬।

১৮৯. তদেব, পৃ. ৫২।

১৯০. তদেব, পৃ. ৫৩।

১৯১. তদেব, পৃ. ৬৪।

১৯২. তদেব, পৃ. ৮৬।

১৯৩. তদেব, পৃ. ৬৭।

১৯৪. তদেব, পৃ. ৬৮।

১৯৫. তদেব, পৃ. ৪৭।

১৯৬. তদেব, পৃ. ৭৪।

১৯৭. তদেব, পৃ. ১২৫।

১৯৮. তদেব, পৃ. ৮২।

১৯৯. তদেব, পৃ. ৮৯।

২০০. তদেব, পৃ. ৯৭।

২০১. তদেব, পৃ. ৯৯।

২০২. তদেব।

২০৩. তদেব, পৃ. ১১৮।

২০৪. তদেব, পৃ. ১৫৯।

২০৫. তদেব, পৃ. ৯১।

২০৬. তদেব, পৃ. ৮১।

২০৭. তদেব, পৃ. ১২২।

২০৮. তদেব, পৃঃ ৮৬।

২০৯. তদেব, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

২১০. তদেব, পৃ. ১২৫।

২১১. তদেব, পৃ. ১২৬।

২১২. তদেব।

২১৩. তদেব, পৃ. ১৪২।

২১৪. তদেব, পৃ. ১৭৮।

২১৫. তদেব, পৃ. ১৮৫।

২১৬. তদেব, পৃ. ১৯৫।

২১৭. তদেব, পৃ. ১২০।

২১৮. তদেব, পৃ. ২২১।

২১৯. মোহাম্মদ নজিবর রহমান, *আনোয়ারা* (ঢাকাঃ ওসমানিয়া বুক ডিপো, ১৩৬৬), পৃ. কৃতজ্ঞতা পত্র।

২২০. জুলফিকার মতিন, *মোহাম্মদ নজিবর রহমান* (ঢাকাঃ বাংলা একডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ৩৪।

২২১. মযহারুল ইসলাম, *নজিবর রহমান* (ঢাকাঃ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০), পৃ. ২৯।

২২২. মুস্তাফা নূরুল ইসলাম, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (ঢাকাঃ পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৯৬৯), পৃ. ১৮৩।

২২৩. জুলফিকার মতিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

২২৪. নজিবুর রহমান, *আনোয়ারা* (ঢাকাঃ আলেয়া বুক ডিপো, ২০০৬), পৃ. ১২।

২২৫. তদেব, পৃ. ১৫-১৬।

২২৬. তদেব, পৃ. ১৭।

২২৭. তদেব, পৃ. ১৭।

২২৮. তদেব, পৃ. ১৮।

২২৯. তদেব, পৃ. ১৯।

২৩০. তদেব, পৃ. ২১।

২৩১. তদেব, পৃ. ৩৪।

২৩২. তদেব, পৃ. ৪৩।

২৩৩. তদেব, পৃ. ৫০।

২৩৪. তদেব, পৃ. ১৯।

২৩৫. তদেব, পৃ. ১১৯।

২৩৬. তদেব, পৃ. ১৩০।

২৩৭. তদেব, পৃ. ১৩০।

২৩৮. তদেব, পৃ. ১৩৪।

২৩৯. মোহাম্মদ নবিবর রহমান, *আনোয়ারা* (ঢাকা: ওসমানিয়া বুক ডিপো, ১৩৬৬), পৃ. ১০৭।

২৪০. তদেব, পৃ. ১০৮।

২৪১. তদেব।

২৪২. তদেব, পৃ. ১১৫।

২৪৩. তদেব, পৃ. ১১৯।

২৪৪. তদেব, পৃ. ১২০।

২৪৫. তদেব, পৃ. ১২৩।

২৪৬. তদেব, পৃ. ১২৭।

২৪৭. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *চরিত্রহীন* (ঢাকা: চলাচল প্রকাশনী, ১৯৬৩), প. ১০৯।

২৪৮. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *চরিত্রহীন*, তদেব, পৃ. ১১১।

২৪৯. তদেব।

২৫০. তদেব।

২৫১. তদেব, পৃ. ১১২।

২৫২. তদেব।

২৫৩. তদেব, পৃ. ১২৪।

২৫৪. তদেব, পৃ. ১৪২।

২৫৫. তদেব।

২৫৬. তদেব, পৃ. ১৫৯-৬০।

২৫৭. তদেব, পৃ. ১৭৯।

২৫৮. তদেব, পৃ. ১৭৩।

২৫৯. তদেব, পৃ. ২১৮।

২৬০. তদেব, পৃ. ২৩১।

২৬১. তদেব, পৃ. ২৩৪।

২৬২. তদেব, পৃ. ২৪৪

২৬৩. তদেব, পৃ. ২৫০।

২৬৪. তদেব, পৃ. ২৫৩।

২৬৫. তদেব, পৃ. ২৫৫।

২৬৬. তদেব।

২৬৭. তদেব, পৃ. ৩১৩-৩১৪।

২৬৮. তদেব, পৃ. ২৮৯।

২৬৯. তদেব, পৃ. ৩০০।

২৭০. তদেব, পৃ. ৩০৫।

২৭১. তদেব, পৃ. ৩০৮।

২৭২. তদেব, পৃ. ৩১২।

২৭৩. তদেব, পৃ. ৩১৬।

২৭৪. তদেব, পৃ. ৩১৬।

২৭৫. তদেব, পৃ. ৩১৭।

২৭৬. তদেব, পৃ. ৩২২।

২৭৭. তদেব, পৃ. ৩২৩।

২৭৮. তদেব।

২৭৯. তদেব, পৃ. ৩২২।

২৮০. তদেব, পৃ. ৩২৭।

২৮১. তদেব, পৃ. ৩৩৬।

২৮২. তদেব, পৃ. ৩৩৪।

২৮৩. তদেব, পৃ. ৩৪৫।

২৮৪. তদেব, পৃ. ৪৪২।

Dhaka University Institutional Repository

২৮৫. তদেব, পৃ. ৪৩২।

২৮৬. তদেব, পৃ. ৪৫৮।

২৮৭. তদেব, পৃ. ৪৬৩।

২৮৮. পিনাকেশ সরকার, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা (কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯৫), পৃ. ২৭।

২৮৯. তদেব, পৃ. ৪৩।

২৯০. তদেব, পৃ. ৪৪।

২৯১. তদেব, পৃ. ৪৬

২৯২. তদেব।

২৯৩. তদেব, পৃ. ৪৭।

২৯৪. তদেব।

২৯৫. তদেব, পৃ. ৫০।

২৯৬. তদেব, পৃ. ৫০-৫১।

২৯৭. তদেব, পৃ. ৫১।

২৯৮. তদেব।

২৯৯. তদেব, পৃ. ৫৫-৫৬।

৩০০. তদেব, পৃ. ৬৫।

৩০১. তদেব, পৃ. ৭৫।

৩০২. তদেব।

৩০৩. তদেব, পৃ. ৭৯।

৩০৪. তদেব, পৃ. ৮০।

৩০৫. তদেব।

৩০৬. তদেব, পৃ. ১০১।

৩০৭. তদেব, পৃ. ১০৯-১১০।

৩০৮. তদেব, পৃ. ১১০।

৩০৯. তদেব।

৩১০. তদেব।

৩১১. তদেব, পৃ. ১২৩।

৩১২. ড. সুজিত সরকার, *সাহিত্যে ধর্ম চরিত্র ও ভাষা* (ঢাকা: মনন প্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ২০৬।

৩১৩. হাবিব রহমান (সম্পাদক), *গণদেবতা* (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ. ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

৩১৪. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ (১৯৪৭-১৯৮৭) (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ১৯১।

৩১৫. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ (১৯৪৭-১৯৮৭), তদেব, পৃ. ১৯৪।

৩১৬. হাবিব রহমান, গ্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৩১৭. তদেব, পৃ. ৬৯।

৩১৮. তদেব, পৃ. ২৪।

৩১৯. তদেব, পৃ. ২৭।

৩২০. তদেব, পৃ. ২৯।

৩২১. তদেব, পৃ. ৩০।

৩২২. তদেব, পৃ. ৩১।

৩২৩. তদেব, পৃ. ৩৫।

৩২৪. তদেব, পৃ. ৪৩।

৩২৫. তদেব, পৃ. ৫৬।

৩২৬. তদেব, পৃ. ২০৬।

৩২৭. তদেব, পৃ. ২৫৯।

৩২৮. তদেব, পৃ. ২১৩।

৩২৯. তদেব, পৃ. ২১৭।

৩৩০. তদেব, পৃ. ৪৮।

৩৩১. তদেব, পৃ. ৭০।

৩৩২. তদেব, পৃ. ২৪৩।

৩৩৩. তদেব, পৃ. ৭১।

৩৩৪. তদেব।

৩৩৫. তদেব, পৃ. ৭২।

৩৩৬. তদেব, পৃ. ৭৯।

৩৩৭. তদেব, পৃ. ১৪৬।

৩৩৮. তদেব, পৃ. ২৪৩।

৩৩৯. তদেব, পৃ. ৭০।

৩৪০. তদেব, পৃ. ১১২।

৩৪১. তদেব, পৃ. ১৫৯।

৩৪২. তদেব, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪৩. তদেব, পৃ. ১৬১।

৩৪৪. তদেব, পৃ. ৭৩।

৩৪৫. তদেব, পৃ. ৮৩।

৩৪৬. তদেব, পৃ. ২৮৫।

৩৪৭. ড. সৌমিত্র শেখর (সম্পাদক), *লালসালু* (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০০৬), পৃ. ভূমিকা।

৩৪৮. তদেব, পৃ. ভূমিকা।

৩৪৯. হাবিব রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

৩৫০. তদেব।

৩৫১. তদেব, পৃ. ১৭।

৩৫২. তদেব।

৩৫৩. তদেব, পৃ. ১৭-১৮।

৩৫৪. তদেব, পৃ. ১৮।

৩৫৫. তদেব।

৩৫৬. তদেব, পৃ. ১৯।

৩৫৭. তদেব, পৃ. ৩৭।

৩৫৮. তদেব, পৃ. ৫৯।

৩৫৯. তদেব, পৃ. ৬৪।

৩৬০. তদেব, পৃ. ৬২।

৩৬১. তদেব, পৃ. ৭২-৭৩।

৩৬২. তদেব, পৃ. ৭২।

৩৬৩. ড. সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

৩৬৪. ড. সৌমিত্র শেখর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০।

৩৬৫. তদেব, পৃ. ৩৩।

৩৬৬. কাজী আনোয়ার হোসেন, *মানুষ ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: গোল্ডেন বুক হাউস, ১৯৭৬), পৃ. ৬২৪।

৩৬৭. ড. সৌমিত্র শেখর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৩৬৮. জগদীশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদক), *শ্রীমদ্ভাগবদগীতা* (কলকাতা: প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ১৩৮৪), পৃ. ৫৩৫।

৩৬৯. ড. সৌমিত্র শেখর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৩৭০. তদেব।

৩৭১. তদেব, পৃ. ২১।

৩৭২. তদেব, পৃ. ২৪।

৩৭৩. তদেব।

৩৭৪. তদেব, পৃ. ২৩

৩৭৫. তদেব, পৃ. ৪৮।

৩৭৬. তদেব, পৃ. ৬৮।

৩৭৭. তদেব, পৃ. ৬৭।

৩৭৮. তদেব।

৩৭৯. তদেব, পৃ. ২৪।

৩৮০. তদেব, পৃ. ২৮।

৩৮১. তদেব, পৃ. ৩১।

৩৮২. তদেব, পৃ. ৩২।

৩৮৩. তদেব, পৃ. ৪০।

৩৮৪. তদেব, পৃ. ৫৩।

৩৮৫. তদেব, পৃ. ৮৯।

৩৮৬. তদেব, পৃ. ৮৭।

৩৮৭. তদেব, পৃ. ৮৩।

৩৮৮. তদেব, পৃ. ৮৮

৩৮৯. তদেব, পৃ. ৮৩।

৩৯০. তদেব, পৃ. ৯৪।

৩৯১. শহীদুল্লা কায়সার, *সারেং বৌ* (ঢাকা: জোনাকী প্রকাশন, ২০০০), পৃ. উৎসর্গপত্র।

৩৯২. তদেব, পৃ. ভূমিকা।

৩৯৩. *বাংলা একাডেমি চরিতাবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭।

৩৯৪. শহীদুল্লা কায়সার, *সারেং বৌ* (ঢাকা: নসাস প্রকাশন, ১৯৯৮), পৃ. ১০।

৩৯৫. তদেব, পৃ. ১২।

৩৯৬. তদেব, পৃ. ১৩।

৩৯৭. তদেব, পৃ. ২৪।

৩৯৮. তদেব।

৩৯৯. মনোজ বসু, *রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড* (কলিকাতা: গ্রন্থ প্রকাশন, ১৩৮৭), পৃ. ২৪৬।

৪০০. শহীদুল্লা কায়সার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৪০১. তদেব, পৃ. ৬৪-৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

'খল' নর ও নারী চরিত্রঃ তুলনামূলক আলোচনা

কোনো সাহিত্যকর্মের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, শ্রেণিকরণ, মূল্যায়ন, সবকিছু মিলেই সমালোচনা সাহিত্য। সমালোচনা সাহিত্য সম্পর্কে J.A.Cuddon বলেছেন, 'Criticism is the art or science of Literary Criticism.'[১] চারিত্র্য বিচার সমালোচনা সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। তুলনামূলক চারিত্র্য বিচার বা সমালোচনা করতে একটি চরিত্রের সঙ্গে অপর চরিত্রের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্যসহ নানা বিষয় তুলে ধরে বিশ্লেষণ করতে হয়। এক একটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সমালোচনায় অনেক দিক লক্ষ রাখতে হয়। চরিত্রসমূহের বিশ্লেষণে যে কোন ধরনের শাস্ত্রের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। দর্শনশাস্ত্র, মনোবৃত্তি বিশ্লেষণে মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতিরও প্রয়োজন হতে পারে। তাছাড়া চরিত্রসমূহেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচারের প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে বংশগতিবিদ্যা, জীববিদ্যারও সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। গবেষণার বিষয় যেহেতু নারীর খলতা। সুতরাং তা নির্ণয়ে কিংবা খলতার পেছনে কারণ অনুসন্ধান, আদৌ সেটা অপরাধ কিনা এগুলো জানার জন্য অপরাধ বিজ্ঞানের সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

তুলনামূলক চারিত্র্য সমালোচনায় কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ রাখা উচিত। যথাঃ

ক. চরিত্রসমূহকে যথাযথ অধ্যয়ন

খ. মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি

গ. পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি

ঘ. সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মনোভাব ও প্রচেষ্টা

ঙ. যথোপযুক্ত যুক্তি-প্রমাণ

চ. লেখকের অন্তঃরাজ্যে প্রবেশ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া

ছ. ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির প্রশ্রয় না দেওয়া।

প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্য বা নিজস্বতা রয়েছ। সবাই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সেটা কেবল আচার-আচরণ বা কর্মকাণ্ডের নয়, বরং জীবনেতিবৃত্তের প্রতিটি ক্ষেত্রে। বাংলা উপন্যাসে *'খল' নর ও নারী চরিত* শীর্ষক শিরোনামের এই গবেষণাপত্রে যে সকল চরিত্র আলোচনায় এসেছে, তারা সবাই নিজ নিজ অবস্থানে অন্যদের চেয়ে আলাদা; তাদের সামাজিকতা, পরিবারের প্রকৃতি, স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য সবই প্রায় ভিন্ন। কখনো কখনো তাদের মধ্যে কিছু বিষয়ে মিল বা সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে চরিত্রসূহের অভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য নিরূপণই এই অধ্যায়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, 'শুধুমাত্র ব্যক্তির প্রয়োজন এবং প্রত্যক্ষণের সাহায্যে ব্যক্তির আচরণকে ব্যাখ্যা করার জন্য সচেষ্ট না হয়ে, ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ সম্পর্কীয়, প্রেষণা সম্পর্কীয় ও আবেগগত উপাদানে স্থায়ী সংগঠন অর্থাৎ বিশ্বাস এবং প্রতিবিন্যাসের সাহায্যে ব্যক্তির আচরণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করাই হল সুবিধাজনক এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সূচক।'[২] এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে অর্থাৎ প্রত্যেকটা চারিত্র্য বিচার-বিশ্লেষণে আমাদের কয়েক ধরনের শাস্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন-

১. পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, চাওয়া-পাওয়া, আচার-আচরণ, কুসংস্কার, বিশৃঙ্খলা, সামাজিক প্রভাব প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং সেই আলোকে চারিত্র্য বিচারে প্রয়োজন সমাজ-বিজ্ঞান।

২. চরিত্রসমূহের ব্যক্তিত্ব ও মানস বিশ্লেষণে প্রয়োজন মনোবিজ্ঞান।

৩. মানসিক আচরণের সঙ্গে সমাজ ও সামাজিকতার সংশ্লিষ্টতা, দায়ভার, প্রভাব, আচরণ নির্ণয়ে করণীয় প্রভৃতি বিষয় বিশ্লেষণে প্রয়োজন সমাজ-মনোবিজ্ঞান ও চিকিৎসা-মনোবিজ্ঞানের।

৪. মানসিক আচরণের অনেকটাই নির্ভর করে আর্থিক অবস্থার ওপর। সেজন্য অর্থনীতিরও প্রয়োজন।

৫. মানুষের আচরণের অনেকাংশ প্রবাহিত হয় বংশানুক্রমিক। একারণে চারিত্র্য বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বংশগতিবিদ্যা।

৬. কোনো চরিত্রের অপরাধের ধরণ নির্ণয়ে অপরাধবিজ্ঞান কিংবা অপরিহার্য অপরাধের স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রয়োজন দর্শনশাস্ত্র।

এছাড়া, বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট আরো অনেক বিষয়ের প্রয়োজন হবে।

উপর্যুক্ত শাস্ত্রানুসারে অভিসন্দর্ভ-সংশ্লিষ্ট চরিত্রসমূহের তুলনামূলক আলোচনার প্রয়াস পাব।

মীর মশাররফ হোসেনের চিত্রিত 'জায়েদা' চরিত্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'হীরা' কিংবা 'দরিয়াবিবি' অথবা 'জেবা-উন্নিসা'র চরিত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য যেমন বিদ্যমান, তেমনি মিলও রয়েছে পর্যাপ্ত। তবে সার্বিক বিবেচনা ও বিশ্লেষণ দেখা যায় তাদের ভেতর পারস্পরিক মিলের তুলনায় অমিলই বেশি। তাদের আচার-আচরণ যেমন এক নয়, তেমনি তাদের কথার্বাতা, তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের চাওয়া-পাওয়া, পারিবারিক অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা সবকিছুই আলাদা। যদি *বিষাদ-সিন্ধু*'র দিকে লক্ষ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে জায়েদা যেখানে হাসানের প্রিয় স্ত্রী; সেখানে মায়মুনা কেবল দাসী। এর জন্য দায়ী যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত সামাজিক সাম্যহীনতা। লক মনে করেন, মানুষ জন্মগত দিকে সমান কিন্তু পরিবেশই বিভেদের রেখা টেনে দেয়। তিনি বলেন, "প্রত্যেকটি শিশু

Dhaka University Institutional Repository

সাদা কাগজের মত পরিস্কার আত্মা নিয়ে জন্মায় কিন্তু পরিবেশের কারণে পরে বিভেদের সৃষ্টি হয়।" কেউ কম বা কেউ বেশি জ্ঞানী, কেউ সবল, কেউ দুর্বল কিন্তু পার্থক্য তাদের মধ্যে যে মিল আছে তার চেয়ে সামান্যই মাত্র। তাছাড়া লক সুচিন্তিত হয়ে বলেছেন, 'এসব গড়মিল নিজের হাতে সৃষ্টি নয়। পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধার জন্য পার্থক্য হয়ে বলেছেন, এসব গড়মিল নিজের হাতে সৃষ্টি নয়। পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধার জন্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং মানুষ জন্মগতভাবে সমান, পরিবেশ তাদের মধ্যে বিভেদের রেখা টেনে দেয়।'[৩] জায়েদা এবং মায়মুনা সে সবের কিছুই পায় নি। পৃথিবীতে যত ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়, তার বেশিরভাগের মূলে রয়েছে একটা না পাওয়া কিংবা একটা অতৃপ্ত বাসনা। মানসিক এই অতৃপ্তিবোধ মায়মুনাকে প্রত্যাশী, লোভী করে তুলেছে। মায়মুনার এই লোভ, প্রত্যাশা কিছুটা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়ে গেছে। এটা মায়মুনার আত্মনির্ভরশীল হবার একটা প্রচেষ্টা। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য হল নারীদের আত্মনির্ভরশীল হবার কোনো পথ বা উপায় তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ছিল না। কিন্তু মায়মুনার আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কারণ সারাজীবন অন্যের দাসত্ব করে জীবন অতিবাহিত করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সে যখন তার শরীরে স্থবিরতা আসবে বা জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসবে তখন তার কোনো উপায় থাকবে না। তাই বলা যায়, সমাজের এই সীমাবদ্ধতার কারণে নিরূপায় মায়মুনা বিপথগামী হয়েছে। সুতরাং তার পাপাচারের দায়-দায়িত্ব সমাজের উপরই বর্তায়। সমাজের অনগ্রসরতার কারণে সচেতন মায়মুনা নিজ দায়িত্বে আত্মনির্ভরশীল হবার তাগিদ থেকেই মূলত এজিদের অঙ্গীকারাবদ্ধ মোহরের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। এবং সেই বোধ হতেই বেশ কিছু অন্যায় আচরণ সে জায়েদার ওপর তথা হাসানের পরিবারের ওপর করেছে। জায়েদার কোনো কিছুর অভাব ছিল না। কিন্তু মায়মুনা তার ভেতর একটা অতৃপ্তিবোধ বা অপ্রাপ্তিবোধ জাগিয়ে তুলেছে। এটাকে বলা হয় প্রেষণা। প্রেষণা মানুষের জীবনের অভ্যন্তরীণ চালিকাশক্তি, যা কোনো বিশেষ প্রয়োজন অথবা অভাববোধ হতে উদ্ভুত। 'প্রেষণা আচরণকে প্রবলভাবে সক্রিয় করে এবং অব্যবহিতভাবে পরিচালিত করে।'[৪] প্রেষণা মানুষকে আচরণ করতে বাধ্য করে। প্রেষণা বলতে কোনো কিছুর প্রতি কামনা ও কর্মপ্রেরণা উভয়ই বোঝায়। মানুষ যা করে তার মৌলিক প্রেরণার উৎস প্রেষণা। মায়মুনা জায়েদার ভেতর সেই প্রেষণা তৈরি করেছে। হাসানের ভালোবাসাকে দ্বিধাবিভক্তরুপে জায়েদার মনে উপস্থাপন ও প্রতিস্থাপন করেছে। ফলে জায়েদা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছে। সেটাকে পুঁজি করে মায়মুনা আরও একধাপ এগিয়ে জায়েদার মনে বিষ ঢেলেছে। হাসানের প্রতি জায়েদার মন বিষিয়ে তুলেছে। হাসানের প্রতি জায়েদার মানসিক স্থিতিস্থাপকতা বা নমনীয়তা (elasticity) নষ্ট করে ফেলেছে। 'জায়েদার অন্তরাত্মার অপমৃত্যু সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী।'[৫] যার ফলে হাসানকে হত্যায় প্ররোচিত, প্রলুব্ধ করতে পেরেছে। তাই মায়মুনাকে বলা যায় temptress বা মোহিনী রমণী। তবে উল্লেখ্য যে, মায়মুনা নিজে হাসানকে হত্যা করে নি, প্রভাবিত করেছে মাত্র। সুতরাং মায়মুনাকে হাসানের সরাসরি হত্যাকারী বলা

Dhaka University Institutional Repository

যায় না। জায়েদা নিজ হাতে হাসানকে কয়েকবার হত্যার প্রয়াস চালিয়ে শেষপর্যন্ত সফল হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় জায়েদার মায়মুনার প্রভাব জনিত কারণেই হাসান হত্যায় সচেষ্ট হয়েছিল। তবে তাদের সম্মিলিত এই অন্যায় প্রয়াসের মূলে উভয়েরই অতৃপ্ত কিছু বাসনা ছিল। মায়মুনা অর্থগত অতৃপ্তিবোধ হতে অন্যায় করেছে, অপরদিকে জায়েদা neglect বা carelessness জাতীয় একটা অতৃপ্তিবোধ হতে হাসানকে বিষপ্রয়োগ করেছে। 'ব্যক্তির আত্ম-শ্রদ্ধা, আত্ম-বিশ্বাস, প্রত্যাশা, সবকিছুর ভিত্তি হল অপরে তার সম্পর্কে কি অভিমত পোষণ করে। কিন্তু অপরে আমাকে গ্রহণ করছে না-এই চেতনাই আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং নিজের প্রতি শ্রদ্ধাকে নষ্ট করে দেয়।'[৬] দু'জনের মধ্যে অন্যায়ের মাত্রাবোধে কম-বেশি থাকতে পারে কিন্তু জাতীয় সাদৃশ্য যেটা সেটা তাদের অতৃপ্তিবোধ। অতৃপ্তিবোধের প্রকৃতি ভিন্ন হলেও মুল কথা অতৃপ্তি, যা জায়েদা এবং মায়মুনা উভয়ের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন।

রাজসিংহ-তে জেব-উন্নিসা ও দারিয়াবিবির আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া জায়েদা ও মায়মুনা অপেক্ষা অনেকটাই ভিন্ন। জায়েদার সঙ্গে দরিয়া বিবির চাওয়ার কিছুটা মিল রয়েছে। জায়েদা স্বামী হাসানের অংশীদারিত্ব জয়নবকে দিতে চায় নি। *রাজসিংহ*-তে তেমনি দরিয়াবিবি স্বামী মবারক-কে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছে, দূরে রাখতে চেয়েছে জেব-উন্নিসার কাছ থেকে। অপর দিকে জেব-উন্নিসার আকাঙ্ক্ষা অপ্রতিদ্বন্দ্বী জগদীশ্বর হওয়া, যা জায়েদার মধ্যেও কিছুটা দেখা যায়। মায়মুনার পুনঃপুন প্ররোচনায় সে এক পর্যায়ে এজিদের রাজরাণী হবার প্রত্যাশা করেছে। দরিয়াবিবির রাজরাণী হবার কোনো ইচ্ছাপ্রকাশ লক্ষ করা যায় না। জায়েদা প্রভাবিত মায়মুনা কর্তৃক, মায়মুনা প্রভাবিত মারওয়ান কর্তৃক, মারওয়ান এজিদের আজ্ঞাবাহী দাস। সুতরাং প্ররোচনার এই পরিবৃত্তে দায়ী তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা, যার প্রতিনিধিত্বকারী হল এজিদ।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে দেখা যায় প্রেমের প্রত্যাখ্যান এবং প্রত্যাখ্যাত নর-নারীদের বিপথগামিতা। 'হীরা' তেমনি এক প্রত্যাখ্যাত ও প্রতারিত চরিত্র, যে ভালোবেসেছে দেবেন্দ্রকে মনপ্রাণ উজার করে দিয়ে। কিন্তু দেবেন্দ্র হীরাকে ভালো না বেসে ভালোবেসেছে কুন্দনন্দিনীকে, আর কুন্দনন্দিনী ভালোবেসেছে নগেন্দ্রকে। হীরা, দেবেন্দ্র, কুন্দনন্দিনী, নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীকে ঘিরে তৈরি হয়েছে একটা প্রেমের আবর্ত। সেখানে সবাই কম-বেশি প্রতারিত। তবে সার্বিক বিবেচনায় সবচেয়ে বেশি প্রতারিত যে, সে নিঃসন্দেহে হীরা। হীরা, দেবেন্দ্র, কুন্দনন্দিনী, নগেন্দ্র সেই সেঙ্গে সূর্যমুখী-এই পঞ্চভুজের প্রেমে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হীরা। কুন্দনন্দিনী মরে বেঁচেছে, নগেন্দ্র-সূর্যমুখী পরস্পরকে পুনরায় ফিরে পেয়েছে, দেবেন্দ্র অসুস্থ হয়ে কিছুটা ধুঁকে ধুঁকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। কিন্তু হীরার অবস্থা সবচেয়ে করুণ ও মর্মবিদারক। কেবল দেবেন্দ্রকে পেতে সে প্রায় সম্ভব সবকিছুই করেছে। দেবেন্দ্রের প্রতি তার গভীর প্রেমের কথাই এখানে মূর্ত হয়ে ওঠে। তাছাড়া 'প্রেমই মানব জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

সৌরশক্তি। প্রেমের জটিলতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গভীরতম রহস্যের মাধ্যমে মানুষের আত্মপরিচয় উজ্জ্বল হইয়া উঠে।'[৭] নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর ঘর ভেঙেছে, কুন্দনন্দিনীকে বিষপানে প্ররোচিত করেছে। এ কারণে হীরাকে 'খল-চরিত্র' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে সূর্যমুখী-নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনী প্রেমচক্রকে ইতিবাচক shape- এ নিয়ে গেছে হীরা। যদিও তা মর্মান্তিক, তবুও পঞ্চমাত্রার প্রেমে সেটাই ছিল তাদের অনিবার্য সমাধান। তার পরিবর্তে বা বিনিময়ে হীরা নিজে কিছুই পায় নি। কিন্তু হীরা যে উপায়ে পঞ্চমাত্রার প্রেমজটিলতার সমাধান করেছে তা সামাজিক আইন ও মানবতা বিরোধী। আরেকটা বিষয় লক্ষ করা জরুরি যে, হীরা নিজ ইচ্ছা থেকে কিংবা মন থেকে সব অন্যায় করে নি। সে নিজে যখন দেবেন্দ্রকে ভালোবাসে প্ররোচিত হয়েছে, তখনই কেবল অপরকে প্ররোচিত বা অন্যের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। অনেকটা নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রের মত- প্রত্যেকটি জিনিসের সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আছে।' দেবেন্দ্রকে হীরা ভালোবাসে অথচ সেই দেবেন্দ্র তাকে অবহেলা করে ভালোবেসেছে কুন্দনন্দিনীকে। শুধু তাই নয় কুন্দের সাহচর্য পেতে সে হীরারই স্মরণাপন্ন হয়ে সাহায্য চেয়েছে। এই অপমান হীরা সহ্য করতে পারে নি। হীরা ক্রুদ্ধ হয়ে যা করেছে তা হল- দেবেন্দ্র নগেন্দ্রের বাড়ি গেলে কুন্দের সাক্ষাৎ করিয়ে দেবে বলে হীরা দেবেন্দ্রকে বসিয়ে রেখে দ্বারবানদের চোর তাড়ানোর নামে ডেকে এনেছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়-'দত্তবাড়ি যেয়ে কুন্দনন্দিনীকে দেখতে হীরার সাহায্যে চাইলে দ্বারবানের হাতে প্রহৃত হইয়া পালাইয়া বাঁচিল।'[৮] হীরার সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে দেবেন্দ্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে। কপট-প্রণয়জালে খুব তাড়াতাড়ি লুব্ধচিত্তা, ধর্মভয়হীনা হীরাকে বন্দী করে ফেলেছে। হীরার আত্মসংযমের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, কিন্তু ক্ষণিকের তরে দেবেন্দ্রকে পেয়ে তার সে প্রবৃত্তি বেঁচে ছিল না। তারপর হীরা দেবেন্দ্রকে অধিকার করতে বিষবৃক্ষর যে বীজ রোপন করেছিল, সেই বিষবৃক্ষের ফল ফলেছে। হীরা দেবেন্দ্রের কাছ থেকে প্রত্যাখাত ও পদাঘাতে বিতারিত হয়েছে। তার পরই অপমানিতা হীরা আঘাতপ্রাপ্ত সর্পিনীর মত ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে আত্মহননের ইচ্ছা হলেও পরে তার সে ইচ্ছাকে দেবেন্দ্র বা কুন্দকে বিষ প্রয়োগের দ্বারা হত্যার সংকল্পে পরিণত করেছে। প্রবল হতাশা ও নৈরাশ্যের আঘাত হীরাকে উন্মাদগ্রস্ত করে তুলেছে, তাতে করে প্রকৃত শয়তানোচিত দুষ্টবুদ্ধি তার ভেতর প্রবাহিত হয়েছে। ফলে কুন্দের চরম দুঃখের মুহূর্তে তাকে আত্মহত্যার মন্ত্রণা দিতে, তার হাতের কাছে আত্মহত্যার অস্ত্র প্রস্তুত রাখতে প্রণোদিত হয়েছে। হীরার হৃদয়মন্থনজাত বিদ্বেষে ভয়ংকর জীবননাশী বিষ সে বিরহনিশাতুর কুন্দের মুখের কাছে নিয়ে ধরেছে এবং কুন্দ সেই বিষপান করেই মারা গিয়েছে। হীরা চরিত্রের পরিণতি দেবেন্দ্র বিরহদাহতে সে উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে। পূর্বসুখস্মৃতি, অপমানের অথৈ জ্বালা, দেবেন্দ্র ও কুন্দের বিরুদ্ধে একটা অনির্বাণ কোপানল তার মনকে বিকারগ্রস্ত করে তুলেছে। 'অনন্ত সত্য ক্ষণিক ভালোমন্দের অপেক্ষা না রাখিয়া অসীম কাল সমভাবে বিরাজ করিতেছে। সেই সত্যকে লঙ্ঘন করিলে অবস্থা নির্বিচারে তাহার নির্দিষ্ট ফল ফলিতে

Dhaka University Institutional Repository

থাকিবেই।'[৯] স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির লোপ সত্ত্বেও হীরার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে অতৃপ্ত প্রেম-পিপাসা সম্বলিত এক করুণ সুর-

'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং'[১০]

'ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের ক্ষেত্র, রাষ্ট্রের শুধু থাকে না, ভিন্ন আকারে ভিন্ন মাত্রায় তা নাগরিক সমাজের নানা কর্মকাণ্ডেও ছড়িয়ে পড়ে।'[১১] প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব কিছু চাওয়া বা প্রত্যাশা থাকে। ধন-সম্পত্তি, কারো ইচ্ছা স্বামী-সন্তান বা পরিবার নিয়ে সুখী হওয়া; আবার কারো ক্ষমতাশালী হওয়া বা সর্বময় কর্ত্রী হওয়া। এই সমস্ত চাওয়াগুলো আসে মানবীয় চাওয়া-পাওয়া, অতৃপ্তি বা অভাববোধ, বংশানুক্রমিক কিংবা প্রভাবজনিত কারণে। জেব-উন্নিসার ক্ষেত্রে রাজ্যের ক্ষমতাধর পদ আঁকড়ে থাকার মনোভাব বা মানসিকতাটা এসেছে geneticaly অর্থাৎ বংশপরম্পরায়। জেব-উন্নিসার মধ্যে এই সর্বময় কর্ত্রী হওয়ার বাসনা পরিলক্ষিত। এ কারণে দেখা যায় সে নানা কৌশলে সেই স্তরে বা পর্যায়ে পৌঁছানো চেষ্টা করেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিনী ফুফু রৌশম্বারা-কে পিতার রোষানলে ফেলে হত্যা করিয়েছে জেব-উন্নিসা। এরপর তার স্থান দখল করে অঘোষিত দ্বিতীয় সম্রাটের অধিবারিণী হয়েছে। যদিও সম্রাটের দুই মহিষী উদিপুরী ও যোধপুরী ছিলেন, তবুও রাজ্যের ভালো-মন্দ তথা সামগ্রিক দেখভালের লাগাম সম্রাটের পর জেব-উন্নিসার হাতেই ন্যস্ত ছিল। তার এই অবস্থান টিকিয়ে রাখতে সে সবসময় সজাগ ও সচেতন। রাজ্যের বাদশা পিতা আলমগীরসহ ক্ষমতাধর সব মনস্বদার তার হাতে জিম্মি হয়েছিল ভালোবাসার ছলে পড়ে। 'বঙ্কিমচন্দ্র জেব-উন্নিসার রূপ পাপ ইন্দ্রিয়শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভুত্বের পটভূমিতে খেলার সামগ্রীরূপে প্রেমকে এঁকেছিলেন।'[১২] সেনাপতি মবারক খাঁ সেও জেব-উন্নিসার প্রেমের জালে আবদ্ধ। অনুরূপ *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসে হাসান যখন জয়নবকে বিয়ে করে তখন থেকে জায়েদা স্বামীর উপযুক্ত caring, sharing-এর অভাববোধ করেছে। জয়নবের ওপর একটা স্বাভাবিক মানবীয় jealousy feel থেকে প্রথমত স্বামীকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছে, কিন্তু সেটা না পেরে পরবর্তী সময়ে মায়মুনার পুনঃপুন প্রলুব্ধ করণে বিশেষ করে অর্থ-প্রতিপত্তি ও এজিদের মহিষী হওয়ার প্রলোভনে পড়ে জায়েদা বিপদগামী ও হন্তারক হয়ে উঠেছে। জায়েদার মত জেব-উন্নিসাও মানবীয় রীতিভ্রষ্ট হয়েছে। বংশপরম্পরার প্রভাবে ক্ষমতার অধিকারিণী হবার ইচ্ছায় হন্তারক হয়ে উঠেছে। পুঙ্খানুপঙ্খ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে জেব-উন্নিসার ভেতর ক্ষমতার লোভ জাগ্রত করেছে মূলত তার ফুফুদ্বয় জাঁহানারা ও রৌশম্বারা। জেব-উন্নিসা ছোট থেকেই ফুফুদের ক্ষমতা-লিপ্সার বিষয়টি চাক্ষুস করে বড় হয়েছে। ক্ষমতার জন্য এক ফুফু আরেক ফুফুকে কেমন করে বিপর্যস্ত করেছে তা সে দেখেছে। কিভাবে বাদশার মন পেতে হয় বা রাখতে হয় তাও সে দেখেছে, জেনেছে। এ সমস্ত জানাটাই পরবর্তী সময়ে জেব-উন্নিসাকে ক্ষমতালিপ্সু করে তুলেছে। মায়মুনা, গুজাবুড়ি, দুর্গা কারো মধ্যে জেব-উন্নিসার

মত ক্ষমতা-লিপ্সার বিষয়টা নেই। তাদের আছে কেবল দু'মুঠো খেয়ে-পড়ে সুস্থাবস্থায় কালাতিপাত করবার ইচ্ছা।

বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাসের জায়েদা এবং *স্বর্ণলতা* উপন্যাসের প্রমদার মধ্যে কিছুটা জেব-উন্নিসার ন্যায় ক্ষমতা-লিপ্সার গুণ বা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রমদার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলতে যা ছিল তা হল অতি গরীব থেকে মোটামুটি স্বচ্ছল একটা জীবন যাপন করা। সেই সঙ্গে স্বাভাবিক মানবীয় কামনা-বাসনা, শখ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা তার ভেতর ছিল। প্রমদার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূলে ছিল সামাজিক স্তর পরিবর্তন কিংবা সামাজিকভাবে একটা মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি লাভ। কিন্তু জেব-উন্নিসার ক্ষেত্রে তা স্বচ্ছলতা বা সামাজিক স্তর পরিবর্তন নয় বরং বিষয়টা সম্পূর্ণ মানসিক ও বংশপরম্পরা। মুঘল সম্রাটদের স্বাভাবিক ক্ষমতা লিপ্সা; সেইসঙ্গে নারী লোলুপতা। এই নারী লোলুপতা, ক্ষমতা-লিপ্সা মুঘল সম্রাটদের জীনগত বৈশিষ্ট্য। 'রাষ্ট্রশক্তির কাণ্ডকারখানাকে আজীবন সন্দেহের চোখে দেখে এসেছেন এমনকি রবীন্দ্রনাথও।'[১৩] জীনগত সেই বৈশিষ্ট্যের প্রভাবই লক্ষ করা যায় জেব-উন্নিসার চারিত্র্যে। প্রভাবজনিত এই কারণেই জেব-উন্নিসা তার ভালোবাসাকে, ভালোবাসার মানুষকে পর্যন্ত প্রথমের দিকে গুরুত্ব দেয় নি। তার কাছে মনে হয়েছে মুঘল সম্রাট, সম্রাট তনয় বা তনয়ারা প্রজা অপেক্ষা ভিন্নতর। সম্রাটরা যেমন একাধিক বিবাহ করতে পারেন, তেমনি সম্রাটতনয়াদের অনুরূপ একাধিক সম্পর্কে দোষের কিছু নেই। তাছাড়া মুঘল সম্রাটরা নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অন্য ক্ষমতাশীল সম্রাট বা রাজার কন্যাদের বিবাহ করতেন। এই বিষয়টা হয়তো জেব-উন্নিসার মাথায় ছিল। তাই নিজের অবস্থান ও মর্যাদা বজায় রাখতে সে রাজ্যের ক্ষমতাশীল মনস্বদারদের কৌশলে আয়ত্ত্বে রাখার চেষ্টা করেছে। জেব-উন্নিসা মবারকের মৃত্যুর পর যখন ক্ষমতা ও ভালোবাসার পার্থক্য বুঝতে বা মর্ম অনুধাবন করতে পেরেছে, তখনই কেবল সে তার ক্ষমতালিপ্সু মনোভাব, একেশ্বরী হবার বাসনা পরিত্যাগ করেছে। তবে বাসনা মরে যাবার পূর্বে সে বংশীয় প্রভাবজনিত কারণে অনেক অনৈতিক কর্মকান্ড ঘটিয়েছে নিজ স্বার্থে।

জেব-উন্নিসার সঙ্গে 'প্রমদা' চরিত্রের খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রমদাও অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা জেব-উন্নিসার মত আচরণ করেছে। নিজ সামাজিক অবস্থান বা মর্যাদা টিকিয়ে রাখতে সে স্বামীকে এক রকম প্রায় অস্বীকার করেছে। যদিও ভালো করে বিষয়টা খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সে কেবল নিজ স্বার্থে নয় বরং পিতৃ-পরিবারে অন্য সব সদস্যদের জীবন রক্ষার্থে এবং স্বামীহীন সংসারে সামাজিক অন্যায় বা অবিচার হতে রক্ষা পেতেই সে স্বামীর প্রতি নির্দয় হয়েছে। স্বামীকে জমিদারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কোনোরূপ অর্থ ব্যয় করে নি। কারণ সে মনে করেছে অর্থ তাকে তার সামাজিক অবস্থানে অটল ও দৃঢ় থাকার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সাহায্য করবে, সামাজিক কুদৃষ্টির হাত হতে রক্ষা করবে। অপরদিকে স্বামীকে টাকার বিনিময়ে বাচাঁতে গিয়ে যদি সমস্ত টাকা হাতছাড়া হয়ে যায়, তাতেও

Dhaka University Institutional Repository

যদি স্বামী ছাড়া না পায় তবে তাদের পথে বসতে হবে। টাকার বিনিময়ে তার স্বামীকে মুক্ত করে দেওয়া হবে তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। আর এই বাস্তবতাটাকেই সে মেনে নিয়েছে। তাছাড়া প্রমদা দারিদ্র্যের মধ্যে ছোট থেকে বড় হয়েছে। দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে ইতঃপূর্বে সে বার বার জর্জরিত হয়েছে। দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা, বঞ্চনা সম্পর্কে তার যথেষ্ট জানা-শোনা ও জ্ঞান ছিল। সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে একদিকে নিজ জীবন, ছেলে-মেয়ে অপরদিকে মা-ভাইয়ের জীবন সে ধ্বংস করতে চায় নি। জেব-উন্নিসার সামাজিক অবস্থান প্রমদার বিপরীত, সে ছোট থেকেই প্রাচুর্যের মাঝে বড় হয়েছে দারিদ্র্য কি তা তার অজানা। পারিবারিকভাবে সে বংশানুক্রমিক ক্ষমতার অপব্যবহার, লালসা, কোন্দল প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করেছে, ফলে সেও তার ক্ষমতার অবস্থানে অনড় থাকার চেষ্টা করেছে। ফলে জেব-উন্নিসা ও প্রমদার সামাজিক অবস্থান বিপরীতমুখী হলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু এক ও অভিন্ন। একজন রাষ্ট্রের একচ্ছত্র কর্ত্রী হতে চেয়েছে অপর জন পরিবারের সর্বময় কর্ত্রী হতে চেয়েছে। জেব-উন্নিসা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ফুফুকে সরিয়েছে, বোনদের বিয়ে দিয়ে রাজ্য থেকে স্থানান্তরিত করেছে। অপরদিকে, প্রমদা সংসারের চাবিকাঠি পুরোপুরি হস্তগত করতে দেবর-জা'দের পরিবার থেকে আলাদা করে দিয়ে তার উদ্দেশ্যপূরণের চেষ্টা করেছে। জেব-উন্নিসা ও প্রমদার মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে তা হল প্রমদা type (শ্রেণি) চরিত্র কিন্তু জেব-উন্নিসা type চরিত্র নয়, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র। কারণ জেব-উন্নিসা চরিত্রে নায়িকাচিত কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রমদার ভেতর নেই। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন। তিনি প্রমদা সম্পর্কে বলেছেন-প্রমদা ও সরলা উভয়েই শ্রেণি-প্রতিনিধি, ব্যক্তিত্বভাস্বর নয়, তবে প্রমদার কুটিল ও সরলার সরল, সহিষ্ণু প্রকৃতিটি শ্রেণিগত গণ্ডির মধ্যেই স্পষ্টভাবে ফুটিয়েছে।'[১৪] প্রমদা ও জেব-উন্নিসা-একজন শ্রেণিপ্রতিনিধি, আরেকজন ব্যক্তিভাস্বর হলেও তাদের অন্যায়ের স্বরূপ প্রায় একই। তবে তারা ভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত। তারা তাদের অন্যায় আচরণের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নয়, তারপরও কিন্তু নিয়তি তাদের কাউকে ক্ষমা করে নি- না জেব-উন্নিসাকে, না প্রমদাকে। নিয়তি জেব-উন্নিসাকে স্বামী হারা করে পাগলিনী করেছে। প্রমদাকেও ক্ষমা সারাজীবনের জন্য পরাধীন করেছে। প্রমদা যে গহনা ও কাগজের লোভ করেছিল তা নিয়ে পালাতে প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকা ডুবি হয়েছে এবং সেগুলো নদতিে হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে। তাছাড়া সরলাকে সে পছন্দ করত না কিন্তু নিয়তি তার ছেলে গোলাপকে দিয়ে প্রমদার বাকি জীবনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছে। প্রমদা ও জেব-উন্নিসার মধ্যে যেটুকু মিল পাওয়া যায় তা যৎসামান্য। সামাজিক অবস্থান ছাড়াও একটি বড় বৈসাদৃশ্য হল জেব-উন্নিসা শেষ পর্যন্ত নায়িকাচিত বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছে কিন্তু প্রমদা নিজ গুণে অপরাধ কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত সবার হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারে নি। নায়িকাচিত বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে সৌন্দর্য, বয়স, আত্মোপলব্ধি বা অনুশোচনা এবং সর্বোপরি পাঠকের সমবেদনা বা মমত্ব লাভের উপর। জেব-উন্নিসার ভেতর এ সকল বৈশিষ্ট্যের সবগুলোই ছিল কিন্তু প্রমদার ভেতর সৌন্দর্যের গুণ থাকলেও অন্যান্য গুণ বা বৈশিষ্ট্য

Dhaka University Institutional Repository

অনুপস্থিত। তাছাড়া তাদের অবস্থানগত বিষয়টাও লক্ষণীয়-প্রমদা পারিবারিক জটিলতার আবর্তে পরিবেষ্টিত কিন্তু জেব-উন্নিসা তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তবে এটা লক্ষ করা খুব জরুরী যে, জেব-উন্নিসা আত্মোপলব্ধির যথেষ্ট সুযোগ ও সময় পেয়েছে কিন্তু প্রমদা তা মোটেও পায় নি।

আনোয়ারা এবং *সারেং বৌ* উপন্যাসের যথাক্রমে দুর্গা ও গুজাবুড়ি তারা একই শ্রেণি বা গোত্রের চরিত্র। তাদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান, তাদের আর্থিক অবস্থা সবই প্রায় এক। যদিও তারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। দুর্গা হল বৈষ্ণবী অপর দিকে গুজাবুড়ি সাধারণ মুসলমান ধর্মের। তবে তারা দুজনেই স্বামীপুত্রহীনা ও বিধবা। তারা জীবিকা নির্বাহ করে অন্যের ওপর ভর করে। দুর্গা বৈষ্ণবী বাড়ি বাড়ি, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা করে। দুর্গা সম্পর্কে ঔপন্যাসিক নজিবর রহমান বলেছেন- 'তাহাকে দুর্গার মত সুন্দরী দেখাইত বলিয়া তাহার পৈতৃক গুরুদেব দুর্গা নাম রাখিয়া ছিলেন। বাল্যকালে বিধবা হইয়া ভরা-যৌবনে প্রতিবেশী এক স্বজাতি যুবকের অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া আসাম নওগাঁয় চলিয়া যায়। তথায় সাত বৎসর অবস্থানের পর যুবক অসুস্থ হইয়া পড়িলে, দুর্গা তাহাকে ত্যাগ করিয়া এক উত্তরদেশীয় যুবকের আশ্রয় গ্রহণ করে। সে চাকুরি উপলক্ষে তাহাকে কামরূপ লইয়া যায়। সেখানে যাইয়া দুর্গা অনেক তন্ত্রমন্ত্র শিক্ষা করে। কিছুদিন অবস্থানের পর, রক্ষক ও রক্ষিতার মধ্যে মনোমালিন্য ঘটায়, রক্ষিতা তথা হইতে পুনরায় নওগাঁ পলাইয়া আসে এবং এক বিখ্যাত বাবাজীর আখড়ায় নাইয়া বৈষ্ণবী হয়। আখড়ায় অবস্থান করিতে করিতে দুর্গা অন্য এক নবীন বৈষ্ণবের অধীনতা স্বীকার করিয়া শেষে তাহাকে লইয়া পিতার দেশে চলিয়া আইসে। শেষ এই বৈষ্ণবও মারা যায়। তার পর থেকে সে বৈষ্ণবী থেকে হয়ে যায় মাসী। সে সুন্দরের মাসী, সে আব্বাস আলীরও মাসী।'[১৫] অপর দিকে গুজাবুড়ি গ্রামের সাধারণ দীন ও হীন পরিবারের মানুষ। তার আপনজন বলে কেউ নেই। গ্রামের কয়েকটা দয়াশীল পরিবার আর কয়েকজন মোড়ল শ্রেণির স্বার্থন্বেষী মানুষের ওপর তার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করে। তাদের ছোট ছোট ফরমায়েস খেটে সে জীবিকা নির্বাহ করে। গুজাবুড়ির অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে গ্রামের কুচক্রী, মাতব্বর লুন্দর শেখ তাকে দিয়ে নানাবিদ অন্যায় ও অসামাজিক কাজ করায়, তাকে অর্থের বিনিময়ে প্রলুব্ধ করে। গুজা বুড়িও তাদের অন্যায় কাজে সহায়তা করেছে বেঁচে থাকার তাগিদে। অপর দিকে *স্বর্ণলতা*'র দুর্গা বৈষ্ণবী সেও জীবিকার তাগিদে অর্থ লাভের আশায় অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছে। গুজাবুড়ি এবং দুর্গা বৈষ্ণবীর অন্যায় কাজের স্বরূপ এক ও প্রায় অভিন্ন। গুজাবুড়ি লুন্দর শেখের হাতে নবিতুনকে তুলে দিতে চেষ্টা করেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নানা উপায়ে, বুদ্ধি খাঁটিয়ে লুন্দর শেখের হাতে হস্তান্তর করার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ নানা উপায়ে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছে। অপর দিকে দুর্গা বৈষ্ণবী সেও আনোয়ারাকে আব্বাসের হাতে সমর্পণ করতে সাহায্য করছে। সেজন্য তাকে অনেক ধৈর্য ধারণ করতে হয়েছে, সময় খরচ করতে হয়েছে, বুদ্ধি খাঁটিয়ে উপায় বের করতে হয়েছে-তারপর সে আনোয়ারাকে আব্বাসের কব্জায় দিতে পেরেছে। আব্বাস হল আনোয়ারার বিমাতা

Dhaka University Institutional Repository

গোলাপজান-এর ভাতুষ্পুত্র খাদেমের বন্ধু। দুর্গা ও গুজাবুড়ির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক হলেও তাদের কাজের ধরন ভিন্ন। দুর্গা আনোয়ারার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়েছে, তার স্পর্শকাতর স্থানে আঘাত করেছে। অপরদিকে গুজাবুড়ি নবিতুনকে বিভিন্ন বিষয়ের লোভ দেখিয়েছে, যেমন-লুন্দর শেখের সম্পত্তির লোভ, সুখী হওয়ার লোভ, রাজরানি হওয়ার লোভ প্রভৃতি দেখিয়ে নবিতুনকে রাজি করাতে চেয়েছে; লুন্দর শেখের প্রধানা বিবি হওয়ার জন্যও লোভ দেখিয়েছে। কিন্তু দুর্গা বৈষ্ণবী গুজাবুড়ির মত অনেক বেশি সময় নেয় নি কিংবা অনেক দিন ধরে লোভ দেখিয়ে বোঝাতে যায় নি। সে আনোয়ারার অন্তঃপুরে কৌশলে প্রবেশ করেছে কোনো প্রকার সুযোগের আশায় এবং এক সময় একটি সুযোগ সে পেয়েছে, যখন আনোয়ারার স্বামী নুরল এসলামের অসুখ হয়। নুরল এসলামের রোগ মুক্তির জন্য আনোয়ারা যখন হতবিহ্বল, কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না, তখন দুর্গা বৈষ্ণবী তাকে অসুখ নিরাময়ের উপায় বলে দিয়েছে। অসুখ নিরাময়ের উপায় বলে দেওয়াটা ছিল মূলত আনোয়ারাকে হস্তগত করতে দুর্গার একটা বুদ্ধিদীপ্ত কূট-কৌশল। দুর্গা আনোয়ারাকে নুরল এসলামের অসুখ থেকে মুক্তি লাভের জন্য যে উপায় বলে দিয়েছে তা হল-আনোয়ারাকে অমাবশ্যার মাঝরাতে খোলা বা এলো চুলে পূর্বদিকে মুখ করে মৃতসঞ্জীবনী গাছের শিকড় এক নিঃশ্বাসে তুলতে হবে এবং সেটা নুরল এসলামকে খাওয়াতে হবে। তাহলে নুরল এসলামের রোগ সারবে। স্বামীর মঙ্গলার্থে আনোয়ারা দুর্গার কথামত সেই ভয়ঙ্কর কাজ করতে গিয়েছে। ফলশ্রুতিতে আনোয়ারা পূর্ব পরিকল্পনায় ওৎপেতে থাকা আব্বাস চক্রের হাতে পড়েছে। দুর্গা সমালোচকের চোখে খল হলেও তার সবচেয়ে বড় গুণ হল সে যা ওয়াদা করে তা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। আব্বাসের পিতা রহমতুল্লার অনেক আবদার, অনুরোধ এবং হুকুম দুর্গা পলন করেছে। গ্রামের আরও অনেক প্রভাবশালী মানুষদের হুকুম সে পালন করেছে। অনুরূপ আব্বাস আলীর হুকুমে আনোয়ারাকে তার হাতে সমর্পণের নিশ্চয়তা দিয়েছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় দুর্গার উক্তি এরূপ-দুর্গা যাহা মনে করে, তাহা সম্পন্ন করে।'[১৬] দুর্গা ও গুজাবুড়ির মধ্যে যে সাদৃশ্য লক্ষণীয় তা হল তাদের কাজের স্বরূপ। তারা দু'জনই সমাজের প্রভাবশালীদের হাতের কব্জায় বন্দী, এক কথায় জিম্মি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমাজপতিদের চাপের মুখে তাদের অন্যায় চাওয়া পূরণে সহযোগিতা করাই দুর্গা ও গুজাবুড়ির কাজ ছিল। সামগ্রিক বিবেচনায় তাদের ভেতর বৈসাদৃশ্যও বেশ ছিল; প্রথমত তাদের বয়সের পার্থক্য ছিল-গুজাবুড়ি অতি প্রাচীনা বৃদ্ধা, কিন্তু দুর্গা প্রাচীনের কাছাকাছি হলেও প্রাচীনা নয়। দুর্গার খেটে খাবার মত শক্তি ছিল কিন্তু প্রবৃত্তি ছিল না, আর গুজাবুড়ির সেই শক্তিই ছিল না। সে কারণে গুজাবুড়িকে নিয়তির সন্তান বলা যেতে পারে কিন্তু দুর্গাকে তা বলা যায় না। তবে এটাও সত্য পুরোপুরি বৃদ্ধ না হলে গ্রাম-গঞ্জে ভিক্ষার প্রসার জমে না। সেই বাস্তবতা জ্ঞান দুর্গার ছিল। তাই সে ভিক্ষাবৃত্তি বাদ দিয়ে অন্য পথ অবলম্বন করেছে। তাছাড়া গ্রামের মোড়ল-শ্রেণি তাকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে সাহায্য না করে উল্টো তাকে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত করেছে। অর্থ, বাসস্থান, উপহার দিয়ে প্রলুব্ধ করেছে। ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে এক টুকরো মাংস ফেলে দিলে তার কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। মাংসের টুকরোটা

Dhaka University Institutional Repository

পঁচা না বাসি তা দেখার ধৈর্যও থাকে না। তেমনি ক্ষুধার্ত দুর্গার সামনে যখন সমাজপতিরা অর্থের যোগানের পথ দেখিয়েছে, তখন সেই পথ ভালো না মন্দ তা যাচাই করার বিবেচনা তাৎক্ষণিকভাবে তার মাথায় আসে নি। ফলে রহমতুল্লা, আব্বাস আলীদের মত ধূর্ত মানুষদের অসৎ কর্মকাণ্ডে অনিবার্য প্রয়োজনের তাড়নায় অংশগ্রহণ করেছে। অন্যায়ের স্বরূপ যখন তাদের মনে উদ্ভাসিত হয়েছে তখন ইচ্ছে থাকলেও ক্ষমতাশীল সামাজপতিদের কারণে আর সঠিক পথে গুজাবুড়ি কিংবা দুর্গা কেউই ফিরে আসতে পারে নি। তারপরও গুজাবুড়ি ও দুর্গা বৈষ্ণবী উভয়েই সমালোচকদের সমালোচনার স্বীকার হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যায়ের পরিমাণ নির্ণয় বা সমালোচনা করতে গেলে গুজাবুড়িকে দুর্গা অপেক্ষা কিছুটা কম রূঢ় মনে হয়। গুজাবুড়ির অসহায়ত্ব পাঠকহৃদয়ের সহানুভুতি লাভ করে কিন্তু দুর্গা বৈষ্ণবী পাঠকের সেই সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত। অনেক সমালোচক ও পাঠক হয়তো মনে করেন দুর্গা নিজেকে আন্যায়ের সঙ্গে না জড়িয়েও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু গভীরভাবে দুর্গার জীবনেতিবৃত্ত পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, দুর্গার জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে stragle করে। তারপরও তার জীবনে সুখ আসে নি। প্রতিমুহূর্তে তাকে বেঁচে থাকতে সংগ্রাম করতে হয়েছে, স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে, বারবার তাকে সঙ্গী পাল্টাতে হয়েছে। স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবন যাপনের প্রয়াসে এক সঙ্গীর মৃত্যুর পর অন্য আরেকটা সঙ্গী বেছে নিয়েছে। কিন্তু তার সে প্রয়াস কখনো সফল হয় নি, নিয়তি বারবার আঘাত হেনেছে। কয়েকবার প্রচেষ্টার পরও যখন জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে পারে নি তখন বাধ্য হয়ে নিজ দেশে ফিরে এসেছে। পিতৃভূমিতে তার কোনো বাসযোগ্য বাড়ি বা জমি ছিল না। আশ্রয়হীন অসহায় দুর্গাকে নিজ স্বার্থে বাসস্থানের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে রহমতুল্লা। আব্বাস আলীর পিতা রহমুতল্লা নিজ তালুক-মধ্যে দুর্গার আখড়া করে দিয়েছে। আখড়াটা কেবল লোক দেখানো, আসলে লোকচক্ষুর আড়ালে নিজ দুষ্কর্মের দূতী হিসেবে দুর্গাকে কাজে লাগানোই রহমতুল্লার উদ্দেশ্য ছিল। ফলে দুর্গা অনেকটা নিরূপায় হয়েই রহমতুল্লার কাজে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। তা না হলে তাকে বাস্তভিটা হারাতে হত। তাকে পুনরায় অনির্দিষ্টের পথে চলতে হত। কিন্তু জৈবনিক অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত দুর্গা জীবনের শেষ পর্যায়টা মাতৃভূমিতেই অতিবাহিত করতে চেয়েছে। প্রত্যেকটা মানুষের চাওয়া থাকে একটা নির্দিষ্ট বাসভূমির এবং সেটা তাদের কাছে হিরন্ময়। যদিও তা দেখার দায়িত্ব সরকারের; কিন্তু সরকার, রাষ্ট্র কিংবা সমাজে দুর্গার থাকার কোনো ব্যবস্থা করে দেয় নি। দুর্গা ও গুজাবুড়ি উভয়ের ক্ষেত্রে একটা কথা সত্য তা হল 'অর্থনৈতিক অধিকার না থাকায় নারী জাতি আমাদের সমাজে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত। সামাজিক বাধা নিষেধের শিকার প্রধানত তারাই। সম্ভবত এই কারণে মানসিক সংঘাতে তাঁরা বেশি ভোগেন এবং তা প্রতিফলিত হয় তাদের মধ্যে মানসিক সমস্যার আধিক্য।'[১৭] অপরদিকে গুজাবুড়ির খাদ্যাভাব থাকলেও মাথা গোঁজার একটা নির্দিষ্ট ঠাঁই ছিল। দুর্গা ও গুজাবুড়ি উভয়ই তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সমাজপতিদের দ্বারস্থ হয়েছে। তাদের কেউ যদি সমাজপতিদের কথা অমান্য করতো তাহলে বাসস্থান ও খাবারের যোগান বন্ধ হয়ে যেত। *সারেং বৌ*

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে গুজাবুড়িকে শেষ পর্যন্ত সেই করুণ পরিণতির স্বীকার হতে দেখা যায়। লুন্দর শেখের কাজে ব্যর্থ হওয়ার দরুণ তার কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ও প্রাত্যহিক খাবার থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

দুর্গা ও গুজাবুড়ির পারস্পরিক সমালোচনায় দুর্গাকে বেশি অপরাধী বলে মনে হয়। কারণ গুজাবুড়ি তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত কিন্তু দুর্গাকে কোনো অনুশোচনা করতে দেখা যায় না। লেখক দুর্গাকে অনুশোচনার সুযোগ দেন নি। আনোয়ারাকে আব্বাসদের হাতে সমর্পণ করার দায়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আনোয়ারাকে উদ্ধার এবং গ্রেফতার করার মাঝে অনুশোচনা জানানোর জন্য দুর্গার হাতে পর্যাপ্ত সময় ছিল না। একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, নুরল এসলামের প্রতি আনোয়ারার ভালোবাসা দুর্গাকে তার দূরভিসন্ধি পূরণে সহায়তা করেছে আর নবিতুনের কদমের প্রতি ভালোবাসা গুজাবুড়ির অভিসন্ধিকে পূরণ হতে দেয় নি। গুজাবুড়ি নবিতুনের ভালোবাসার কাছে সিক্ত হয়েছে, শ্রদ্ধায় ও বিনয়ে নবিতুনের কাছে মাথা নুইছে। খাদ্যের অনুসন্ধানে, শেষ আশ্রয় হিসেবে সে নবিতুনের বাড়িতেই গিয়েছে। নবিতুনের প্রতি সে অবিচার করলেও আবার তার কাছেই মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে। গুজাবুড়ি লুন্দর শেখের কাজে ব্যর্থ হওয়ায় তার খাবারের বিলি-ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে অদম্য পিপাসা ও ক্ষুধার তাড়নায় গুজাবুড়ি বাধ্য হয়ে নবিতুনের কাছে খাবার চেয়েছে। পুনঃপুন প্রলুব্ধ করার চেষ্টায় তিক্ত-বিরক্ত হয়ে একবার গুজাবুড়িকে পিঁড়ি ছুঁড়ে মেরেছিল নবিতুন। তারপরও সেই নবিতুনই আবার তাকে খাবার দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, কারণ গুজাবুড়ির চোখে-মুখে ও কণ্ঠস্বরে অদম্য খিদের যে কারণ আরতি ও মূর্তি ফুটে উঠেছে সেটাকে নবিতুন কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারে নি। দুর্গা বৈষ্ণবীর খাবার চাহিদা এতটা প্রবল বলে মনে হয় না। আর অনুশোচনার কোনো সুযোগ ছিল না বা পায় নি। এজন্যই হয়তো দুর্গা গুজাবুড়ি অপেক্ষা অধিক সমালোচিত হয়েছে।

আনোয়ারা উপন্যাসে দুর্গা বৈষ্ণবীর পাশাপাশি গোলাপজান চরিত্রটির খলতার দায়ে সমালোচিত হয়েছে। গোলাপজান আনোয়ারার বিমাতা, বাঙালি সমাজ ব্যবস্থায় প্রায় সবসময় বিমাতার অবস্থান Negative Sence-এর অস্বীকার। এটা একটা সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। 'বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উপাদান কুসংস্কারকে সযত্নে প্রতিপালিত করে।'[১৮] আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পূর্ব থেকে ধরে নেওয়া হয় বিমাতা মানেই বিপরীত, মায়ের বিপরীত মেরু। আবার যারা বিমাতা হয়ে কোনো পরিবারে প্রবেশ করে তখন তারও মনে নেতিবাচক ধ্যান-ধারণা মনের অজান্তেই প্রোথিত ও দৃঢ় হয়। সে ধরেই নেয় তাকে বিপরীতমুখী একটা অভিনয়ের মুখোমুখী হতে হবে। ফলে দেখা যায়, বিমাতাকে প্রায় সবসময় খলতার গুণে সমৃদ্ধ হতে। সামাজিক রীতি-নীতি, কুসংস্কার, শিক্ষাব্যবস্থা এবং পরিবার ও সমাজে বসবাসকারী মানুষের মানস-ই এর জন্য দায়ী। বিমাতাকে যে কাজগুলো করতে হয় বলে বিমাতারা মনে করেন তা হলো, তাকে পরিবারে সবার প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

কঠোর হতে হবে এবং সেই ভাব মনে পোষণ করতে হবে। স্বামীর পূর্ব পত্নীর রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তার ছেলে-মেয়েদের তা থেকে বঞ্চিত করতে হবে। তার ছেলে মেয়েদের দিয়ে যাবতীয় কাজ করিয়ে নিতে হবে আর নিজ ছেলে-মেয়েকে প্রয়োজনীয় সব সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, এমনকি স্বামীর পূর্বতন পক্ষের ছেলে-মেয়েদের যেন ভালো কোনো সংসারে বিয়ের ব্যবস্থা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণত এগুলোই বিমাতাদের কাজ হয়ে থাকে। গোলাপজানের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই ঘটতে দেখা যায়। আনোয়ারার প্রতি সে অনুরূপ ধারণা পোষণ করেছে এবং তা কাজে পরিণত করার জন্য সবসময় চেষ্টা চালিয়েছে। তাছাড়া গোলাপজানের আত্মসৌন্দর্য সম্পর্কে অগাধ বিশ্বাস ও অহংবোধ ছিল। তার ধারণা ছিল তার মত সুন্দরী আর কেউ নেই। লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গোলাপজানের সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রশস্তি করেছেন এভাবে-

১. গোলাপজান প্রসিদ্ধ সুন্দরী।[১৯]

২. গোলাপজানের রূপে কি যেন এক মাদাকতাসক্তি ছিল।[২০]

৩. অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তাহার ভুবন-ভুলান রূপ দেখিয়া অনিমেষ-লোচনে তাকাইয়া থাকিত।[২১]

সৌন্দর্য নারীর স্পর্শকাতর একটা বিষয়। প্রত্যেক নারীই চায় পুরুষের চোখে সুন্দরী হতে। সৌন্দর্য যেমনই হোক সব নারীই ভাবে তার প্রেমিক অথবা স্বামী তাকেই সবচেয়ে সুন্দরী ভাবুক। গোলাপজানের অবস্থানও সেই চাওয়ার বাইরে না। বাদশার মা গোলাপজান ও আনোয়ারার সৌন্দর্যের তুলনায় গ্রামের অন্যান্য নারীরা বলেছে-'বাদশার মা তখন মনে করিত তার মত সুন্দরী আর বুঝি নাই। কিন্তু যখন সে তৃতীয় স্বামী ভূঞা সাহেবের বাটীতে পদার্পণ করিয়া বার বৎসরের মেয়ে আনোয়ারাকে দর্শন করিল তখন তাহার রূপের গর্ব একেবারে চুর্ণ হইয়া গেল। বাস্তবিক বালারুণ-রাগরঞ্জিত বিকাশোন্মুখ পদ্মিনীর সহিত যেমন আনোয়ার সহিত যৌবনোত্তীলা বিকৃতসুন্দরী গোলাপজানের উপমাই হয় না। কিন্তু না হইলেও গোলাপজান নিজ রূপের সহিত সতীন কন্যার রূপের তুলনা করিয়া হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। স্বামী সোহাগে সে এক্ষণে গৃহের কর্ত্রী; সুতরাং সে নানা প্রকারে তাহার এই বিজাতীয় বিদ্বেষবিষে আনোয়ারাকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।'[২২] সেই থেকে স্বাভাবিক মনোবৃত্তীয় কারণেই গোলাপজান আনোয়ারাকে বিষচোখে দেখছে। অপরদিকে, নিজ মেয়ে সালেহার প্রতি যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের চেষ্টা করেছে। নিজ সুবিধার্থে ভাতুষ্পুত্র খাদেমের সঙ্গে সালেহার বিয়েও দিয়েছে। *আনোয়ারা* উপন্যাসে দুই জন বিতামার কথা উল্লেখ আছে-একজন আনোয়ারার বিমাতা, অপর জন নুরুল এসলামের বিমাতা। দুই বিমাতার মধ্যে পারস্পরিক সমালোচনায় দেখা যায়, উভয়ের আচরণ ও কর্মকাণ্ড প্রায় একই। আনোয়ারার বিমাতা আনোয়ারার কখনো ভালো চায়নি, তার পড়া-লেখা বন্ধ করে দিয়েছে। ঘরের যাবতীয় কাজ আনোয়ারাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে। এমনকি ভালো স্থানে বিয়ের সম্বন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

যেন না হয় সে চেষ্টাও করেছে। আনোয়ারার সম্পত্তি যেন অন্য হাতে না যায় সে জন্য আপন ভাতুষ্পত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চেয়েছে। এতে সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে আনোয়ারাও তাদের আয়ত্তে থাকবে, উপরন্তু বাড়ির যাবতীয় কাজের জন্য বাড়তি লোকের প্রয়োজন হবে না। অন্যদিকে নুরুল এসলামের বিমাতা সেও কখনো নরুল এসলামের ভালো চায় নি। নুরুল এসলামের পড়া-লেখা সম্পন্ন করতে দেয় নি, তাকে বি.এ পাশ করার সুযোগ দেয় নি। বাবা মারা যাওয়ায় বি.এ পাশ না করেই তাকে চাকরি নিতে হয়েছে। বিমাতা ও তার সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নুরল এসলামই পালন করেছে। তারপরও যখন সে আনোয়ারাকে বিয়ে করল তখন তাকে মেনে নিতে পারে নি। তাকে প্রতি পদে পদে মানসিকভাবে হেয় করতে চেয়েছে। তার নামে, তার বাবা-মার নামে নিজ মেয়ে সালেহাকে দিয়ে কুৎসা রটনা করিয়েছে। আনোয়ারার সর্বনাশে দুর্গা বৈষ্ণবীকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছে। আনোয়ারাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অশান্তিতে রাখতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়ে নিয়েছে। নুরল এসলাম তার প্রতিবাদ করলে রাগে অগ্নিশর্মা হয়েছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়-'তাহার বিমাতা ক্রোধে, অভিমানে উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "আমি যদি বড় ঘরের মেয়ে হই, তবে এ অপমানের প্রতিফল তোকে ভোগ করিতেই হবে"।'[২৩] আনোয়ারার বিমাতা এবং নুরল এসলামের বিমাতা উভয়ের অনুরূপ কঠোর আচরণের একটাই কারণ তাদের দৃঢ় বিশ্বাস সৎ ছেলে-মেয়েরা কখনো ভালো হয় না, কখনও তাদের ভালো চায় না, ভালো চাইতে পারে না। ফলে আনোয়ারা, নুরল এসলাম; তারা বিমাতাদের জন্য ভালো কোনো সিদ্ধান্ত নিলেও তাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। তারা সেই সিদ্ধান্তকে দূরভিসন্ধি বলে মনে করেছে এবং তার পেছনে বড় কোনো নেতিবাচক উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করেছে। মূলত, তাদের এই ধারণাগুলো অশিক্ষা, সামাজিক অপপ্রচার ও কুসংস্কারের কুফল মাত্র। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা পরবর্তী সময়ে আনোয়ারা ও নুরল এসলামের জীবনে অশুভ ছায়াপাত করেছে। আনোয়ারার বিমাতা ও নুরল এসলামের বিমাতার আচার-আচরণ বেশিরভাগ সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও একটা বড় কর্মকাণ্ড জনিত পার্থক্য আছে। নুরল এসলামের বিমাতা কখনো নুরল এসলামের প্রাণঘাতী হবার চেষ্টা করে নি। পক্ষান্তরে আনোয়ারার বিমাতা মোহরের লোভে নুরল এসলামের প্রাণনাশে সচেষ্ট হয়েছে। নিয়তি গোলাপজানকে ক্ষমা করে নি। নুরল এসলামের পরিবর্তে গোলাপজান ভুলক্রমে নিজ ছেলেকে নিজ হাতে ধারালো ছুড়ি দিয়ে গলা কেটে হত্যা করেছে। এরূপ কর্মকাণ্ড বাংলা উপন্যাসের কোনো চরিত্রে সহজে চোখে পড়ে না। আনোয়ারার বিমাতা এবং নুরল এসলামের বিমাতার স্বার্থান্বেষী আচরণের মূলে রয়েছে পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত ঐতিহ্যগত কুসংস্কার। কারণ একজন রমণী যখন একটা পরিবারে নতুন আসে, তখন তাকে সাদরে গ্রহণ করা হয় না। উপরন্তু পরিবার ও সমাজের পক্ষ থেকে তাকে অসৎ কাজে প্ররোচিত ও প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়। পরশ্রীকাতরতা সবদেশের, সবকালের, সবসমাজের একটা common statistics. অন্য দেশের অন্য সমাজ অপেক্ষা বাঙালি-সমাজে পরশ্রীকাতরতার বিষয়টা বেশি প্রকটিত। আর এই পরশ্রীকাতরতাটা

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার ও সমাজ কর্তৃক অনেকটা জোর করে বিমাতাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সেটা না করে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে যদি বিমাতাদের সম্মানের চোখে দেখা হত তাহলে বিমাতাদের আচরণ যথাযথ রমণীয় এবং মাতৃসুলভ হত।

হীরা ও জায়েদার আচরণে কিছুটা সহজাত মিল বিদ্যমান। তারা উভয়ই কম-বেশি তাদের প্রিয়মানুষটির কাছে থেকে বঞ্চনার স্বীকার হয়েছে। 'লোক বলে, "সকলই দুষ্টের দোষ।" দুষ্ট বলে, "আমি ভাল মানুষ হইতাম-কিন্তু লোকের দোষে দুষ্ট হইয়াছি"।'[২৪] হীরা মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে দেবেন্দ্রকে ভালোবেসেছে। দেবেন্দ্রকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনেছে। দেবেন্দ্রকে কাছে না পেলেও যদি কেবল তাকে দেখতে পায় তবুও তাতে হীরার অপরিমেয় শান্তি, তাইতো হীরা দেবেন্দ্রকে বলেছে-'প্রভু আমি আপনার রূপগুণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। কিন্তু আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি আপনাকে দেখিলেই সুখী হই।'[২৫] হীরার কথা থেকে দেবেন্দ্রের প্রতি তার গভীর অনুরাগের, অনন্য প্রগাঢ় প্রেমের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কিন্তু দেবেন্দ্র তাকে ভালোবাসে নি; তার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করেছে। সে ভালোবেসেছে কুন্দনন্দিনীকে এবং কুন্দনন্দিনীকে পাবার জন্য হীরার কাছে সাহায্য চেয়েছে। হীরা কেবল দেবেন্দ্রের রূপ দেখেই তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছে; অন্য কিছুর প্রত্যাশা করে নি-দেবেন্দ্রের অর্থ-প্রতিপত্তি কিছু না। দেবেন্দ্রের প্রতি তার ভালোবাসা ও প্রতিহিংসার কারণ-'মনে করিয়াছিলাম, যে ভালবাসে, সে বাসুক, আমি ত কখনও কাহাকে ভালোবাসিব না। ঠাকুর বল্লে, রহ, তোরে মজা দেখাচ্ছি। শেষে বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান। পরের চোর ধরতে গিয়ে আপনার প্রাণটা চুরি গেল! কি মুখখানি! কি গড়ন! কি গলা! অন্য মানুষের কি এমন আছে? আবার মিন্সে আমায় বলে, কুন্দকে এনে দে! আর বলতে লোক পেলেন না।'[২৬] দেবেন্দ্র জানত হীরা তাকে গভীরভাবে ভালোবাসে ও বিশ্বাস করে। তার সেই অন্ধবিশ্বাস ও ভালোবাসাকে পুঁজি করে দেবেন্দ্র হীরার মাধ্যমে কুন্দনন্দিনীকে করায়ত্ত করার চেষ্টা করেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শত ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য করেও কুন্দনন্দিনীকে পেতে হীরা তাকে আপ্রাণ সাহায্য করবে। কিন্তু দেবন্দ্রের এই সাহায্য চাওয়াকে হীরা সহজভাবে নেয় নি, কোনো নারীর পক্ষে তা সহজভাবে নেওয়াও সম্ভব নয়। হীরা দেবেন্দ্রের এই সাহায্য প্রার্থনাকে নিজের অপমান জ্ঞান করেছে। হীরা তার ভালোবসার অপমান সহ্য করতে পারে নি। 'হীরা, আপন নিষ্ফল প্রণয়যন্ত্রণা সহ্য করিতে পরিতো, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর প্রতি দেবেন্দ্রের অনুরাগ সহ্য করিতে পরিল না।'[২৭] হীরার প্রণয়যন্ত্রণা *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের নবকুমারের সঙ্গে তুলনীয়। নবকুমার এবং হীরা উভয়ই যথাক্রমে কপালকুণ্ডলা ও দেবেন্দ্রর রূপ দেখে পাগল হয়েছে। আবার উভয়ই তাদের প্রিয় মানুষের জীবন-নাশের কারণ হয়েছে। নবকুমার তার প্রিয়াকে বিসর্জন দিতে এসে বলেছে-'কাঁদিব কেন? তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ী! তুমি ত কখনও রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই। .... তুমি ত কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।'[২৮] নবকুমার শত যন্ত্রণা সত্ত্বেও কপালকুণ্ডলাকে বিসর্জন

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে নিজেও আত্মাহুতি দিয়েছে অপরদিকে হীরাও তেমনি দেবেন্দ্রকে কুন্দ থেকে বঞ্চিত করেছে এবং দেবেন্দ্র-বিরহে নিজে হয়েছে উন্মাদিনী। তবে দেবেন্দ্রের পরিণতির জন্য দেবেন্দ্র নিজেই দায়ী কারণ সে তার নানা আচরণে হীরার নারীসুলভ প্রতিহিংসাকে জাগ্রত করে তুলেছে। উদহারণস্বরূপ দেবেন্দ্র বলেছে-'আমি তোমাকে চিনিলাম, এখন কলে নাচাইতে পারিব। যে দিন মনে করিব, সেই দিন তোমার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিব।'[২৯] এই 'কলে-নাচাতে' গিয়েই হীরার ভেতর হিংসা, ক্রোধ-এগুলো জাগিয়ে তুলেছে। এ কারণেই হীরা দেবেন্দ্রকে 'কুন্দনন্দিনী' পেতে সাহায্য না করে বিপরীত কাজ করেছে। দেবেন্দ্র হীরাকে কেবল ছলনা করে নি, তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়-'কিন্তু কেবল পরিত্যক্ত নহে সে দেবেন্দ্রের দ্বারা যেরূপ অপমানিত ও মর্মপীড়িত হইয়াছিল, তাহা স্ত্রীলোকমধ্যে অতি অধমারও অসহ্য।'[৩০] সুতরাং এরপর হীরা যা করেছে, তার জন্য তাকে কোনোভাবেই অপরাধী বা দায়ী করা চলে না। হীরা অপমানের প্রতিশোধার্থে ও ভালোবাসাকে জয়যুক্ত করতে দৃঢ়চিত্তে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে পথের কাঁটাকে দূর করতে। কিন্তু তারপরও ভালোবাসার মানুষকে সরাসরি আঘাত করতে তার হৃদয়ে সাড়া মেলে নি। তাই হীরা তার অপমানের জন্য প্রথমে দেবেন্দ্রকে দায়ী করলেও সেই দায়ভার কুন্দনন্দিনীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। কুন্দনন্দিনীকে কৌশলে আত্মহননের পথে প্রভাবিত করেছে। দেবেন্দ্র তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কিংবা প্রেমের অভিনয় না করলে হীরা কুন্দনন্দিনীর প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হত না অথবা প্রভাবিত করতে যেত না। অপরদিকে জায়েদাও স্বামী হাসানের জয়নবকে বিয়ে করার পর থেকে পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসার অভাববোধ করেছে। 'জাএদার সন্তান-সন্ততি কিছুই নাই। এক ব্যক্তির দুই প্রার্থী হইলেই মহাগোলমাল উপস্থিত হয়। স্বপত্নীবাদ কোথায় না আছে? হাসনে বানু হাসানের প্রথমা স্ত্রী, সকলের মাননীয়। তৎপতি জাএদার আন্তরিক বিদ্বেষভাব থাকিলেও তাহা কার্যে পরিণত করিতে পরিতেছেন না। কিন্তু জয়নাবের সহিত তাঁহার সমভাব চলিতে লগিল। জাএদা ভাবিয়াছিলেন, হাসান তাহাতে অনুরক্ত; পূর্বে যাহা হইয়াছে, কিন্তু জাএদা বাঁচিয়া থাকিতে আর দারপরিগ্রহ করিবেন না। এক্ষণে দেখিলেন, তাঁহার বিশ্বাস ভ্রমসংকুল। এখন নিশ্চয়ই বুঝিলেন, হাসানের ভালোবাসা আন্তরিক নহে; আন্তরিক হইলে এরূপ ঘটিত না।'[৩১] হাসান সবসময় স্ত্রীত্রয়কে সমানভাবে ভালোবাসতে ও মর্যাদা দিতে চেষ্টা করলেও মাঝে মাঝে জয়নবের দিকে ঝোঁক একটু বেশি বলে মনে হয়েছে; আর সেটা জায়েদার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ফলে নারীসুলভ সামান্য প্রতিহিংসা তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সেই সামান্য প্রতিহিংসাকে উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে মায়মুনা। মায়মুনা তাকে বুঝিয়েছে হাসানের ভালোবাসা তার অপেক্ষা জয়নবের প্রতি বেশি, জয়নবের প্রতি হাসান বেশি যত্নশীল। প্রথমে মায়নুমার প্ররোচনায় গুরুত্ব না দিলেও পুনঃপুন মন্ত্রণায় জায়েদার চিত্ত দ্বিধান্বিত ও বিক্ষুব্ধ হয়েছে। *বিষাদ-সিন্ধুতে* বর্ণিত সামাজিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গৃহকর্ত্রীর কোনো কিছু share (বিনিময়) করবার সবচেয়ে কাছের মাধ্যম হল গৃহের প্রধানা দাসী। গৃহকর্ত্রীরা এই শ্রেণির দাসীদেরকে খুব বিশ্বাস করতো এবং তাদের

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে সখীরূপ আচরণ করত; তাদের মনের যাবতীয় বিষয় share (বিনিময়) করত। জায়েদাও মায়মুনাকে বিশ্বাস করে তার কষ্টের কথা বলেছে। ফলে মায়মুনা যখন জয়নবের প্রতি স্বামী হাসানের ঝুঁকে পড়ার কথা বলেছে, তখন জায়েদা সেটাকে বিশ্বাস করেছে এবং পরবর্তী সময়ে তার কথা মত স্বামীর ভালোবাসা থেকে জয়নবকে বঞ্চিত করতে কৌশলী হতে চেয়েছে। স্বামীকে একা আপনার করে পেতে চেয়েছে, কিন্তু সেটা পাবার কোনো উপায় বের করতে না পেরে জয়নবের পরিবর্তে হাসানকে বিষ প্রদান করেছে। তাতে যে নিজ পায়ে কুঠার মারা হবে তা সে ভাবে নি। তাছাড়া মায়মুনা হাসানের replacement হিসেবে এজিদকে জায়েদার সামনে উপস্থাপন করেছে। জায়েদাকে এজিদের সম্পত্তি, এজিদপ্রাসাদে তার সর্বময় কর্ত্রী হবার সুযোগ, এজিদের অদম্য ভালোবাসা প্রভৃতির লোভ দেখিয়ে প্রলুব্ধ ও প্রভাবিত করেছে। হীরা যেমন দেবেন্দ্রকে স্বামী হিসেবে না পাওয়ায় প্রতিশোধ প্রবণ হয়ে উঠেছে, তেমনি জায়েদাও হাসানের পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসা না পেয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েছে। হীরা দেবেন্দ্রের ওপর হিংসাতুর হয়ে দেবেন্দ্র যার প্রতি প্রণয়াসক্ত, সেই কুন্দনন্দিনীকে বিষ গ্রহণে প্ররোচিত করেছে। অন্যদিকে জায়েদা জয়নবের প্রতি হিংসাকাতর হয়ে হাসানকে বিষ প্রদান করেছে। তাহলে দেখা যায় হীরা ও জায়েদা প্রায় একই কাজ করেছে। উভয়ই প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে একজন স্বামীকে অপরজন প্রেমিকের প্রিয়াকে সুপরিকল্পিতভাবে বিষপানে প্ররোচিত করে হত্যা করেছে। তবে এখানে লক্ষণীয় যে, জায়েদা স্বহস্তে বিষপ্রদান করেছে, আর হীরা প্ররোচিত করে বিষপানে সহায়তা করেছে। হীরা ও জায়েদার মানস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হীরার প্রতিহিংসা বা বৈরী স্বভাব তৈরি হয়েছে পুরোপুরি প্রেম থেকে কিন্তু জায়েদার প্রতিহিংসার বিষয় পুরোপুরি প্রেম নয়। প্রেমের পাশাপাশি স্বামীর উপর প্রভাব বিস্তার, একচ্ছত্র অধিকার বজায় রাখা, পরিবারে নিজ অবস্থান ও কর্তৃত্ব বজায় রাখা প্রভৃতি। তবে স্বামী হাসানের প্রতি জায়েদার এরপ প্রভাব বিস্তার, অধিকারবোধ, কর্তৃত্ব প্রভৃতি মানসিকতার জন্ম হয়েছে জয়নবকে বিয়ে করার পর। এ কারণে সহজেই বলা যায়, জায়েদার মানস পরিবর্তনের জন্য হাসানও অনেকাংশে দায়ী। তাছাড়াও মায়মুনার প্ররোচনায় জায়েদার মানসে যুক্ত হয়েছিল ক্ষমতার লোভ, বিত্তের লোভ, সম্মানের লোভ প্রভৃতি। তবুও বলা যায় এসব চাওয়া-পাওয়ার মূলে রয়েছে বিকৃত মননের প্রেম। কিন্তু হীরার ব্যাপারটা নিরঙ্কুশ ও অবিসংবাদী প্রেম ব্যতীত অন্য কিছু বলে মনে হয় না। কারণ 'হীরা' চরিত্রের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিকাশ লক্ষ করলে দেখতে পাওয়া যায়, হীরার অন্যান্য লোভ অপেক্ষা দেবেন্দ্রের প্রীত অনাবিল আকর্ষণের যে লোভ, তার ভাগটাই বেশি ছিল। কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখীর কাছ থেকে অপমানিত হয়ে রাতের আধাঁরে পালাতে গিয়ে যখন পথ ভুলে হীরার বাড়িতে গেছে, তখন হীরা তাকে সমাদরে আশ্রয় দান করেছে। কুন্দনন্দিনীকে আশ্রয় দান তথা লুকিয়ে রাখার দুটো উদ্দেশ্য হীরার ছিল। প্রথমত সে জানতো কুন্দনন্দিনীকে না পেলে নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মধ্যে একটা ঘোরতর মনোমালিন্য উপস্থিত হবে এবং কুন্দনন্দিনী প্রতি নগেন্দ্রের প্রেম বৃদ্ধি পাবে। নগেন্দ্র যদি কুন্দনন্দিনীকে বিয়ে করে তবে সেই হবে অন্তঃপুরের সর্বময় কর্ত্রী; আর হীরা হবে তার সবচেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

প্রিয়ভাজন। ফলে তার যা ইচ্ছে হবে তাই পূরণের সুযোগ থাকবে। এমনকি দেবেন্দ্রকে তখন সহজেই আপনার করে পেতে কোনো বাধা থাকবে না। হীরা সদ্যংশজ হলেও নগেন্দ্র-প্রাসাদে তার পরিচয় প্রধানা দাসী হিসেবে। কিন্তু কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের স্ত্রী হলে সেই মূলত হবে রাজ্যের অঘোষিত সম্রাজ্ঞী, আর কুন্দনন্দিনী হবে দাসী। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* গ্রন্থে হীরার প্রেমের স্বরূপ এবং তার ভেতর হিংসাতুর মনোভাব জাগ্রত হবার কারণ বর্ণনা করেছেন এভাবে- 'প্রথম দর্শন মাত্রই, সেই প্রেম তাহার দেহ মনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল। তাহার হৃদয়ের এই অতর্কিত প্রেমাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি জটিল আনুষঙ্গিক অবস্থা ও তাহার চারিদিকে সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম দেবেন্দ্র তাহাকে দাসী জ্ঞান করিয়াই কুন্দের প্রতি নিজ গোপন অনুরাগের কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিল, এবং কুন্দ-প্রাপ্তবিষয়ে তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিয়া তাহার মনোমধ্যে একটা বিষম ক্রোধ ও কুন্দের প্রতি বিজাতীয় হিংসা জাগাইয়া তুলিল। তারপর ঘটনাক্রমে যখন কুন্দনন্দিনী পালিয়ে হীরার ঘরে আশ্রয় নেয়, তখন কুন্দের প্রতি তার প্রতিহিংসা প্রবলতর হওয়ার সুযোগ পায়, অপরদিকে সে কুন্দকে সূর্যমুখীর উচ্ছেদের জন্য শাণিত অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিবার সংকল্প পোষণ করিতে লাগিল। অতঃপর সে সময় বুঝিয়া কুন্দ-অস্ত্র ত্যাগ করিয়া সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের মর্মান্তিক বিচ্ছেদ সংঘটন করিল।'[৩২] সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, হীরার ক্রমবিবর্তনের জন্য মূলত দেবেন্দ্র ও সামাজিক সাম্যহীনতাই দায়ী। সামাজিক সাম্যহীনতা দায়ী এই অর্থে যে, কুন্দনন্দিনী আর হীরার সামাজিক status এক হলে দেবেন্দ্র হীরাকে উপেক্ষা (overlook) করতে পারতো না। কেননা, এক সামাজিক অবস্থান ব্যতীত সবদিকে কুন্দনন্দিনী অপেক্ষা হীরার প্রাচুর্য ছিল।

মায়মুনা ও হীরা দু'জনের মধ্যে প্রথমত যে বিষয়ে মিল পাওয়া যায় তা হল উভয়েই যথাক্রমে জায়েদা ও সূর্যমুখীর প্রধান দাসী। তারা উভয়েই অল্পবয়সী এবং সুন্দরী। হীরা সুন্দরী তা উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজেই স্বীকার করেছেন। কুন্দনন্দিনী আত্মসমালোচনা করতে গিয়ে বলেছে- 'আমার চেয়ে হীরা দাসীও সুন্দরী। হীরাও আমার চেয়ে সুন্দর? হাঁ শ্যামবর্ণ হলে কি হয়- মুখ আমার চেয়ে সুন্দর।'[৩৩] কিন্তু মশাররফ হোসেন সরাসরি মায়মুনার সৌন্দর্য স্বীকার করেন নি, আবার তার কোনোরূপ কদর্যের বর্ণনাও দেন নি। তাছাড়া *বিষাদ-সিন্ধু*'র সমসাময়িক আরও উপন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যেখানেই একাধিক দাসী আছে সেখানেই যে সর্বাধিক বুদ্ধিমতি, চতুরা এবং সুন্দরী তাকেই প্রধানা দাসী করা হয়। সেই দৃষ্টিতে বলা যায় মায়মুনা অবশ্যই সুন্দরী ছিল। অমিল খুঁজতে গেলে প্রথমেই দেখা যাবে, হীরা বাল্যবিধবা। তবে তা লোকমুখে প্রচারিত। কারণ লেখকের ভাষায়- 'হীরা বাল্যবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিত। কেহ কখনো তাহার স্বামীর প্রসঙ্গ শুনে নাই।'[৩৪] মায়মুনার বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে লেখক কোনো প্রকারের সুনির্দিষ্ট তথ্য দেননি। তার স্বামী নেই এটা বোঝা যায়। কিন্তু কেন নেই, সে আদৌ বিবাহিত কিনা তা অথবা সে বিধবা কিনা; এরূপ কোনো প্রশ্নের

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরই পাওয়া যায় না। মায়মুনার আর্থিক দীনতা ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। কেননা এজিদের প্রেরিত দূত মারওয়ান সহজেই মায়মুনাকে মোহর দিয়ে প্রলুব্ধ করতে পেরেছে। কিন্তু হীরার অর্থের প্রতি তেমন কোনো লোভ-লালসা দেখা যায় না। কুন্দনন্দিনী যখন তার আয়ত্তে ছিল, তখন সে ইচ্ছা করলে কুন্দের পরিবর্তে অনেক অর্থ লাভ করতে পারতো; তা সে করে নি। তারপরও তারা সমালোচকদের দৃষ্টিতে প্ররোচক, তারা দু'জনেই যথাক্রমে জায়েদা ও কুন্দনন্দিনীকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেছে। মায়মুনা স্বীকার বা নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য জায়েদার ভেতর Transfer করেছে। সেই বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে জায়েদা হাসানের প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হয়েছে। অপর দিকে হীরা সরাসরি কুন্দনন্দিনীকে প্ররোচিত করেছে। হীরা ও জায়েদার ভেতর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয় উভয়ের ভেতর সাম্যচিন্তা প্রকটিত। এই সাম্য বা সমতা বলতে সমাজের অন্যসবার সঙ্গে তাদের সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা, সম্মানবোধ, অধিকারবোধ, প্রেম প্রভৃতিতে সাধারণভাবে সমতা লাভ করাকে বোঝায়। সাম্যকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে তিনটি মূল সুর পাওয়া যায় তা হল-

এক. সাম্য অর্থ সমান করার ইচ্ছা। এই অর্থে সকল মানুষকে সমানভাবে সুবিধা প্রধানের ব্যবস্থা করা।

দুই. কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বিশেষ কোন সুবিধা প্রদান না করা।

তিন. সকলের পর্যাপ্ত পরিমাণ নিশ্চয়তা বিধান।

সাম্য সম্পর্কে আরও বলা যায় 'সমান করার মানসিকতাই সাম্য। (It is a leveling process) লাস্কি বলেন, সাম্য বলতে সেইসব সুযোগ-সুবিধাকে বুঝানো হয় যা ভোগ করতে গিয়ে অন্যের সুবিধা খর্ব হয় না।'[৩৫] হীরার ক্ষেত্রে এই সমতা ছিল না বলেই সে বিক্ষুব্ধ হয়েছে। সামাজিকতার সঙ্গে সঙ্গে বিধাতাকেও দায়ী করেছে। হীরা সরাসরি বলেছে-'বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিল কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে, সেও সকলকে ফাঁকি দিতে চায়।'[৩৬] জায়েদা নিজেকে মনে মনে জয়নবের সঙ্গে তুলনা করেছে, সৌন্দর্য ও পতিপ্রেম নিয়ে। অপরদিকে, হীরা নিজেকে মনে মনে তুলনা করেছে জমিদার নগেন্দ্রের স্ত্রী সূর্যমুখীর সঙ্গে। তাছাড়া, তার পূর্ব পুরুষের ইতিহাস যথেষ্ট সমৃদ্ধ। জাতিগত দিক হতে হীরা নগেন্দ্রদের সমগোত্রীয় ও সদ্ব্যংশজ। চেহারাগত সৌন্দর্যের বিচারে সে সূর্যমুখী কিংবা কুন্দনন্দিনী হতে নিজেকে কম বলে মনে করে না। তাই তাকে overlook করে যখন দেবেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর দিকে ঝুঁকেছে, তখন হীরা স্বগোক্তি করেছে-'আচ্ছা দেবেন্দ্র কুন্দকে কি এত সুন্দরী দেখেছে? আমরা গতর খাটিয়ে খাই, আমরা যদি ভাল খাই, ভাল পড়ি, পটের বিবির মত ঘরে তোলা থাকি, তা হলে আমরাও অমন হতে পারি।'[৩৭] হীরার সগোক্তির মাধ্যমে মূলত তার হৃদয়ে জেগে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক মনোভাব, তার মুখে উচ্চারিত হয়েছে সাম্যবাদের বাণী। সামাজিক অসাম্যতার জন্য সে

Dhaka University Institutional Repository

দায়ী করেছে সৃষ্টিকর্তাকে- তাকে গরিব করার জন্য, তাকে সূর্যমুখীর দাসী করার জন্য। সুতরাং মায়মুনা, জায়েদা ও হীরার খল-আচরণের পেছনে মূলত দায়ী সাম্যহীনতা। তবে তিনজনের পেছনে তিন ধরনের সাম্যহীনতা কাজ করেছে। মায়মুনার ক্ষেত্রে অর্থগত অর্থাৎ সামাজিক ও নিয়তির মিশ্রণজনিত সাম্যহীনতা জায়েদার ক্ষেত্রে পতি প্রেমজনিত সাম্যহীনতা, হীরার ক্ষেত্রে সামাজিক ও নিয়তির মিশ্রণজনিত সাম্যহীনতা। হীরা, প্রমদা, মায়মুনা, জেব-উন্নিসা, জায়েদা প্রত্যেকটি চরিত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। তারা প্রত্যেকটি জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, প্রলুব্ধ, প্রতারিত কিংবা প্রভাবিত। তাদের কেউই কোনো কারণ ছাড়া স্বেচ্ছায় অন্যায়ের পথ বেছে নেয় নি। তারা অবশ্যই কারো প্রভাবের স্বীকার। কেবল ব্যক্তি প্রভাব নয়, সেই সঙ্গে পরিবার, সমাজ এবং ও রাষ্ট্রের সাম্যজনিত নিয়ত-রীতিও সমানভাবে দায়ী। সামাজিক রীতি-নীতি, কুসংস্কার, বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যের প্রভাবেও হীরা, মায়মুনার মত নারীরা বিপথগামী হয় এবং অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। জায়েদা, জেব-উন্নিসা কিংবা প্রমদা; তারা যে কেবল অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে অন্যায় কাজ করেছে তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তারা নিজেরাও কিছুটা দায়ী, কিন্তু সেটা মানবীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি। সমাজ-সংসারের প্রত্যেকটা মানুষই কম-বেশি ভুলের অধীন; উর্দ্ধে নয়। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, স্বীয় স্বার্থ বুঝে নেওয়া, স্বচ্ছল জীবন যাপনের সুযোগ চাওয়া, পরিবার ও সমাজে সম্মান নিয়ে টিকে থাকা, নিজের পছন্দমত কাউকে ভালোবাসা; এগুলোর প্রত্যেকটি মানুষের তথা প্রত্যেকটি নারীর এক একটি মানবীয় চাওয়া। আর এগুলো পেতে যদি সে ছোট-বড় কোনো ভুল করে থাকে, তবে তার দায়-দায়িত্ব কোনো নারীর একার নয়; পরিবার, সমাজ এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রেরও। তাই আমরা বলতে পারি-হীরা, জায়েদা, মায়মুনা, প্রমদা, দুর্গা কিংবা জেব-উন্নিসা কারো অপরাধের পেছনে কোনো অনিবার্য সম্পর্ক ছিল না। এমনকি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অচলা, সাবিত্রী, অভয়া, রাজলক্ষ্মী এবং বোধহয় কিরণময়ীও জন্ম-অপরাধী নহে, পাপের প্রতি একটা প্রবল ও অনিবার্য প্রবণতা তাহাদের অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া নাই।'[৩৮]

'অনিবার্যতা দর্শনশাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়।'[৩৯] দর্শনশাস্ত্রের মাধ্যমে কোনো ঘটনার বিশ্লেষণ করতে গেলে আগে দেখা হয় ঘটনার সঙ্গে কারণের অনিবার্য কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। যদি ঘটনার সঙ্গে কারণের অনিবার্য সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে সেটাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। আর যদি অনিবার্য সম্পর্ক না থাকে তাহলে সেটা অপরাধ হবে না। হীরা, জায়েদা, মায়মুনা, প্রমদা, জেব-উন্নিসা, গোলাপজান, দুর্গা প্রত্যেকটা চরিত্রই দর্শনশাস্ত্রের অনিবার্যতার সঙ্গে বিশ্লেষণ সাপেক্ষে প্রমাণের দাবিদার। তাদের অপরাধ প্রকৃত কিনা দর্শনের অনিবার্যতার সঙ্গে আলোচনার প্রয়াস পাব।

প্রথম হীরার দিকে যদি দেখি তাহলে দেখব যে, হীরার প্রেমের বিষয়টা অনিবার্য কিন্তু তার খল অভিধার পেছনে অনিবার্য কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা হীরা নিজ স্বার্থে কিংবা প্রেমের জন্য অন্যায় আচরণ করে

Dhaka University Institutional Repository

নি। তার দ্বারা যতটুকু অন্যায় সংঘটিত হয়েছে তার মূলে ছিল দেবেন্দ্রের প্ররোচনা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা। জায়েদার ক্ষেত্রেও সেরূপ ঘটতে দেখা যায়। জায়েদার প্রতি হাসানের কিছুটা ঔদাসীন্য ও অমনোযোগিতার কারণে সে বিপথগামী ও হন্তারক হয়ে উঠেছে। সমালোচক আবুল আহসান চৌধুরী বলেছেন-'সামান্যতম হলেও এজিদের অনুশোচনাবোধ আছে। কিন্তু জাএদা চরিত্রে তার লেশটুকু মেলে না।'[৪০] কিন্তু ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে ঔপন্যাসিক 'জায়েদা' চরিত্রে সে সুযোগ রাখেন নি। হাসানকে হত্যার পর জায়েদা মারোয়ান সহযোগে মায়মুনার সঙ্গে এজিদের প্রাসাদে যায় এবং সেখানে আকস্মিক ও নাটকীয়ভাবে এজিদের আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। ফলে তার মনে যে অনুশোচনাটুকু জাগ্রত হয়েছে তা প্রকাশিত হতে পারে নি। আবার অনেক সমালোচক জায়েদার প্রতি হাসানের ঔদাসীন্যের বিষয়টা স্বীকার করতে চাইবেন না, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, জায়েদা তিনবারের চেষ্টায় হাসানকে হত্যা করেছে, যাতে অনেকটা সময়ও তার লেগেছে। তাছাড়া জায়েদার প্রত্যেক প্রচেষ্টাই হাসান বুঝতে পেরেছে; তারপরও হাসান যথেষ্ট সচেতন হয় নি। কিংবা হাসান একবারও জানতে বা বুঝতে চেষ্টা করে নি জায়েদা কেন এরূপ আচরণ তার সঙ্গে করছে। একজন দায়িত্বশীল স্বামী হিসেবে তার সেটা জানার বা বোঝার চেষ্টা করা উচিত ছিল; কিন্তু তা সে করে নি। ফলে এটা স্বীকার করতেই হয় যে, হাসান জায়েদা অপেক্ষা জয়নবের প্রতি বেশি যত্নশীল ছিল। সুতরাং জায়েদার আচরণকে অপরিহার্য অপরাধের সঙ্গে জড়ানো যায় না। আর অপরিহার্য অপরাধের সঙ্গে জড়ানো যায় না বলে দর্শন শাস্ত্রানুযায়ী তাকেও 'খল' বলা যায় না।

দুর্গা ও গুজাবুড়ি উভয়ই গ্রামের প্রতাপশালী কুচক্রী সমাজপতিদের ক্ষমতার অপব্যবহারের স্বীকার। দুর্গার ক্ষেত্রে দেখা যায় রহমতুল্লা, আব্বাস আলীদের অনৈতিক কাজে পরোক্ষ (indirect) চাপের স্বীকার হতে। কাজ না করলে সরাসরি হুমকি দিতে কাউকে লক্ষ করা যায় না। কিন্তু দুর্গা জানতো তাদের অন্যায় কাজে সহায়তা না করলে তাকে বাস্তুভিটা অর্থাৎ আখড়া ছাড়তে হবে। আর সেটা ইঙ্গিতে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আখড়াটি রহমতুল্লারই দেওয়া; এর অর্থ হয় কাজ না হয় পথ। জীবনের গোধূলীলগ্নে দাঁড়িয়ে সবাই চায় একটু বিশ্রাম, অবসর, শান্তি, আরাম-আয়েশ, নিশ্চয়তা পেতে। দুর্গাও সে বিবেচনায় নিজের বিবেক জলাঞ্জলি দিয়ে রহমতুল্লা, আব্বাস আলীদের জৈবিক তাড়নাসহ অন্যান্য সমাজবিরোধী কাজে সহায়তা ও সহযোগিতা করেছে। তাই দুর্গাকে প্রকৃত বা অপরিহার্য অপরাধী করা যায় না। অপরদিকে গুজাবুড়ির ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। লুন্দর শেখের নতুন নতুন নারীর মাধ্যমে জৈবিক তাড়না মেটানোর কাজে বাধ্য হয়ে সাহায্য করেছে। কারণ একটাই সে ছিল নিরূপায়, বিশেষ করে বয়সের দিক থেকে। সে অত্যন্ত অসহায় বৃদ্ধা নারী। তার নিজের উপার্জনের কোনো ক্ষমতা বা উৎস ছিল না, যা দিয়ে লুন্দর শেখের মত ক্ষমতাশীল মানুষদের মোকাবেলা করা যায়। সে যে বাধ্য হয়ে লুন্দর শেখকে সহযোগিতা করত তা স্পষ্টতর হয়, যখন

Dhaka University Institutional Repository

নবিতুনকে লুন্দর শেখের জন্য রাজি করাতে না পারায় তার খাবার ও অর্থ-বরাদ্দ বাতিল করে দেওয়া হয়। সুতরাং দুর্গা বা গুজাবুড়ি কাউকে দর্শনের অপরিহার্য অপরাধের ধারায় ফেলা যায় না । আর যায় না বলেই তাদেরকে প্রকৃত অপরাধী বা খল নারী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না।

জেব-উন্নিসা চরিত্র বিশ্লেষণে বংশগতিবিদ্যা ও চিকিৎসা ও চিকিৎসা-মনোবিজ্ঞানের স্মরণাপন্ন হওয়া একান্ত জরুরী। জেব-উন্নিসার অর্থ-বিত্ত, প্রতিপত্তি কোনো দিকে ঘাটতি ছিল না। তারপরও সে অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছে। ফুফু রৌশম্বারাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করিয়েছে। উপরন্ত 'পিতৃস্বসাদিগের ন্যায় বসন্তের ভ্রমরের মত পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।'[৪১] সুতরাং দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী অনিবার্য অপরাধের আওতায় তাকে ফেলা যায়। কিন্তু genetic বা বংশগতি বিদ্যার দৃষ্টিতে দেখলে জেব-উন্নিসাকে অপরাধী হিসেবে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা চলে না। কারণ বংশগতি-বিদ্যা বিশ্লেষণে জানা যায় মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা বংশানুক্রমিক প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ মানুষের বেশ কিছু আচরণ পুরুষানুক্রমিক বা পূর্ব পুরুষ থেকে পর্যায়ক্রমে প্রবাহিত হয়ে ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হয়। জেব-উন্নিসা মুঘল সম্রাটের উত্তরাধিকারিণী। তার ভেতর প্রবাহিত হয়েছে বংশের ধারা, পূর্ব পুরুষের ন্যায় কিছু নিষ্ঠুর আচরণ। জেব-উন্নিসার কথা থেকে তা স্পষ্টতর হয়। সে বলেছে-'আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষ আগুনে পুড়িয়া মরিব? আল্লা যদি আমার জন্য সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও বাদশাহজাদী করিতেন না।'[৪২] জিনগত সেই বৈশিষ্ট্যকে সে অস্বীকার করতে পারে নি। যার ফলে ফুফুকে হত্যা করিয়েছে, প্রিয় মানুষ মবারককে হত্যা করিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লক্ষ করলে দেখা যায়, জেব-উন্নিসা জিনগত বৈশিষ্ট্যেও অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। বংশ মর্যাদা, ঐতিহ্যকে ভেদ করে মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটেছে। খলতার দায় এড়িয়ে নায়িকা হয়ে উঠেছে। 'জেব-উন্নিসা আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তাকে এত ভালবাসিতাম, সে কথা এতদিন জানিতে পরি নাই কেন?'[৪৩] প্রেমিক মবারককে হত্যার পর একটা মানসিক ধাক্কা থেকে মানবীয় গুণ প্রকটিত হয়ে বেরিয়ে এসে বংশীয় দাম্ভিকতাকে ঢেকে দিয়েছে। 'জেব-উন্নিসা আতরমাখা রুমালখানি চক্ষুতে দিয়াছিল, এখন পাথরে লুটাইয়া পড়িয়া চাষার মেয়ের মত মাথা কুটিতে লাগিল।'[৪৪] জেব-উন্নিসা তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় প্রতিমুহূর্তে দগ্ধ হয়েছে। আপন ভুলের জন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারে নি। মবারকের মত নিজেকে অনুরূপ কষ্ট দিতে চেয়েছে। মবারকের বিরহে প্রায় উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে। 'মবারকের সর্পদৃষ্ট মৃত্যুই জেবুন্নিসার জীবন ও চরিত্রের সর্বোত্তম কাল।'[৪৫] শাহজাদীর বিলাস ত্যাগ করেছে, উপোস করেছে। মবারককে ফিরে পেতে সৃষ্টিকর্তার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছে। ঔপন্যাসিক জেব-উন্নিসার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন এভাবে-'সমস্ত দিনরাত্র আগুনের তাপের নিকট বসিয়া থাকিলে মানুষে যেমন হয়, চিতারোহণ করিয়া, না পুড়িয়া কেবল ধূম ও তাপে অর্দ্ধদগ্ধা হইয়া

Dhaka University Institutional Repository

চিতা হইতে নামিলে যেমন হয়, জেব-উন্নিসাকে আজ তেমনই দেখাইতেছিল। জেব-উন্নিসা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পুড়িতেছিল।'[৪৬] clinical psychology- শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে মানুষ যখন কোনো মানসিক বা শারীরিকভাবে স্বাভাবিক আচরণ ত্যাগ করে অস্বাভাবিক হয়ে উঠে, তখন তাকে বিপরীতমুখী আঘাত দ্বারা থেরাপি দেওয়া হয়। তখন অচেতন মন অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হয়ে আসে। মবারকের মৃত্যু জেব-উন্নিসার মনে সেরূপ থেরাপির কাজ করেছে। সুতরাং বংশগতিবিদ্যা ও মনোচিকিৎসাশাস্ত্রের বিচার, বিশ্লেষণ বা বিবেচনায় জেব-উন্নিসাকে কোনোক্রমেই 'খল' বলা যায় না।

প্রমদা চরিত্রটি বংশগতিবিদ্যা, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণের যোগ্য। 'ব্যক্তির নীতিবোধ গঠিত হয় গৃহের পরিবেশে। গৃহেই সে তার চিন্তা, আবেগ ও কর্মের অভ্যাস গঠন করে। বস্তুত তার চরিত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় গৃহে।'[৪৭] পিতামাতার সদ্‌গুণ সবসময় তাদের সন্তানের উপর বর্তে না, তবে তাদের দোষের গুণ বেশিরভাগ সময়ই সুদসহ ফলতে দেখা যায়। পিতা-পুত্র উভয়কে সবসময় ভালো গুণসম্পন্ন হতে দেখা যায় না। কিন্তু উভয়ই মন্দ এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। 'প্রমদা' তাহার এক উদাহরণস্থল। তাঁহার পিতার নাম রামদেব চক্রবর্তী। বাড়ি শশিভূষণের বাড়ির অতি নিকটে। দ্বেষ, হিংসা, কলহপ্রিয়তা ইত্যাদি কতকগুলো দোষ রামদেব চক্রবর্তীর বংশানুক্রমিক; তাঁহার বংশের কন্যা যে পরিবারে গিয়াছে, সেই পরিবারই দ্বন্দ্ব-কলহের ভদ্রাসন হইয়াছে। প্রমদা এই পৈতৃক সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।'[৪৮] অর্থনীতি অনুযায়ী প্রমদা যে কঠোর আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে তার কারণ অভাব ও চাহিদা। অভাব থেকে মুক্তি মানুষের মানবীয় চাওয়ার মধ্যেই পড়ে। অভাব ও চাহিদা এই দুটো বিষয়ের একসঙ্গে ঘাটতি দেখা দিলে মানুষের মন বিকৃত হতে বাধ্য। অপর দিকে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সমাজবিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ সামাজিক রীতি-নীতির অভাব ও অসম বণ্টন, অশিক্ষা, এবং পরিবার ও সমাজপতিদের অবহেলা ও অমনোযোগী মনোভাব। প্রমদা ছোটকাল থেকে অভাবের ভেতর মানুষ হয়েছে। অভাবের সঙ্গে চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক রয়েছে। অভাব যখন বাড়ে চাহিদা তখন কমে। তাই প্রমদা যখন বিয়ের পর স্বামী শশিভূষণের সংসারে এসে পূর্ব অভাবের সমাধানের পথে এগিয়েছে তখন সেই সঙ্গে চাহিদা বেড়েছে। স্বামী শশিভূষণের দুর্বল ভূমিকার দরুণ প্রমদার বাড়তি চাহিদা পারিবারিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। সেই বিশৃঙ্খলায় দেবর-জাকে অর্থাৎ বিধুভূষণ-সরলাদের পৃথক করে দিয়েছে। স্বামী দুর্নীতির দায়ে জমিদারের মামলায় জেলে গেলেও তাকে ছাড়াতে যায় নি। সেটা তার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার ফল। কারণ তার ধারণা ছিল টাকা দিয়ে স্বামীর উদ্ধার নাও হতে পারে। তাই প্রমদার ভাষায়-'আমার বিবেচনায় এ টাকা দিলেও নিস্তার নাই। লাভের মধ্যে টাকাও যাবে, প্রাণও যাবে। তাই আমি বলি, কোম্পানির কাগজ, নগদ ও গহনা যা কিছু আছে একদিন নিয়ে চলে যাই। এখানে থাকলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে দিতে হবে, তফাতে থাকলে আর চক্ষুলজ্জা থাকবে না। আজ যদি টাকাগুলি দি, আর কাল উনি পুলিপোলাও যান,

Dhaka University Institutional Repository

তবে আমরা ভিক্ষে করে বেড়াই আর কি?'[৪৯] একটা নারী প্রথম যেটা চায় তা হল চিশ্চয়তা; খাবার, পরিধেয় বস্ত্র ও বাসস্থানের, যা শশিভূষণ স্বাভাবিক উপায়ে যোগাতে পারে নি। সেজন্য সে দুর্নীতি করেছে। স্ত্রী হিসেবে অর্থ যোগান দিয়ে স্বামী শশিভূষণকে অপরাধের দায় থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা উচিত ছিল কিন্তু প্রমদা মা, ভাই এবং নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে তা করে নি। কারণ 'অর্থনীতি নিরাপত্তার সাথে জড়িত। মানুষ তার জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তা না পেলে-যেকোনো প্রকার অন্যায়ের আশ্রয়গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না।'[৫০] তাছাড়া অর্থহীন দুর্দশাপূর্ণ জীবনের সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় ছিল। এ কারণে আবার সেই করুণ অবস্থারপূনরাবৃত্তি সে চায় নি। 'মানুষের জীবন সংলগ্ন ক্রিয়াকর্মের বিস্তারের সামনে থেকে সরাতে হয় অন্ধ কুসংস্কার আর দীর্ঘ বিশ্বাসের জঞ্জাল, সরাতে হয় প্রতিটি মানব ও প্রতিটি মানবীয় হয়ে ওঠার সুযোগ ও সম্ভাবনার সামনে সব রকম মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা।'[৫১] সুতরাং প্রমদাকেও সমাজ ও অর্থনীতিশাস্ত্রের আলোকে বিচার সাপেক্ষে খলতার দায় থেকে মুক্তি দেওয়া যায়।

সমালোচনান্তে পদ্মিনী উপখ্যান-এর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি কয়টি স্মরণ করার প্রয়োজন মনে হয়:

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে-
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে-
কে পরিবে পায়।
কোটি কল্প নরকের বাস ইচ্ছা হয়-
মুহূর্তের স্বাধীনতা তবু নয় নয়।'[৫২]

পারস্পরিক বা তুলনামূলক চারিত্র্য বিচারে কিংবা সমালোচনায় একটা বিষয় মূর্ত হয়ে উঠে তা হল স্বাধীনতা। সার্বিক স্বাধীনতা সবাই চায়; কিন্তু সেই সঙ্গে নারীরা কিছু খণ্ড খণ্ড স্বাধীনতার ওপর বেশি সচেতন এবং ক্রিয়াশীল। সেগুলো হল স্বামীর স্বাধীনতা, সংসারের সর্বময় কর্ত্রী হবার স্বাধীনতা। স্বামীর পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসা চেয়েছে জায়েদা। গোলাপজান, প্রমদা; তারা চেয়েছে সাংসারিক কর্তৃত্বে স্বাধীনতা। মায়মুনা, দুর্গা, গুজাবুড়ি; তারা চেয়েছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তবে কোনো চরিত্রের কোনো চাওয়াই (স্বাধীনতা) সমাজ, সংসার, কাল কিংবা মানবীয় গুণাবলিকে উৎরিয়ে যায় নি বা অমূলক বলেও মনে হয় না।

কিন্তু পুরুষ চরিত্রগুলোতে প্রায়-ই ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। ঈর্ষাজনিত বিষয় নারী চরিত্রসমূহের মধ্যে বেশি পরিমাণে লক্ষ করা যায়। পুরুষ চরিত্রগুলোতে দেখা যায়, জোর জবরদস্তি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লড়াই কিংবা

Dhaka University Institutional Repository

বিবাদে লিপ্ত হতে, নিজের অধিকার কিংবা পছন্দকে ছিনিয়ে নিতে। ঠকচাচা লড়াই করেছেন বেঁচে থাকার জন্য। রোজগার এবং সামাজিকভাবে বুদ্ধিদীপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ তার মূল উদ্দেশ্য ছিল। ছিরু পাল, সেও চেয়েছে সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং সেটা সমাজের প্রধান ব্যক্তির পদ বা আসন। এক কথায়, সমাজপতি। ঠকচাচা করেছেন বুদ্ধি খাঁটিয়ে, ছিরু পাল শ্রীহরি পাল হয়েছে বুদ্ধি ও শক্তির সাহায্যে। নেতিবাচক পুরুষ চরিত্রের মধ্যে সাধারণত দুটি শ্রেণি দেখা যায়, এক শ্রেণি চায়, বিবাদ এড়িয়ে গোপনে ও কৌশলে কাজ উদ্ধার করতে। তারা সম্যক লড়াইকে ভয় পায়। অপর দিকে, ছিরু পালের মতো চরিত্র, যারা চায় যেকোনো ভাবে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে। প্রয়োজনে তারা সশস্ত্র হতে পারে।

'মারোয়ান' চরিত্রটি অনেকটা 'ঠকচাচা' চরিত্রটির অনুরূপ। তারা উভয়ে তাদের প্রতিষ্ঠা লাভের পথে একই যুক্তিকে অনুসরণ করেছে। পার্থক্য কেবল, তাদের মনোযুদ্ধের ক্ষেত্র ভিন্ন। 'মারোয়ান' চেয়েছে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা, 'ঠকচাচা' চরিত্রটি চেয়েছে সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সুতরাং এক দিকের প্রেক্ষাপট সামাজিক অপরদিকে, রাজনৈতিক। শ্রীহরির সঙ্গে 'এজিদ' চরিত্রটির মিল লক্ষ করা যায়। তবে তা আংশিক। প্রেক্ষাপটগত ভিন্নতা থাকলেও নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রীহরি, যুদ্ধ জয়ী বীর সেনা কিন্তু এজিদ পরাজিত ও পলায়নপর। তবে, সাহসের ক্ষেত্রে তারা দু'জনই প্রায় এক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এজিদ তার সেই সাহসকে ধরে রাখতে পারে নি।

'মজিদ' চরিত্রটিকে পাওয়া যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। সেখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট এক কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। সে যেমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, তেমনি সম্যক যুদ্ধেও এগিয়ে গিয়েছে। ঠকচাচা এবং শ্রীহরির পেতাত্মা যেন এক ব্যক্তির উপর এসে ভর করেছে। তাই এজিদ, মারোয়ান, ঠকচাচা, শ্রীহরি- এই চারটি চরিত্র অপেক্ষা 'মজিদ' চরিত্রটি বেশি উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থনির্দেশনা

১. বদিউর রহমান, *সাহিত্য স্বরূপ*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০০০), পৃ. ২৪০।

২. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *সমাজ-মনোবিজ্ঞান* (কলিকাতা: ব্যানার্জী পাবলিসার্স, ১৯৮০), পৃ. ১৯৯।

৩. মকসুদুর হরমান, *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা* (রাজশাহী: বুক্স প্যাভিলিয়ন, ২০০৬), পৃ.৮৩-৮৪।

৪. সব্যসাচী সাহা, *মনোবিজ্ঞান ও সমাজ* (রাজশাহী: তকদীর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, ২০০১), পৃ.৭৭।

৫. আনিসুজ্জামান (সম্পাদক), *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী (৩য় খণ্ড)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ৪৪।

৬. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

৭. বদিউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬।

৮. সফিউদ্দিন আহমদ (সম্পাদক), *বঙ্কিম রচনাসমগ্র (প্রথম খণ্ড), বিষবৃক্ষ* (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০০৮), পৃ. ১৬০।

৯. সনৎকুমার সাহা, *সমাজ সংসার কলরব* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০), পৃ. ১৪৩।

১০. বঙ্কিমরচনা সমগ্র, *বিষবৃক্ষ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০।

১১. সনৎকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

১২. ক্ষেত্র গুপ্ত, *বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: শিল্পরীতি* (কলিকাতা: গ্রন্থনিলয় প্রকাশন, ১৯৭৪), পৃ. ২৪৯।

১৩. সনৎকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।

১৪. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি), পৃ. ১৩৬।

১৫. নজিবরর রহমান, *আনোয়ারা* (ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০০৬), পৃ. ১৭।

১৬. তদেব, পৃ. ৬৪।

১৭. ওয়াহিদুন নবী, *মানসিক ব্যাধি* (ঢাকা: এশিয়ান প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮৮), পৃ. ৬৬

১৮. তদেব, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা পৃ. ০২।

১৯. নজিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

২০. তদেব, পৃ. ১৮।

২১. তদেব।

২২. তদেব, পৃ. ১৯।

২৩. তদেব, পৃ. ৫৩।

২৪. বঙ্কিম রচনামসগ্র, *রাজসিংহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।

২৫. তদেব, পৃ. ১৩১।

২৬. তদেব, পৃ. ১২৫।

২৭. তদেব, পৃ. ১৪০।

২৮. তদেব, পৃ. ৪৬।

২৯. তদেব, পৃ. ১৩১।

৩০. তদেব, পৃ. ১৪৯।

৩১. বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক) *বিষাদসিন্ধু* (ঢাকা: অবসর প্রকাশ, ২০০৬), পৃ. ৩৯।

৩২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০।

৩৩. বঙ্কিম রচনাসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯।

৩৪. তদেব, পৃ. ২৮।

৩৫. মকসুদুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১।

৩৬. বঙ্কিম রচনাসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

৩৭. তদেব, পৃ. ১২৫।

৩৮. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯।

৩৯. সুধীরকুমার নন্দী, পৃ. ৫৫।

৪০. আবুল আহসান চৌধুরী, *কাঙাল হরিণাথ মজুমদার, জীবনী গ্রন্থমালা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮), পৃ. ১১৬

৪১. বঙ্কিম রচনাসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭০।

৪২. তদেব, পৃ. ৪৭১।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. তদেব, পৃ. ৫১১।

৪৪. তদেব, পৃ. ৫১২।

৪৫. ক্ষেত্র গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯।

৪৬. বঙ্কিম রচনাসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২২।

৪৭. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ.৩১।

৪৮. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

৪৯. তদেব, পৃ. ১২৬।

৫০. মকসুদুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪১।

৫১. সনৎকুমার সাহা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

৫২. কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদক) *মশাররফ রচনা-সম্ভার,পঞ্চম খণ্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. ৩৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলা উপন্যাসে: খল 'নর' ও 'নারী' চরিত্র শিরোনামার অভিসন্দর্ভটি রচনায় বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রাখা হয়েছে। প্রথমত, আমাদের পরিবার ও সমাজ যুগান্তরব্যাপী পুরুষতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রে লালিত-পালিত। সেখানে নারীরা সবসময় বঞ্চিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত। উপর্যুপরি তারা সবধরনের অসাম্যের শিকার। অর্থনৈতিক, শিক্ষাসহ বিভিন্ন রকম অসমতা নারীকে শৃঙ্খল নামের এক ঘেরাটোপে আবদ্ধ করে রেখেছে। নারীদের প্রতি এই অবমূল্যায়ণের সূত্রপাত পরিবার ও সমাজ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় সুবিস্তৃত । আর অবমূল্যায়ণের এই নানা চিত্র রূপায়িত হচ্ছে শিল্পীর তুলিতে, নয়তো কোনো সাহিত্যিকের পাণ্ডুলিপির পাতায়। তারই ধারাবাহিকতায় কখনো কোনো কোনো নারী হয়ে উঠছে প্রতিবাদী। সেই প্রতিবাদ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৌন। সেটাও তারা পুরুষতান্ত্রিক শাষণ ব্যবস্থার কারণে পুরুষদের ওপর প্রয়োগ করতে পারছে না। ফলে তারা তাদের সমগোত্রীয় কারো ওপর সঙ্গে তা প্রয়োগ করছে। বেশিরভাগ সময়ে সেটি ঘটে গোপনে, কৌশলে; কখনো যৎসামান্য প্রকাশ্যে। ফলে তারা পুরুষের চোখে কিংবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে হয়ে উঠছে কূট কৌশলী, খল। অপরদিকে, আমাদের শিক্ষিত সমাজ, লেখক, সাহিত্যিক প্রায় সবাই পুরুষ। ফলে তারা তাদের লেখনীতে পুরুষ অপেক্ষা নারীদের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন। নারীদের সৌন্দর্য বর্ণন, মহিমা জ্ঞাপনের পাশাপাশি তদপেক্ষা নেতিবাচকার্থে বেশি ব্যবহার করেছেন। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসসমূহ। বাংলা সাহিত্যের অনেক উপন্যাসেই নারীদেরকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করা হয়েছে; 'খল' বলা হয়েছে। উপন্যাসেই নারীদেরকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করা হয়েছে; 'খল' বলা হয়েছে। এবং তা নিয়ে অনেক সমালোচক রসালো সমালোচনাও করেছেন। কিন্ত আমার মনে হয়েছে উপন্যাসে যে সমস্ত নারীচরিত্রকে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তারা আসলে নিজ থেকে নেতিবাচক গুণপ্রাপ্ত হয় নি। তার পেছনে কিছু যৌক্তিক কারণ ছিল এবং আছে। গভীরভাবে খোঁজ নিলে কিংবা তাদের জীবনেতিবৃত্ত পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাদের খল হয়ে ওঠার পেছনে ব্যক্তি অথবা কোনো বস্তু প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। অনেক সময় সমাজপতিদের দৌরাত্ম্য, পারিবারিক প্রভাব এর জন্য দায়ী। অনেকের ক্ষেত্রে জীন ফ্যাকটরও একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়; যার প্রভাব বংশপরম্পরা চলতে থাকে। এ সমস্ত কারণ একজন ব্যক্তিকে, ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিটি পুরুষ কিংবা নারী যে কেউ হতে পারে। তবে সবসময় যে উক্ত কারণে কেবল নারীর আচরণগত পরিবর্তন হয় তা নয়, কখনো ব্যক্তিগত কারণেও নারীদের আচরণগত পরিবর্তন ঘটতে পারে। ব্যক্তিগত কারণ বলতে বোঝানো হয় ব্যক্তির নিজস্ব কিছু ভাবনা, অভাববোধ, অপ্রাপ্তি। এ বিষয়গুলো যে কোনো সময় একজন ব্যক্তিকে পিপাসু ও জিঘাংসু করে তুলতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

আর্থিক কিংবা প্রেম বিষয়ক কারণেও অনেক সময় ব্যক্তি পিপাসু ও জিঘাংসু করে তুলতে পারে। আর্থিক কিংবা প্রেম বিষয়ক কারণেও অনেক সময় ব্যক্তি তার পরিবার সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের চোখে খল হয়ে উঠতে পারে। এ সমস্ত কারণে তাই নারী নয়, পুরুষও 'খল' বলে চিহ্নিত অথবা অভিধায়িত হতে পারে। প্রথম অধ্যায়ে ব্যক্তির অপরাধ প্রবণতা ও কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারী ও পুরুষ সবাই রক্তে মাংসে গড়া প্রেষণাযুক্ত মনোভাববিশিষ্ট সাধারণ মানুষ মাত্র। তাদের অন্য সবার মত ইচ্ছে, শখ, আহ্লাদ ও বাসনা রয়েছে। একটা নারী বা পুরুষ যখন স্বাভাবিক আচরণ থেকে বিচ্যুত হয়, তখন নিজেই কেবল তার জন্য দায়ী থাকে না। তার বিপথগামিতায় পরিবার, সমাজ অথবা কোনো নিকট আত্মীয়ের অংশীদারত্ব, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্ররোচনা, প্রভাব কিংবা ইচ্ছে থাকে। প্রয়োজনীয় প্রেষণা পেলে ব্যক্তি কর্তৃক যেকোনো অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। অপরাধের পরিমাণ নির্ভর করে ব্যক্তির আত্মগত ইচ্ছা ও বাহ্যিক প্রেষণার ওপর। সময় উপযোগিতা, পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে প্রেষণাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে কোনো নারী বাহ্যিক প্রেষণা ব্যতীত আপনা আপনি কোনো অপরাধ করে নি। তবে বংশপরম্পরা সূত্রে অনেক অপরাধ করতে দেখা যায়। সেটা দেখানো হয়েছে গোলাপজান, প্রমদা ও জেব-উন্নিসা চরিত্রের ভেতর দিয়ে। বাহ্যিক প্রেষণাজনিত কারণে গোলাপজান, প্রমদা ও জেব-উন্নিসা চরিত্রের ভেতর দিয়ে। পুরুষ চরিত্রসমূহেও এই বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত ছিল, কিন্তু এ ধরনের কোনো চরিত্র উপন্যাসে পাওয়া যায় নি। বাহ্যিক প্রেষণাজনিত কারণে অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠতে দেখা যায় জায়েদাকে, আত্মগত উপলব্ধি ও অসাম্যের প্রেষণা থেকে বিপথগামী হয়ে উঠেছে হীরা চরিত্রটি। অভাবজাত তাড়না থেকে স্বীকার হয়েছে দুর্গা। মানবীয় প্রেমের কামনা বাসনার সঙ্গে সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে মৌন যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে হীরা। অপর দিকে, এজিদ, শ্রীহরি, মজিদ তারাও নিজস্ব বা ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরেই হয়ে উঠেছে খল। ঠকচাচা, তার খলতাকে ব্যবসার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছে।

গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি চরিত্রের বিপথগামী হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে নানাবিধ প্রেষণা বা উদ্দীপনা। এই প্রেষণাকে নিয়ন্ত্রণ করে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ। প্রেষণা ও পরিবেশ মিলে গঠিত হয় ব্যক্তির মনোভাব। আর মনোভাবই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং কোনো চরিত্রকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা না করে 'খল' বলা উচিৎ নয়। উপর্যুক্ত গবেষণায় উক্ত বিষয়টিকে তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে কারণ খলতা মানুষের কেবল বিশেষ বৈশিষ্ট্য মাত্র। সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে প্রয়োজন পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সাম্যাবস্থা নিশ্চিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জি

১. অনীক মাহমুদ *সাহিত্যে সাম্যবাদ থেকে মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৯)

২. অরবিন্দ পোদ্দার *আধুনিক উপন্যাসে মানব প্রত্যয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (কলকাতা-১৯৬২)

৩. অরুণ স্যানাল (সম্পাদক) *বাংলাদেশের উপন্যাস: আঙ্গিক বিবেচনা; প্রসঙ্গ: বাংলা উপন্যাস*, (কলকাতা: ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৯১)

৪. অশ্রুকুমার শিকদার *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা, অরুণা প্রকাশন, ১৯৮৮)

৫. আকরম হোসেন সৈয়দ *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫)

৬. আজিজুর রহমান *সাহিত্যে সমাজবাস্তবতার ধারা* (সাতক্ষীরা: বর্ণ প্রকাশন, ১৯৯২)

৭. আজীজ আল্-আমান, আবদুল (সম্পাদক), *মীর মশাররফ হোসেন, বিষাদ-সিন্ধু* (কলকাতা: হরফ প্রকাশন, ১৯৭১)

৮. আনিসুজ্জামান (সম্পাদক), *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী (৩য় খণ্ড)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪)

৯. আবদুল নঈম *বাঙলা অলঙ্কার* (যশোর: পূর্বা প্রকাশন, ১৯৯৭)

১০. আবুল আহসান চৌধুরী *কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, জীবনী গ্রন্থমালা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮)

১১. আবুল আহসান, চৌধুরী *মীর মশাররফ হোসেন/ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯)

১৩. আহমদ শরীফ (সম্পাদক) *বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬)

১৪. ইকবাল. শহীদ *রাজনৈতিক চেতনা: বাংলাদেশের উপন্যাস* (ঢাকা: সাহিত্যিক, ২০০৩)

১৫. ইকবাল ভূইয়া *বাংলাদেশের উপন্যাসের সমাজ চিত্র*, (ঢাকা: ১৯৯১)

১৬. ইদরিস আলী. মুহম্মদ *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫)

১৭. ওয়াহিদুন নবী, দেওয়ান, *মানসিক ব্যাধি* (ঢাকা: এশিয়ান প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮৮)

১৮. ক্ষেত্র গুপ্ত, *বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: শিল্পরীতি* (কলিকাতা: গ্রন্থনিলয় প্রকাশন, ১৯৭৪)

১৯. জুলফিকার মতিন *মোহাম্মদ নজিবর রহমান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩)

২০. জহিরুল হক *সমাজ মনোবিজ্ঞান* (রাজশাহী: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৯৪)

২১. তপংকর চক্রবর্তী (সম্পাদক), *শরৎরচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ প্রকাশন, ২০০৬)

Dhaka University Institutional Repository

২২. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *স্বর্ণলতা* (ঢাকা: প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ১৯৬৭)

২৩. দেবীপদ ভট্টাচার্য. শ্রী (সম্পাদক), মূল: *মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী*, (কলিকাতা-১৯৮৪)

২৪. নজিবর রহমান, মোহাম্মদ, *আনোয়ারা* (ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০০৬)

২৫. নজিবর রহমান, মোহাম্মদ, *আনোয়ারা* (ঢাকা: ওসমানিয়া বুক ডিপো, ১৯৬৬)

২৬. নাজমুল করিম, এ.কে (সম্পাদক), রঙ্গলাল সেন অনূদিত, *সমাজবিজ্ঞান* মূল: স্যামুয়েল কোনিগ *sociology-an Introduction to the science of society* (ঢাকা: প্যারামাউন্ট বুক করপোরেশন, ১৯৭৩)

২৭. নরেন বিশ্বাস, অলঙ্কার অন্বেষণা (ঢাকা: কালিকলম, ১৯৭৬)

২৮. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, শ্রী, *সমাজ দর্শন* (কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৮০)

২৯. বদিউর রহমান, *সাহিত্য স্বরূপ* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০০)

৩০. বিজিতকুমার দত্ত, *বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস* (কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ প্রকাশন, ১৯৬২)

৩১. বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), *বিষাদসিন্ধু*, মূল: মীর মশাররফ হোসেন (ঢাকা: অবসর প্রকাশ, ২০০৬)

৩২. বুদ্ধদেব বসু, *কালিদাসের মেঘদূত* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯)

৩৩. মকসুদুর রহমান, *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা* (রাজশাহী: বুক্স প্যাভিলিয়ন, ২০০৬)

৩৪. মণি বাগচী, *বঙ্কিমচন্দ্র* (কলিকাতা: জিজ্ঞাসা প্রকাশন, ১৯৬৫)

৩৫. মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস* (ঢাকা: পূর্বলেখ প্রকাশন, ১৯৭৪)

৩৬. মুনির চৌধুরী, *মীর মানস* (ঢাকা: ১৩৭৫ বাং)

৩৭. মনোজ বসু, *রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড (নিশিকুটুম ১ম পর্ব)* (কলিকাতা: গ্রন্থ প্রকাশ, ১৩৮৭)

৩৮. মযহারুল ইসলাম, *নজিবর রহমান* (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০)

৩৯. মুস্তাফা নূরুল ইসলাম, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৯৬৯)

৪০. রণেশ দাশ গুপ্ত, *উপন্যাসের শিল্পরূপ* (ঢাকা: কালিকলম প্রকাশন, ১৯৭৩)

৪১. শওকত আরা, *সমাজ মনোবিজ্ঞান* (ঢাকা: জ্ঞান বিতরনী, ২০০৬)

৪২. শহীদুল্লা কায়সার, *সারেং বৌ* (ঢাকা: জোনাকী প্রকাশন, ২০০০)

৪৩. শহীদুল্লা কায়সার, *সারেং বৌ* (ঢাকা: নসাস প্রকাশন, ১৯৯৮)

৪৪. শিশির চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা: জগদীশগুপ্ত* (কলকাতা,১৯৯৩)

৪৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (কলিকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৩৭২ বাং)

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. শ্রীভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (কলকাতা, দ্বেজ পাবলিশিং)

৪৭. সফিকুন্নবী সামাদী, *কথাসাহিত্যে বাস্তবতা: শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭)

৪৮. সফিউদ্দিন আহমদ (সম্পাদক), *বঙ্কিম রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড, বিষবৃক্ষ* (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০০৮)

৪৯. সব্যসাচী সাহা, *মনোবিজ্ঞান ও সমাজ* (রাজশাহী: তকদীর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, ২০০১)

৫০. সনৎকুমার সাহা সমাজ, *সংসার কলরব* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০)

৫১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে কালান্তর* (কলকাতা: সাহিত্য শ্রী, ১৯৭১

৫২. সারোয়ার জাহান, *বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস মুল্যায়ণের পালাবদল* (ঢাকা, ১৯৮৫)

৫৩. সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পাদক) *বাংলা একাডেমি চরিতাবিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭)

৫৪. সেলিম জাহাঙ্গীর, *মীর মশাররফ হোসেন: জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩)

৫৫. হিমাচল চক্রবর্তী (অনূদিত), *সমাজবিদ্যা তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা,* মূল লেখক: টম বটোমোর (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৫)

৫৬. Allport. G.W, *Personality Apsychology interpretation* (New York: Holt, 1937)

৫৭. Asch.S.E. *Social Englewood Cliffs*N.J:Prentice(New York: Hall,1952)

৫৮. Baron. R.A & Byrne, D. *Social psychology: Understsnding Human Interaction* (Allyan and Bacon: Inc. 1981)

৫৯. Buss. A.H, *The Psychology of aggression* (New Your: Wiley, 1961)

৬০. Lilton. R, *The culturalbackground of personality*. (New York: ppleton Centure-Crofts, 1995)

৬১. Mohammad Ali/ *Bangla Academy Bengali-English Dictonary,* (Dhaka: Bangla Academy, 2007)

৬২. Ruch. F.L *Psychology and Life* (Scott Foresan and Co, 1995)

৬৩. Sears, P.F *Psychology & Social Psychology* (New York: Grow-Hill, 1974)

৬৪. Thorpe. W.H, *Psychological Foundation of Personal* (London: Methane, 1961)

৬৫. Zillur Rahman Siddiqui (Editor*), Bangla Academy English-Bengali Dictionary* (Dhaka: Bangla Academy, 1994)

পত্রিকা

-আবুল হাসনাত (সম্পাদক), *কালি ও কলম* (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ২০০৬)

-নমিতা খান (সম্পাদক), *সংবাদপত্র, নারী ও সমাজ* (ঢাকা: সূচিপত্র প্রকাশন, ২০০৫)

-নান্টু রায় (সম্পাদক), *ভারত বিচিত্রা* (ঢাকা: প্রেস ইনফরমেশন এন্ড কালচার, ভারতীয় হাই কমিশন, ২০০৭-২০০৯)